সনাতন ধর্মতত্ত্বের রূপরেখা

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥মুখবন্ধ॥

প্রাককথন:

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

সনাতন ধর্ম ভারতের আত্মরূপ। সনাতন ধর্ম আসলে এক জীবনচর্যা বা জীবনযাপনের পদ্ধতি যেখানে পঞ্চভূত, পঞ্চবায়ু এবং সৃষ্টি তত্ত্বের সব কিছু নিয়ে আমাদের জীবনযাপন। জীবাত্মার উর্দ্ধগতি প্রাপ্তির জন্য বৈদিক ভারতের বেদ নির্ভর জীবনযাপন অবশ্যক, বেদকে জানা আবশ্যক। সেই চার বেদের এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে।

বেদের আলোচনা ওঁ কার তত্ত্ব-ব্যতীত অসম্পূর্ন, তাই ওঁকার তত্ত্ব নিয়ে একটু বলা হয়েছে, গায়ত্রী মন্ত্র নিয়ে একটু বলেছি। পরমাপ্রকৃতি মায়ের তিনটি রূপের তত্ত্ব চণ্ডী, কালী ও সরস্বতী সম্পর্কে একটু আভাস দিয়েছি। পরমশিব যার ইচ্ছাতে জীব সৃষ্ট হয় এবং জীবনমৃত্যুর চক্রে পরিভ্রমণ করে আস্তে আস্তে আত্মা মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয় সাধন করে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য, তাঁর বিভিন্ন রূপের আলোচনা করেছি শিব তত্ত্বে।

BANGLADARSHAN.COM

পরিশেষে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আমার পরমপুজিতা গুরুমা ও গুরুমহারাজদের যাঁদের মঙ্গলহস্ত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার মত অকৃতী, অধমের এই দুরূহ তত্ত্ব জানা এবং তাই নিয়ে আলোচনা সম্ভব ছিল না। শতকোটি প্রণাম জানাই আমার সদ্গুরু পরমাপ্রকৃতির সত্তা স্বরূপা আমার জন্ম জন্মান্তরের মূর্ত জননী মা সর্বাণীকে ও আমার সকল গুরুমহারাজদের চরণে। এই সেদিন পর্যন্ত যে তত্ত্ব শুনতে, যে জ্ঞান আহরণের জন্য বার বার ছুটেছি আশ্রমে, সেই সকল তত্ত্বজ্ঞান আমার লেখনীতে লেখার স্পর্ধা আমার নয়, সেই পরমা শক্তিময়ী মায়ের। যদি এক বিন্দুও এতে কারুর উপকার হয়, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সেই মহাশক্তির আর যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তার দায়ভার সম্পূর্ণ আমার । গুরু কৃপাহি কেবলম......

গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যাঽনুলভ্যতে।
তস্মাৎ সর্বপ্রয়ত্নেন গুরোরারাধনং কুরু॥

গুরুমধ্যে স্থিতমাতা মাতৃ মধ্যে স্থিতগুরু।
গুরুর মাতৃ নমঃস্তুভ্যাং মাতৃ গুরুং নমাম্যহম॥

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বেদ	৫
বেদপ্রভা	৪৪
চতুরাশ্রম	৬১
ওঁ কার তত্ব	৭২
শিবতত্ত্ব	৯২
চণ্ডী	১৪২
কালী	১৫৫
সরস্বতী	১৭০

BANGLADARSHAN.COM

॥বেদ॥

বেদ (সংস্কৃত: वेद veda, "জ্ঞান") হল প্রাচীন ভারতে লিপিবদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংকলন। বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এবং সনাতন ধর্মের সর্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সনাতনরা বেদকে "অপৌরুষেয়" ("পুরুষ" দ্বারা কৃত নয়, অলৌকিক) এবং "নৈর্বক্তিক ও রচয়িতা-শূন্য" (যা সাকার নির্গুণ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এবং যার কোনও রচয়িতা নেই) মনে করেন।

বেদকে শ্রুতি (যা শ্রুত হয়েছে) সাহিত্যও বলা হয়। এইখানেই সনাতন ধর্মের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলির সঙ্গে বেদের পার্থক্য। কারণ, সনাতন ধর্মের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিকে বলা হয় স্মৃতি (যা স্মরণধৃত হয়েছে) সাহিত্য। প্রচলিত মতে বিশ্বাসী সনাতন ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে, বেদ প্রাচীন ঋষিদের গভীর ধ্যানে প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রাচীনকাল থেকেই এই শাস্ত্র অধিকতর যত্নসহকারে রক্ষিত হয়ে আসছে। সনাতন মহাকাব্য মহাভারতে ব্রহ্মাকে বেদের স্রষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বৈদিক স্তোত্রগুলিতে বলা হয়েছে, একজন সূত্রধর যেমন নিপূণভাবে রথ নির্মাণ করেন, ঠিক তেমনই ঋষিগণ দক্ষতার সঙ্গে বেদ গ্রন্থনা করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

বেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৪৩৪টি।

বেদের সংখ্যা চার:
ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।
প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: সংহিতা (মন্ত্র ও আশীর্বচন), আরণ্যক (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ ও প্রতীকী যজ্ঞ), ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির উপর টীকা) ও উপনিষদ্ (ধ্যান, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা)। কোনও কোনও গবেষক উপাসনা (পূজা) নামে একটি পঞ্চম বিভাগের কথাও উল্লেখ করে থাকেন।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা ও সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় বেদ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। ভারতীয় দর্শনের যে সকল শাখা বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে এবং বেদকেই তাদের শাস্ত্রের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে, সেগুলিকে "আস্তিক" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের লোকায়ত, চার্বাক, আজীবক, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি অন্যান্য শ্রামণিক শাখায় বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকৃত নয়। এগুলিকে "নাস্তিক" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মতপার্থক্য থাকলেও শ্রামণিক ধারার গ্রন্থগুলির মতো বেদের বিভিন্ন স্তরের বিভাগগুলিতেও একই চিন্তাভাবনা ও ধারণাগুলি আলোচিত হয়েছে।

বর্তমানে বেদকে ব্যবহারিক ও গাঠণিক–এই দুই পদ্ধতির বিভাজনে বিভাজিত অবস্থায় পাওয়া যায়। উভয় পদ্ধতিতেই বেদ চার ভাগে বিভক্ত।

ব্যবহারিক বিভাজন

****

ব্যবহারিক বিভাজনগুলো যথাক্রমে ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বৈদিক ধর্মগ্রন্থ বা শ্রুতি সংহিতা নামে পরিচিত চারটি প্রধান সংকলনকে কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মের যজ্ঞ অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত:

ঋগ্বেদ অংশে হোতার বা প্রধান পুরোহিত কর্তৃক পঠিত মন্ত্র সংকলিত হয়েছে।

যজুর্বেদ অংশে অধ্বর্য্যু বা অনুষ্ঠাতা পুরোহিত কর্তৃক পঠিত মন্ত্র সংকলিত হয়েছে।

সামবেদ অংশে উদ্গাতার বা মন্ত্রপাঠক পুরোহিত কর্তৃক গীত স্তোত্রগুলি সংকলিত হয়েছে;

অথর্ববেদ অংশে চিকিৎসা শাস্ত্রের ওষধি, শল্যচিকিৎসা, অভিচারিক ক্রিয়া যথা মারণ, উচাটন, বশীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রগুলি সংকলিত হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

বেদের প্রতিটি পদ মন্ত্র নামে পরিচিত। কোনো কোনো বৈদিক মন্ত্র আধুনিক কালে প্রার্থনা সভা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়ে থাকে।

গাঠণিক বিভাজন

****

এ বিভাজনগুলো হচ্ছে মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। মন্ত্রাংশ প্রধানত পদ্যে রচিত, কেবল যজুঃসংহিতার কিছু অংশ গদ্যে রচিত। এটাই বেদের প্রধান অংশ।

ব্যবহারিক বিভাজন

****

ঋগ্বেদ

****

ঋগ্বেদ (সংস্কৃত: ऋग्वेदः ṛgvedaḥ, ঋক "স্তব" ও বেদ "জ্ঞান" থেকে) হল প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃত স্তোত্রাবলির একটি সংকলন। এই গ্রন্থটি বেদ নামে পরিচিত চারটি সর্বপ্রধান হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ("শ্রুতি") অন্যতম।

পবিত্র ঋগ্বেদ হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীনতম বেদ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ জীবিত ভারতীয় লেখা। এই গ্রন্থটি মূলত ১০টি পুস্তকে (সংস্কৃত: মণ্ডল) বিভক্ত যা ১,০২৮টি বৈদিক সংস্কৃত সূক্তের সমন্বয়। ঋগ্বেদে মোট ১০,৫৫২টি 'ঋক' বা 'মন্ত্র' রয়েছে। 'ঋক' বা স্তুতি গানের সংকলন হল ঋগ্বেদ সংহিতা।

ঈশ্বর, দেবতা ও প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা ঋগবেদে প্রাধান্য পেয়েছে। এবং সেগুলির মধ্যে একাধিক পাঠান্তরও লক্ষিত হয়।

রচনাকাল নিরূপণ

জেমিসন ও ব্রেরেটন তাঁদের ঋগ্বেদ অনুবাদে (২০১৪) এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন, সেটি "তর্ক ও পুনর্বিবেচনার বিষয় এবং ভবিষ্যতেও তা-ই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।" তারিখসংক্রান্ত প্রস্তাবনাগুলির সব ক'টিই করা হয়েছে সূক্তগুলির রচনাশৈলী ও সেগুলির বিষয়বস্তুর নিরিখে। সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এই গ্রন্থের একটি বৃহৎ অংশের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ। একটি আদি ইন্দো-আর্য ভাষায় রচিত হওয়ায় সূক্তগুলি নিশ্চিতরূপেই মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ নাগাদ সংঘটিত ইন্দো-ইরানীয় বিচ্ছেদের পরবর্তীকালের রচনা। ঋগ্বেদের মূল অংশের রচনার যুক্তিগ্রাহ্য তারিখটি উত্তর সিরিয়া ও ইরাকের মিতান্নি নথির রচনাকালের (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫০-১৩৫০ অব্দ) অনুরূপ। উল্লেখ্য, এই নথিটিতেও বরুণ, মিত্র ও ইন্দ্রের মতো বৈদিক দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রমাণগুলি ইঙ্গিত করে যে এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে।

ঋগ্বেদের মূল অংশের সর্বজনগ্রাহ্য সময়কাল হল পরবর্তী ব্রোঞ্জ যুগ। এই কারণে এই গ্রন্থ অল্প কয়েকটি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী নিরবিচ্ছিন্ন প্রথার অন্যতম উদাহরণে পরিণত হয়েছে। সাধারণভাবে এই গ্রন্থের রচনাকাল ধরা হয় মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়টিকে। মাইকেল উইটজেলের মতে, ঋগ্বেদ প্রাথমিকভাবে সংকলনের আকারে গ্রথিত হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ নাগাদ ঋগ্বৈদিক যুগের শেষভাগে। এই সময়টি ছিল কুরু রাজ্যের আদি যুগ। আস্কো পারপোলার মতে, ঋগ্বেদ প্রণালীবদ্ধ হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ নাগাদ, যেটি ছিল কুরু রাজ্যের সমসাময়িক কালে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

পাঠ

ঋগ্বেদের যে পাঠটি আজ পাওয়া যায় সেটির মূল ভিত্তি লৌহযুগের (নিচে কালনির্ধারণ দেখুন) একটি সংকলন। এই সংকলনটি থেকে 'গোত্রীয় গ্রন্থাবলি' (মন্ত্রদ্রষ্টা, দেবতা ও ছন্দ অনুসারে ২য়-৭ম মণ্ডল) পরবর্তীকালে সম্পাদিত একটি সংস্করণ পাওয়া যায়। এই পরবর্তীকালীন সংকলনটি আবার অন্যান্য বেদসমূহের সঙ্গে মুখে মুখে সম্পাদিত একটি সংকলন। এই সংকলনে পরবর্তীকালে কিছু প্রক্ষিপ্ত বিষয় যুক্ত হয়েছিল, যা মূল

ঋগ্বেদের কঠোর বিন্যাস-প্রণালীর সঙ্গে বেমানান। এর সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের বিশুদ্ধ উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যেও কিছু পরিবর্তন (যেমন সন্ধির নিয়ামন) এসেছিল।

অন্যান্য বেদসমূহের মতো সম্পাদিত পাঠটির একাধিক সংস্করণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে পদপাঠ সংস্করণটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি পৌস আকারে রচিত এবং মুখস্ত করার সুবিধার্থে প্রতিটি শব্দ এখানে পৃথক আকারে লিখিত। এছাড়া সংহিতাপাঠও গুরুত্বপূর্ণ। এটি সন্ধির নিয়মানুসারে লিখিত (প্রতিসখ্য বিধানে বর্ণিত নিয়মানুসারে)। এটি হল আবৃত্তি-উপযোগী মুখস্ত রাখার সংস্করণ।

পদপাঠ ও সংহিতাপাঠ বিশ্বাসযোগ্যতা ও অর্থগতদিক থেকে ঋগ্বেদের মূল পাঠের সবচেয়ে নিকটবর্তী। প্রায় এক হাজার বছর ধরে ঋগ্বেদের মূল পাঠ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে মুখে মুখে সংরক্ষিত হয়েছিল। এটি করার জন্য মুখে মুখে প্রচলিত রাখার প্রথাটিকে একটি বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি দেওয়া হয়েছিল। এর জন্য সংস্কৃত সমাসবদ্ধ শব্দগুলির ব্যাসবাক্য এবং বৈচিত্র্য দান করা হয়েছিল। কোথাও কোথাও ব্যাকরণগত পরিবর্তনও আনা হয়েছিল। শব্দের এই পরিমার্জনার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গসংস্থানবিদ্যা ও ধ্বনিবিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ প্রথা গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত গুপ্তযুগের (খ্রিস্টীয় ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দী) আগে ঋগ্বেদ লিখিত হয়নি। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মী লিপি সুপ্রচলিত হয়েছিল (ঋগ্বেদের প্রাচীনতম বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিগুলি পরবর্তী মধ্যযুগের)। যদিও মুখে মুখে প্রচলিত রাখার প্রথাটি আজও আছে।

BANGLADARSHAN.COM

ঋগ্বেদের আদি পাঠ (যেটি ঋষিগণ অনুমোদন করেছেন) বিদ্যমান সংহিতাপাঠের পাঠের সঙ্গে কাছাকাছি গেলেও সম্পূর্ণ এক নয়। তবে ছন্দ ও অন্যান্য দিক থেকে এর কিছু অংশ অন্তত একই ধাঁচে লেখা।

ঋগ্বেদের উপাস্য দেবদেবী ও উপাসক ঋষি

****

সাধারণভাবে ঋগ্বেদে অনেক দেবদেবীর উল্লেখ আছে। যেমন: পশুপতি শিব, ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, পবন ইত্যাদি। আবার এটিও উল্লেখিত হয়েছে শিবই পরমেশ্বর ও পরম ব্রহ্ম এবং সমস্ত দেবদেবীই পরমেশ্বরের বিভিন্ন রূপ। ঋষিরা তাদের উপাসনা করে বিভিন্ন শক্তি লাভ করতেন।

জরাথুস্ট্রবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য

****

ঋগ্বেদে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গ্রিক ধর্ম ও জরাথুস্ট্রবাদের যেন আবেস্তা নামক ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে ধর্মীয় উপাদানের প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য করেছে, যেমনঃ অহুর থেকে অসুর, দেইব থেকে দেব, আহুরা মাজদা থেকে একেশ্বরবাদ, বরুণ, বিষ্ণু ও গরুড়, অগ্নিপুজা, হোম নামক পানীয় থেকে সোম নামক স্বর্গীয় সুধা, ভারতীয় ও পারসিকদের।

বাকযুদ্ধ থেকে দেবাসুরের যুদ্ধ, আর্য্য থেকে আর্য, মিত্রদেব, দিয়াউসপিত্র দেব (বৃহস্পতি দেব), ইয়াস্না থেকে ইয়যোনা বা যজ্ঞ, নারীয়সঙ্ঘ থেকে নরাশংস, অন্দ্র থেকে ইন্দ্র, গান্দারেওয়া থেকে গন্ধর্ব, বজ্র, বায়ু, মন্ত্র, যম, আহুতি, হুমাতা থেকে সুমতি ইত্যাদি।
ঋগ্বেদে আছে সংবাদ সুক্ত যেগুলো কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত, যেগুলোকে সংস্কৃত নাটকের আদিরূপ মনে করেন অনেকে । এগুলো আছে ঋগ্বেদের একদম নতুন অংশে (ঋগ্বেদ ১ আর ঋগ্বেদ ১০) যেগুলো মনে করা হয় খ্রিষ্ট পূর্ব দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, শুধু প্রাচীন নদীর বন্দনা (ঋগ্বেদ ৩.৩৩) আরো প্রাচীন যেখানে নদী বিশ্বমিত্রর প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছেন ।

• ১.১৭৯ অগস্ত্য আর লোপামুদ্রা সংবাদ সুক্ত (৫ ত্রিষ্টুপ ১ বৃহতি)
• ৩.৩৩ বিশ্বমিত্র আর নদী সংবাদ সুক্ত (১২ ত্রিষ্টুপ ১অনুষ্টুপ)
• ১০.১০ যম ও যমী সংবাদ সুক্ত (১২ অনুষ্টুপ)
• ১০.৫১ অগ্নি আর দেবতা সংবাদ সুক্ত (৯ত্রিষ্টুপ)
• ১০.৮৬ ইন্দ্রানী, ইন্দ্র, বৃষকপি ও তার স্ত্রী সংবাদ সুক্ত
• ১০.৯৫ পুরুরবা ও উর্বশী সংবাদ সুক্ত (১৮ ত্রিষ্টুপ)
• ১০.১৮৩ ত্যাগী ও তাঁর পত্নীর সংবাদ সুক্ত (৩ ত্রিষ্টুপ)
* ত্রিষ্টুপ ছন্দ: ৪৪ অক্ষরের বৈদিক পদ যেগুলোতে চারটে করে পদ১১ অক্ষরে লেখা থাকে (১১ ১১ ১১ ১১)।
* অনুষ্টুপ ছন্দ: চারটি পদে ৮ অক্ষর থাকে (৮ ৮ ৮ ৮ ছন্দ)।
* বৃহতি ছন্দ: ৮ ৮ ১২ ৮ ছন্দ।

যজুর্বেদ

*****

যজুর্বেদ (সংস্কৃত: যজুর্বেদ, yajurveda, যজুস্ বা গদ্য মন্ত্র ও বেদ বা জ্ঞান থেকে) হল গদ্য মন্ত্রসমূহের বেদ। যজুর্বেদ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। যজ্ঞের আগুনে পুরোহিতের আহুতি দেওয়ার ও ব্যক্তিবিশেষের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির পদ্ধতি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যজুর্বেদ হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ বেদের একটি ভাগ। ঠিক কোন শতাব্দীতে যজুর্বেদ সংকলিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে গবেষকদের মতে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ অব্দ নাগাদ, অর্থাৎ সামবেদ ও অথর্ববেদ সংকলনের সমসাময়িক কালে এই বেদও সংকলিত হয়।

যজুর্বেদ দুটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা: কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ 'অবিন্যস্ত, অস্পষ্ট ও বিক্ষিপ্তরূপে সংকলিত।' অন্যদিকে 'শুক্ল' শব্দের অর্থ 'সুবিন্যস্ত ও স্পষ্ট।' [৩] কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি ও শুক্ল যজুর্বেদের দুটি শাখা আধুনিক যুগে বর্তমান রয়েছে। [৪]
যজুর্বেদ সংহিতার আদি ও প্রাচীনতম অংশটিতে ১,৯৭৫টি শ্লোক রয়েছে। এগুলি ঋগ্বেদের শ্লোকগুলির ভিত্তিতে

গ্রথিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ঋগ্বেদ থেকে স্বতন্ত্র। যজুর্বেদের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে বৈদিক সাহিত্যের দীর্ঘতম ব্রাহ্মণ শাস্ত্র শতপথ ব্রাহ্মণ। যজুর্বেদের নবীনতম অংশে রয়েছে একাধিক প্রধান উপনিষদ্। এগুলি হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন শাখার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই উপনিষদ্গুলি হল বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ঈশ উপনিষদ্, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, কঠ উপনিষদ্, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্ ও মৈত্রী উপনিষদ্।

নাম-ব্যুৎপত্তি

****

যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়ার পদ্ধতি ও মন্ত্রগুলি যজুর্বেদে আলোচিত হয়েছে। সাধারণত যজ্ঞের আগুনে ঘি, শস্য, সুগন্ধী বীজ ও গোদুগ্ধ আহুতি দেওয়া হয়।

'যজুর্বেদ' শব্দটি সংস্কৃত 'যজুস্' ও 'বেদ' শব্দদুটি থেকে এসেছে। মনিয়ার-উইলিয়ামসের মতে, 'যজুস্' শব্দের অর্থ "ধর্মানুশীলন, শ্রদ্ধানিবেদন, পূজা, যজ্ঞ, যজ্ঞে উচ্চারিত প্রার্থনা, পদ্ধতি, যজ্ঞের সময় অদ্ভুতভাবে উচ্চারিত নির্দিষ্ট মন্ত্র।" 'বেদ' শব্দের অর্থ "জ্ঞান।" জনসনের মতে, 'যজুস্' শব্দের অর্থ "যজুর্বেদে সংকলিত (প্রধানত) গদ্যে রচিত পদ্ধতি বা মন্ত্র, যেগুলি গোপনে উক্ত হয়।"

BANGLADARSHAN.COM

মাইকেল উইটজেল 'যজুর্বেদ' শব্দটির অর্থ করেছেন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সময় ব্যবহৃত "গদ্য মন্ত্রের (একটি) জ্ঞানমূলক গ্রন্থ।" র‍্যাল্ফ গ্রিফিথ 'যজুর্বেদ' নামটির অর্থ করেছেন, "যজ্ঞ বা যজ্ঞ-সংক্রান্ত গ্রন্থ ও পদ্ধতির জ্ঞান।" কার্ল ওলসন বলেছেন যে, যজুর্বেদ হল "ক্রিয়াকাণ্ডের সময় পঠিত ও ব্যবহৃত মন্ত্র (পবিত্র পদ্ধতি)।" অশ্বমেধ

শাখা

যজুর্বেদের অন্তর্গত শুক্ল যজুর্বেদের ১৬টি শাখার কথা জানা যায়। অন্যদিকে কৃষ্ণ যজুর্বেদের সম্ভবত আনুমানিক প্রায় ৮৬টি শাখা ছিল।

শুক্ল যজুর্বেদের মাত্র দুটি শাখাই এখন বর্তমান। এদুটি হল: মধ্যণ্ডিন ও কান্ব। অন্যান্য শাখাগুলির নাম অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। উক্ত শাখাদুটি প্রায় একই রকম। শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখা অধুনা বর্তমান। এগুলির বিভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়।

শুক্ল যজুর্বেদ

****

শুক্ল যজুর্বেদের সংহিতাটিকে বলা হয় বাজসনেয়ী সংহিতা। 'বাজসনেয়ী' শব্দটি এসেছে
ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পৈত্রিক নাম 'বাজসনেয়' থেকে। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন বাজসনেয়ী শাখার প্রতিষ্ঠাতা। বাজসনেয়ী সংহিতার দুটি বর্তমান শাখাদুটি (যেগুলি প্রায় একরূপ) হল: বাজসনেয়ী মধ্যণ্ডিন ও বাজসনেয়ী কান্ব।প্রাচীন ভারতের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত শুক্ল যজুর্বেদের লুপ্ত শাখাগুলি
হল: জাবালা, বৌধ্য, সপেয়ী, তাপনীয়, কাপোল,
পৌণ্ড্রবৎস, অবতী, পরমাবটিকা, পরাশর, বৈনেয়, বৈধেয়, কাত্যায়ন ও বৈজয়বপ।

শুক্ল যজুর্বেদের শাখাসমূহ

শাখার নাম: মধ্যণ্ডিন
অধ্যায়: ৪০
অনুবাক: ৩০৩
শ্লোকসংখ্যা: ১৯৭৫
সংশ্লিষ্ট অঞ্চল: বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, উত্তর ভারত

BANGLADARSHAN.COM

শাখার নাম: কান্ব
অধ্যায়: ৪০
অনুবাক: ৩২৮
শ্লোক সংখ্যা: ২০৮৬
সংশ্লিষ্ট অঞ্চল: মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু

কৃষ্ণ যজুর্বেদ

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অধুনা বর্তমান চারটি শাখা হল তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রয়ানী সংহিতা, কঠ সংহিতা ও কপিস্থল সংহিতা। বায়ুপুরাণে কৃষ্ণ যজুর্বেদের ৮৬টি শাখার উল্লেখ করেছে। যদিও এর অধিকাংশই অধুনা অবলুপ্ত বলে মনে করা হয়। কঠ শাখাটিকে ভারতের কোনো কোনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে 'চরক' (পর্যটক) শাখার প্রশাখা বলে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ, এই শাখার অনুগামীরা নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে অধ্যয়ন করতেন।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখাসমূহ:

শাখার নাম: তৈত্তিরীয়
উপশাখার সংখ্যা: ২

কাণ্ড: ৭
প্রপাঠক: ৪২
মন্ত্রসংখ্যা:
সংশ্লিষ্ট অঞ্চল: দক্ষিণ ভারত

শাখার নাম: মৈত্রয়ানী
উপশাখার সংখ্যা: ৬
কাণ্ড: ৪
প্রপাঠক: ৫৪
মন্ত্রসংখ্যা:
সংশ্লিষ্ট অঞ্চল: পশ্চিম ভারত

শাখার নাম: কঠক (চরক)
উপশাখার সংখ্যা: ১২
কাণ্ড: ৫
প্রপাঠক: ৪০
মন্ত্রসংখ্যা: ৩০৯৩
সংশ্লিষ্ট অঞ্চল: কাশ্মীর, উত্তর ভারত, পূর্ব ভারত

BANGLADARSHAN.COM

শাখার নাম : কপিস্থল
উপশাখার সংখ্যা : ৫
কাণ্ড : ৬
প্রপাঠক : ৪৮
সংশ্লিষ্ট অঞ্চল: হরিয়ানা, রাজস্থান

এই শাখাগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বাধিক সুসংরক্ষিত শাখাটি হল তৈত্তিরীয় সংহিতা। কোনো কোনো মতে, এই শাখাটির প্রতিষ্ঠাতা যক্ষের শিষ্য তিত্তিরি। পাণিনি এই শাখাটির উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটি যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত ঋষি তিত্তিরির শিষ্যদের দ্বারা অনুসৃত বলে মনে করা হয়।

মৈত্রয়ানী সংহিতা হল প্রাচীনতম যজুর্বেদ সংহিতা যেটি এখনও বর্তমান। এটির সঙ্গে তৈত্তিরীয় সংহিতার বিষয়বস্তুর বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া অধ্যায় বিন্যাসেও তৈত্তিরীয় সংহিতার সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য দেখা যায়। তবে এই সংহিতায় অনেক বেশি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

কিংবদন্তি অনুসারে, কঠক সংহিতা বা চরক-কঠক সংহিতার সংকলক হলেন বৈশম্পায়নের শিষ্য কঠ।

মৈত্রয়ানী সংহিতার মতো এতেও অপেক্ষাকৃত নবীন তৈত্তিরীয় সংহিতা অপেক্ষা কিছু কিছু অনুষ্ঠানের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। উল্লেখ্য, তৈত্তিরীয় সংহিতায় স্থানে স্থানে এই ধরনের বর্ণনা সংক্ষেপিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। কপিস্থল সংহিতা বা কপিস্থল-কঠ সংহিতার নামকরণ করা হয়েছে ঋষি কপিস্থলের নামানুসারে। এটি কেবলমাত্র কয়েকটি বৃহৎ খণ্ডাংশ ও উচ্চারণ-চিহ্ন ছাড়া সংকলিত আকারে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে কঠক সংহিতার একটি পাঠান্তর মাত্র।

বিন্যাস

যজুর্বেদের প্রতিটি আঞ্চলিক শাখায় গ্রন্থের অংশ হিসেবে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ রয়েছে । মূল গ্রন্থের সঙ্গে একাধিক শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও প্রতিশাখ্য রয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদের গ্রন্থবিন্যাস মধ্যণ্ডিন ও কান্ব শাখাদ্বয়ে একই রকম। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, পরস্কর গৃহ্যসূত্র ও শুক্ল যজুর্বেদ প্রতিশাখ্য এই অংশের সঙ্গে যুক্ত।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রতিটি শাখার ব্রাহ্মণ অংশটি সংহিতা অংশের সঙ্গে মিশ্রিত। এর ফলে এটি গদ্য ও পদ্যের একটি মিশ্র রূপের জন্ম দিয়েছে, যা এটিকে অস্পষ্ট ও অবিন্যস্ত করে রেখেছে।

বিষয়বস্তু

BANGLADARSHAN.COM

সংহিতা

বাজসনেয়ী সংহিতা ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সংহিতায় নিম্নোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডগুলির পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে:

শুক্ল যজুর্বেদের অধ্যায়সমূহ

****

অধ্যায়ের সংখ্যা : ১-২
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: দশপূর্ণমাস
(পূর্ণিমা ও অমাবস্যা কৃত্য)
দিন: ২
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: অগ্নিতে গোদুগ্ধ আহুতি প্রদান। গাভীর থেকে গোবৎসকে (বাছুর) বিচ্ছিন্নকরণ

অধ্যায়ের সংখ্যা: ৩
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: অগ্নিহোত্র
দিন: ১

ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: অগ্নিতে ননী (মাখন) ও দুগ্ধ আহুতি প্রদান। বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ–এই তিন প্রধান ঋতুর আবাহন।

অধ্যায়ের সংখ্যা: ৪-৮
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: সোমযজ্ঞ
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: নদীতে অবগাহন (স্নান)। অগ্নিতে দুগ্ধ ও সোমরস আহুতি প্রদান। চিন্তা ও বাক্যের দেবতাদের আহুতি প্রদান। শস্যরক্ষা, গবাদিপশু রক্ষণ ও দৈত্যদানব দূরীকরণের জন্য বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা।

অধ্যায়ের সংখ্যা: ৯- ১০
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: বাজপেয় ও রাজসূয়
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: বিজয় উৎসব, রাজার রাজ্যাভিষেক। অগ্নিতে ননী ও সুরা (একপ্রকার মদ্য) আহুতি প্রদান।

অধ্যায়ের সংখ্যা : ১১- ১৮
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: অগ্নিচয়ন
দিন: ৩৬০
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: যজ্ঞের অগ্নির জন্য বেদীপ্রস্তুতের পদ্ধতি ও সেই সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড। বৃহত্তম বেদীটি বাজপাখির বিস্তারের ন্যায় বড়ো।

অধ্যায়ের সংখ্যা: ১৯- ২১
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: সৌত্রমণি
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: অগ্নিতে মসর (সিদ্ধ-করা জোয়ার মিশ্রিত চাল-যবের মিশ্রণ) আহুতি। সোমরস পানে অশুভ প্রভাব নিবারণ। সিংহাসনচ্যুত রাজা, যুদ্ধে গমনোদ্যত সৈন্যের জন্য প্রার্থনা এবং গবাদি পশু ও ধনাদির নিমতি প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা।

অধ্যায়ের সংখ্যা: ২২- ২৫
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: অশ্বমেধ
দিন: ১৮০ বা ৩৬০ দিন
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: কেবলমাত্র রাজার পালনীয়। একটি অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। তার পিছনে সশস্ত্র সেনাবাহিনী গমন করে। যেখানে কেউ সেই অশ্বের গতি রোধ করে বা ভ্রাম্যমাণ অশ্বের ক্ষতি করে তাকে রাজ্যের শত্রু ঘোষণা করা হয়। অশ্বটি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে সেনারা সেটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলি দেয়। এই অংশে ভ্রাম্যমাণ অশ্বটির স্তুতি ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সংকলিত রয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

অধ্যায়ের সংখ্যা: ২৬- ২৯
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম:
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: পূর্বোক্ত যজ্ঞের আরো কিছু পদ্ধতি।

অধ্যায়ের সংখ্যা: ৩০- ৩১
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: পুরুষমেধ
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: পুরুষের (বিশ্বসত্ত্বা) প্রতীকী বলিদান। ম্যাক্স মুলারও অন্যান্যদের মতে, একজন ব্যক্তিকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়। তবে অনুষ্ঠানের শেষে তাকে কোনোরকম ক্ষতি বা অঙ্গহানি ব্যতিরেকেই মুক্তি দেওয়া হয়। এটি অশ্বমেধের বিকল্প। এই যজ্ঞে বিশ্বসৃষ্টির সমাপ্তি পরিদর্শিত হয়ে থাকে।

অধ্যায়ের সংখ্যা: ৩২- ৩৪
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: সর্বমেধ
দিন: ১০
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: উপরোক্ত পুরুষমেধ যজ্ঞের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞ হিসেবে কথিত। সার্বজনীন সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য এই যজ্ঞ আয়োজিত হত। কারোর কল্যাণ কামনা বা গৃহত্যাগকারীর (বিশেষত শান্তি বা মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী) জন্য দধি ও ঘি আহুতি দেওয়া হয় এই যজ্ঞে।

BANGLADARSHAN.COM

অধ্যায়ের সংখ্যা : ৩৫
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: পিতৃযজ্ঞ
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া-সংক্রান্ত আচারসমূহ। পিতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ।

অধ্যায়ের সংখ্যা : ৩৬- ৩৯
ক্রিয়াকাণ্ডের নাম: প্রবর্গ্য
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: গ্রিফিথের মতে, এই অনুষ্ঠানটি দীর্ঘজীবন লাভ, অবিনশ্বর শক্তি, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, শান্তি ও সুখ লাভের জন্য আচরিত হত। এতে যজ্ঞের অগ্নিতে দুগ্ধ ও খাদ্যশস্য আহুতি দেওয়া হত।

অধ্যায়ের সংখ্যা: ৪০
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতি: এই অধ্যায়টি বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান-সংক্রান্ত নয়। এটি ঈশ উপনিষদ্ নামে একটি দার্শনিক নিবন্ধ। এই উপনিষদের উপজীব্য হল আত্মার প্রকৃতি। ৪০. ৬-সংখ্যক শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি আপন আত্মায় সমাহিত, তিনি সৃষ্ট সকল জীব ও সকল বস্তুকে দেখেন এবং সকল সত্ত্বায় তাঁর আত্মাকেই প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁর সংশয় থাকে না। ভাবনাও থাকে না।

মন্ত্রসমূহের গঠন:

যজুর্বেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত মন্ত্রগুলি একটি বিশেষ ধরনের ছন্দে নিবদ্ধ। এই মন্ত্রগুলি সবিতা (সূর্য), ইন্দ্র, অগ্নি, প্রজাপতি, রুদ্র ও অন্যান্যদের আবাহন ও স্তুতি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চতুর্থ খণ্ডের তৈত্তিরীয় সংহিতায় অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি (সংক্ষেপিত) রয়েছে, সবিতা মনকে একাগ্র করেন। চিন্তন সৃষ্টি করেন, আলোক দৃশ্যমান করে পৃথিবী থেকে অগ্নি আনয়ন করেন।

সবিতা সকল দেবতাকে মনের সঙ্গে যুক্ত করেন। যাঁরা মন থেকে আকাশে ও স্বর্গে গমন করেন, সবিতা তাঁদের আনয়ন করেন। তাঁরা মহতী আলোক সৃষ্টি করেন।

সকল দেবতাকে মনের সঙ্গে যুক্ত করে, যাঁরা মন থেকে আকাশে, স্বর্গে গমন করেন, তাঁদের, সবিতা তাঁদের আনয়ন কর যাঁরা মহা আলোক সৃষ্টি করেন।একাগ্র চিত্তে আমরা সবিতৃদেব কর্তৃক স্বর্গলাভের শক্তি অর্জন করি।

যাঁর যাত্রাপথ অন্য দেবতাগণ অনুসরণ করেন, ঈশ্বরের শক্তির স্তুতি করেন, যিনি মর্ত্যলোকের আনন্দময় স্থানগুলি রক্ষা করেন, তিনিই মহান দেবতা সবিতা।

BANGLADARSHAN.COM

সবিতৃদেব, অনুষ্ঠানসকল সফল করুন! অনুষ্ঠানের ধাতা, সৌভাগ্য আনয়ন করুন!
চিত্তশুদ্ধিকারী দিব্য গন্ধর্ব, আমাদের চিন্তনকে পরিশুদ্ধ করুন! বাগ্‌দেবতা আমাদের বাক্য মধুময় করুন!

সবিতৃদেব, এই যজ্ঞ সফল করুন! আমরা যেন দেবগণকে সম্মান করি, বন্ধু অর্জন করি, সর্বদা বিজয়ী হই, সম্পদ অর্জন করি ও স্বর্গলাভের অধিকারী হই!

– তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪। ১। ১, [৪৫]

এই জন্যই হয়তো আমরা বিশ্বরূপ হিসেবে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানের মন্ত্রে বলি:

ওঁ ধেয়ঃ সদা সবিতৃমন্ডলঃ মধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট
কেয়ুরবান কনককুন্ডলবান
হিরণ্ময়বপুধৃত কিরীটহারি শঙ্খচক্রঃ॥

শতপথ ব্রাহ্মণ

'শতপথ ব্রাহ্মণ' শব্দটির অর্থ 'একশো পথের ব্রাহ্মণ'। যে ব্রাহ্মণগুলি এখন পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে এই ব্রাহ্মণটিই দীর্ঘতম। স্টালের মতে, এই ব্রাহ্মণটি হলো "অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিষয়ে জটিল মতামতগুলির একটি যথার্থ বিশ্বকোষ বা বিশ্বভান্ডার।"

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে এগেলিং শতপথ ব্রাহ্মণ অনুবাদ করেন। এটি বহুবার মুদ্রিত হওয়ার কারণে একটি বহুপঠিত ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। তবে এটির ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল ব্যবহারও হয়েছে। তার কারণ হিসেবে স্টাল বলেছেন, "এই ব্রাহ্মণে 'যেকোনো' তত্ত্বের সমর্থনে যথেষ্ট উপাদান রয়েছে।" শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম অনুবাদক এগেলিং এটিকে বলেছিলেন, "উপযুক্ত যুক্তিনিষ্ঠার পরিবর্তে দুর্বল প্রতীকতত্ত্ব", যা রহস্যবাদ বিষয়ে খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান পার্থক্যের মধ্যে প্রাপ্ত "আনুমানিক অসারতা"র তুল্য।

উপনিষদ্

ছয়টি প্রধান উপনিষদ্ যজুর্বেদের অন্তর্গত।

গুরুত্ব

যজুর্বেদের যুগে ঋত্বিকদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ভক্তির চেয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। শুক্লযজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে রুদ্রদেবতা একাধারে ভয়ংকর ও কল্যাণকর সংহারক ও পালক। তিনি আর্য, অনার্য ও অন্ত্যজ জাতির দেবতা হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণযজুর্বেদকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের জনক বলা হয়। যজুর্বেদের সাহিত্যিক মূল্য না-থাকলেও ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণায়, মন্ত্র ও প্রার্থনাদির উৎপত্তি, তাৎপর্য এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় এই বেদের চর্চা অপরিহার্য। এই বেদে বর্ণিত 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' পরবর্তীকালে পিতৃশ্রাদ্ধাদিরূপে পরিণত হয়েছে।

সামবেদ

সামবেদ (সংস্কৃত: सामवेद) (সামন্ বা গান ও বেদ বা জ্ঞান থেকে) হল সংগীত ও মন্ত্রের বেদ।
সামবেদ হিন্দুধর্মের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের দ্বিতীয় ভাগ। এটি বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সামবেদে ১,৮৭৫টি মন্ত্র রয়েছে। এই শ্লোকগুলি মূলত বেদের প্রথম ভাগ ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। এটি একটি প্রার্থনামূলক ধর্মগ্রন্থ। বর্তমানে সামবেদের তিনটি শাখার অস্তিত্ব রয়েছে। এই বেদের একাধিক পাণ্ডুলিপি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

গবেষকেরা সামবেদের আদি অংশটিকে ঋগ্বৈদিক যুগের সমসাময়িক বলে মনে করেন। তবে এই বেদের যে অংশটির অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত রয়েছে, সেটি বৈদিক সংস্কৃত ভাষার পরবর্তী-ঋগ্বৈদিক মন্ত্র পর্যায়ে রচিত। এই অংশের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময়। তবে সামবেদ যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের সমসাময়িক কালে রচিত।

বহুপঠিত ছান্দোগ্য ও কেন উপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত। এই দুই উপনিষদ্ প্রধান (মুখ্য) উপনিষদ্গুলির অন্যতম এবং হিন্দু দর্শনের (প্রধানত বেদান্ত দর্শন) ছয়টি শাখার উপর এই দুই উপনিষদের প্রভাব অপরিসীম। সামবেদকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যকলার মূল বলে মনে করা হয়।

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ নিজেকে চার বেদের মধ্যে সামবেদ বলে বর্ণনা করেছেন। সামবেদকে সাম বেদ বানানেও অভিহিত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

****

বৈদিক সাহিত্যের ভৌগোলিক অবস্থান। সামবেদের কৌঠুম (উত্তর ভারত) ও জৈমিনীয় (মধ্যভারত) শাখাদুটির অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই শাখাদুটির একাধিক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

সামবেদ হল 'মন্ত্রবেদ' বা 'মন্ত্র-সংক্রান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার'। ফ্রিটস স্টাল সামবেদকে 'সুরারোপিত ঋগ্বেদ' বলে উল্লেখ করেছেন। এই বেদ প্রাচীনতম সংগীত ('সামন্') ও ঋগ্বৈদিক মন্ত্রগুলির সংমিশ্রণ। ঋগ্বেদের তুলনায় সামবেদে মন্ত্রের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু পাঠ-সংক্রান্ত দিক থেকে এই বেদ বৃহত্তর। কারণ, এই বেদে সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত মন্ত্রগুলির সুরান্তর তালিকাভুক্ত হয়েছে।

সামবেদে স্বরলিপিভুক্ত সুর পাওয়া যায়। এগুলিই সম্ভবত বিশ্বের প্রাচীনতম স্বরলিপিভুক্ত সুর, যা আজও পাওয়া যায়। স্বরলিপিগুলি সাধারণত মূল পাঠের ঠিক উপরে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠের অভ্যন্তরে নিহিত রয়েছে। এই স্বরলিপি সামবেদের শাখা অনুসারে অক্ষর বা সংখ্যার আকারে নিবদ্ধ।

শাখা

আর. টি. এইচ. গ্রিফিথের মতে, সামবেদ সংহিতার তিনটি শাখা রয়েছে:

কৌঠুম শাখাটি গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশায় প্রচলিত। কয়েক দশক ধরে এটি বিহারের দারভাঙ্গা অঞ্চলেও প্রচলিত রয়েছে।

রাণায়নীয় শাখাটি মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গোকর্ণ ও ওড়িশার কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত।
জৈমিনীয় শাখাটি কর্ণাট, তামিলনাড়ু ও কেরল অঞ্চলে প্রচলিত।

বিন্যাস

সামবেদের আদি সংকলনটি বৈদিক দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্রের স্তোত্র দিয়ে শুরু হয়েছে।

সামবেদ দুটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চারটি ‘গান’ বা তান-সংকলন রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে তিনটি ‘আর্চিক’ বা মন্ত্র-সংকলন। ‘গান’ খণ্ডের এক-একটি তানের সঙ্গে ‘আর্চিক’ খণ্ডের এক-একটি মন্ত্র সংযুক্ত। ‘গান’ সংকলনটি আবার ‘গ্রামগেয়’ ও ‘অরণ্যগেয়’—এই দুই পর্বে বিভক্ত। অন্যদিকে ‘আর্চিক’ খণ্ডটি ‘পূর্বাচিক’ ও ‘উত্তরার্চিক’—এই দুই পর্বে বিভক্ত। ‘পূর্বার্চিক’ নামক পর্বটিতে ৫৮৫টি একক মন্ত্র রয়েছে। এগুলি দেবতা অনুসারে বিন্যস্ত। অন্যদিকে ‘উত্তরার্চিক’ বিন্যস্ত হয়েছে ক্রিয়াকাণ্ড অনুসারে। ‘গ্রামগেয়’ পর্বটি সাধারণের জন্য। অন্যদিকে ‘অরণ্যগেয়’ পর্বটি অরণ্যের নির্জনতায় ব্যক্তিগত ধ্যানের জন্য। সাধারণভাবে, ‘পূর্বার্চিক’ সংকলনটি ‘গ্রাময়েগ-গান’ নির্ঘণ্টে বর্ণিত তানে গীত হত। পুষ্পসূত্র ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে কিভাবে মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্র যুক্ত করা উচিত তার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের মতো সামবেদেও আদি সংকলনটি অগ্নি ও ইন্দ্রের স্তোত্র দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে তাত্ত্বিক আলোচনা ও দর্শনতত্ত্বে উপনীত হয়েছে এবং শ্লোকের ছন্দ ধীরে ধীরে নিম্নগামী হয়েছে। উইটজেলের মতে, সামবেদের উত্তর সংকলনটি বিষয়বস্তু মূল ঋগ্বেদের থেকে খুব কম ক্ষেত্রেই দূরে সরে গিয়েছে। এগুলি ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলিরই গীতিরূপ। সামবেদের উদ্দেশ্যটি আনুষ্ঠানিক। এই বেদের স্তোত্রগুলি ‘উদ্‌গাতৃ’ বা গায়ক পুরোহিতদের দ্বারা সংকলিত হয়।তাই এই মন্ত্রকে 'উদগীত' বলে ।

অন্যান্য বেদের মতো সামবেদেরও কয়েকটি স্তর রয়েছে। সামবেদের সংহিতাটি প্রাচীনতম
এবং উপনিষদগুলি নবীনতম স্তর।

সামবেদ

বৈদিক শাখা: কৌঠম-রাণায়নীয়
ব্রাহ্মণ: পঞ্চবিংশ ষড়বিংশ
উপনিষদ্: ছান্দোগ্য উপনিষদ্
শ্রৌতসূত্র: লাট্যায়ন দ্রাহ্যায়ন

বৈদিক শাখা: জৈমিনীয় বা তলবকার
ব্রাহ্মণ:জৈমিনীয়
উপনিষদ: কেন উপনিষদ্, জৈমিনীয় উপনিষদ্ শ্রৌতসূত্র: জৈমিনীয়

বিশ্লেষণ

সামবেদে ১,৫৪৯টি একক মন্ত্র রয়েছে। এগুলির মধ্যে ৭৫টি বাদে বাকি সবকটিই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। ঋগ্বেদের ৯ম ও ৮ম মণ্ডল থেকেই প্রধানত এই মন্ত্রগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি ঋগ্বৈদিক মন্ত্র সামবেদে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। গ্রিফিথের অনুবাদে পুনরাবৃত্তি সহ সামবেদ শাখার মোট মন্ত্রসংখ্যা ১,৮৭৫।

বিষয়বস্তু

সামবেদ সংহিতার মন্ত্রগুলি 'পাঠ' করার জন্য নয়। এগুলি সাংগীতিক স্বরলিপি, যা 'শোনা' আবশ্যকর্তব্য বলে মনে করা হয়।

স্টালের মতে, প্রাচীন ভারতে মন্ত্ররচনার আগে থেকেই তানগুলির অস্তিত্ব ছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি এই প্রাচীন সুরেই নিবদ্ধ হয়। কারণ, প্রথম দিকের কিছু শব্দ সুরের সঙ্গে খাপ খেলেও, পরবর্তীকালের শব্দগুলি একই মন্ত্রের সুরে ঠিক খাপ খায় না। সামবেদে 'স্তোভ' নামে একটি সৃজনশীল গঠনভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। এটির উদ্দেশ্য শব্দগুলিকে কাঙ্ক্ষিত সুরের সংগতে সজ্জিত, পরিবর্তিত বা চালনা করা। কয়েকটি মন্ত্রের সঙ্গে ঘুমপাড়ানি গানের অর্থহীন শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। স্টালের মতে, এর কারণও সম্ভবত একই। সামবেদে সংগীত, শব্দ, অর্থবোধ ও আধ্যাত্মিকতার একটি প্রথা এক সৃজনশীল সামঞ্জস্যের প্রতীকে নিহিত। গ্রন্থটি হঠাৎ খেয়ালে রচিত হয়নি।

কিভাবে একটি ঋগ্বৈদিক শ্লোকে সুরারোপ করা হয়েছে তার ছবি ধরা পড়ে সামবেদের প্রথম গানটির একাংশে:

সামবেদে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্র বীণা।

अग्न आ याहि वीतये - ঋগ্বেদ
৬। ১৬। ১০[২৩]
অগ্ন আ যাহি বীতযে

সামবেদের রূপ (জৈমিনীয় পাণ্ডুলিপি):
অ গ্না ই / আ যা হি বা ই / তা যা ই তা যা ই /

অনুবাদ:
হে অগ্নি, যজ্ঞে আগমন করুন।
– সামবেদ ১। ১। ১।, [১]

উপনিষদ্

হিন্দুধর্মের দুটি প্রধান উপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত। এদুটি হল ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও কেন উপনিষদ্। দুটি উপনিষদ্ই উচ্চমানের ছন্দোময় সাংগীতিক গড়নের জন্য বিখ্যাত। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন শাখার বিবর্তনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই উপনিষদের মধ্যে অন্তর্হিত দার্শনিক গড়নটি হিন্দুধর্মের বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার গবেষকদের 'ভাষ্যে' এই উপনিষদ্ থেকেই সর্বাধিক প্রমাণ দর্শিত হয়েছে। যেমন, আদি শঙ্কর তার বেদান্ত সূত্র ভাষ্য গ্রন্থে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে ৮১০টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। এই সংখ্যাটি অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত প্রমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সামবেদের তাণ্ড্য শাখার অন্তর্গত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতো ছান্দোগ্য উপনিষদ্ও এমন একটি গ্রন্থ-সংকলন যার অস্তিত পূর্বে পৃথক গ্রন্থাকারে ছিল। পরবর্তীকালে এক বা একাধিক প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এটি বৃহত্তর গ্রন্থের আকার গ্রহণ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের যথাযথ কালপঞ্জি অজ্ঞাত। তবে এটি সামবেদের নবীনতম স্তরের ধর্মগ্রন্থ। বিভিন্ন মত অনুসারে, ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ৮ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এটি রচিত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের গড়নটি ছন্দোময় ও সাংগীতিক। এই উপনিষদে বিভিন্ন ধারার আনুমানিক ও দার্শনিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১ম অধ্যায়ের ৮ম ও ৯ম খণ্ডে তিন 'উদ্গীথজ্ঞ' ব্যক্তির মধ্যে বিতর্কের বিবরণ রয়েছে। এই বিতর্কের বিষয়বস্তু 'উদ্গীথ' ও সকল লোকের উৎপত্তি ও আশ্রয়।

"এই লোকের আশ্রয় কি?"
(প্রবাহণ জৈবলি) বললেন, "আকাশ। স্থাবরজঙ্গমাদি এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ হতেই উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ে আকাশেই লীন হয়; কারণ আকাশই এই সকল লোক হতে মহত্তর; সুতরাং আকাশই পরম প্রতিষ্ঠা।
পূর্বোক্ত এই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর উদ্গীথ (পরমাত্মারূপে প্রতিপাদিত হলেন); অতএব উক্ত এই উদ্গীথ অনন্ত। যিনি শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ উদ্গীথকে (ওঁ) এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবনলাভ হয়, এবং তিনি শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ লোকসমূহ জয় করেন।

–ছান্দোগ্য উপনিষদ ১। ৯। ১-১। ৯। ২[২৮]

ম্যাক্স মুলারের মতে, উল্লিখিত এই 'আকাশ' শব্দটি পরে বেদান্ত সূত্রের ১। ১। ২২-সংখ্যক সূত্রে ব্রহ্মের বৈদিক ধারণাটির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।পল ডুসেনের ব্যাখ্যা অনুসারে, 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ "সমগ্র বিশ্বের চেতনায় উপস্থিত একটি সৃজনশীল তত্ত্ব"। ছান্দোগ্য উপনিষদে ধর্ম ও অন্যান্য অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে:

ধর্মের বিভাগ তিনটি–যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও দান একটি ধর্মবিভাগ; তপস্যা দ্বিতীয় বিভাগ; এবং যাবজ্জীবন আচার্যগৃহে শরীরক্ষয়কারী গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীই তৃতীয় বিভাগ। এঁরা সকলেই পুণ্যলোকে গমন করেন। কিন্তু যিনি (প্রণবরূপ ব্রহ্মপ্রতীকে) ব্রহ্মোপাসনা করেন তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

–ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ২। ২৩। ১[৩১][৩২][৩৩]

কেন উপনিষদ্

সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণ শাখার শেষ পর্যায়ে কেন উপনিষদ্ নিহিত রয়েছে।এই উপনিষদ্ আকারে অনেকটাই ছোটো। তবে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলির বিচারের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ছান্দোগ্য উপনিষদেরই মতো। উদাহরণস্বরূপ, কেন উপনিষদের চতুর্থ খণ্ডে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জীবের অন্তরে আত্মজ্ঞানের জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পিপাসা থাকে। এই আত্ম-ব্রহ্মজ্ঞান হল 'তদ্বনম্' বা তুরীয় আনন্দ। কেন উপনিষদের শেষ পংক্তিগুলিতে বলা হয়েছে, নৈতিক জীবন আত্মজ্ঞান ও আত্মব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ।

তপস্যা,দম,কর্ম-উক্ত উপনিষদের পাদসমূহ, বেদসমূহ তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ, সত্য তাঁর নিবাসস্থল।

–কেন উপনিষদ্ ৪। ৮ (পংক্তি ৩৩)[৪০]

রচনাকাল ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ

মাইকেল উইটজেল বলেছেন, সামবেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থের কোনো সঠিক রচনাকাল নির্ধারন করা সম্ভব নয়। তার মতে, সামবেদ সংহিতার রচিত হয়েছিল ঋগ্বেদের ঠিক পরেই। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই অংশ রচিত হয়। সেই হিসেবে এই
গ্রন্থ অথর্ববেদ ও যজুর্বেদের সমসাময়িক।

সামবেদ পাঠের প্রায় ১২টি ধরন রয়েছে। যে তিনটি সংস্করণের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে, তার মধ্যে জৈমিনীয় ধারাটি সামবেদ পাঠের প্রাচীনতম অস্তিত্বমান ধারাটিকে রক্ষা করে চলেছে।

পাণ্ডুলিপি ও অনুবাদ

সামবেদের কৌঠুম শাখার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র ও অতিরিক্ত সূত্রগুলি মূলত বি. আর. শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। জৈমিনীয় শাখার কিছু অংশ এখনও অপ্রকাশিত। ডব্লিউ. ক্যালান্ড সামবেদ সংহিতার প্রথম অংশের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। রঘু বীর ও লোকেশ চন্দ্র সামবেদ ব্রাহ্মণের কিছু অংশ প্রকাশ

করেন। তারা সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বল্প-পরিচিত উপনিষদগুলি প্রকাশ করলেও শ্রৌতসূত্রের সামান্য কিছু অংশ মাত্র প্রকাশ করেন। গীতিগ্রন্থগুলি এখনও অপ্রকাশিতই রয়ে গিয়েছে।

১৮৪৮ সালে থিওডোর বেনফি সামবেদের একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশ করেন। সত্যব্রত সামাশ্রমী ১৮৭৩ সালে একটি সম্পাদিত সংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালে র্যা লফ গ্রিফিথ সামবেদের একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

সামবেদ ঋগ্বেদের মতো গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কারণ, সাংগীতিক সৌন্দর্য ও সৃজনশীলতা এবং ৭৫টি শ্লোক ছাড়া এই গ্রন্থ মূলত ঋগ্বেদ থেকেই গৃহীত। সেই কারণে ঋগ্বেদ পাঠই যথেষ্ট মনে করা হয়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আমাদের সংগীত প্রথা [ভারতীয়] সামবেদে এর উৎসটিকে স্মরণ করে এবং মর্যাদা দেয়... [সামবেদ হল] ঋগ্বেদের সাংগীতিক সংস্করণ।-ভি. রাঘবন

গাই বেকের মতে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যের মূল সামবেদ, উপনিষদ্ ও আগম শাস্ত্রের ধ্বনি ও সংগীত-সংক্রান্ত দিক্‌নির্দেশিকার মতে নিহিত। গান ও মন্ত্রপাঠ ছাড়াও সামবেদে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজানোর নিয়ম ও নির্দেশিকা গন্ধর্ববেদ নামে পৃথক একটি সংকলনে পাওয়া যায়। এটি সামবেদের সঙ্গে যুক্ত একটি উপবেদ। সামবেদে বর্ণিত মন্ত্রপাঠের গড়ন ও তত্ত্ব ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পকলার গঠনগত আদর্শগুলিকে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে সামবেদের অবদান সংগীতজ্ঞরা বহুলভাবে স্বীকার করে থাকেন।

অথর্ববেদ

অথর্ববেদ (সংস্কৃত: अथर्ववेद, অথর্বণ ও বেদ শব্দের সমষ্টি) হল হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ বেদের চতুর্থ ভাগ। 'অথর্ববেদ' শব্দটি সংস্কৃত 'অথর্বণ' (দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী) ও 'বেদ' (জ্ঞান) শব্দ-দু'টির সমষ্টি। অথর্ববেদ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তীকালীন সংযোজন। অথর্ববেদ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ২০টি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৭৩০টি স্তোত্র ও প্রায় ৬,০০০ মন্ত্র আছে। অথর্ববেদের এক-ষষ্ঠাংশ স্তোত্র ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। ১৫শ ও ১৬শ খণ্ড ব্যতীত এই গ্রন্থের স্তোত্রগুলি নানাপ্রকার বৈদিক ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থের দুটি পৃথক শাখা রয়েছে। এগুলি হল পৈপ্পলাদ ও শৌনকীয়। এই শাখাদুটি আজও বর্তমান। মনে করা হয় যে, পৈপ্পলাদ শাখার নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলি হারিয়ে গিয়েছে। তবে ১৯৫৭ সালে ওড়িশা থেকে একগুচ্ছ সুসংরক্ষিত তালপাতার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়।

অথর্ববেদকে অনেক সময় 'জাদুমন্ত্রের বেদ' বলা হয়। তবে অন্যান্য গবেষকরা এই অভিধাটিকে সঠিক নয় বলেই মত প্রকাশ করেছেন। অথর্ববেদের সংহিতা অংশটি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে উদীয়মান জাদুমন্ত্রমূলক ধর্মীয় রীতিনীতিগুলির প্রতিফলন। কুসংস্কারমূলক আশঙ্কা ও দৈত্যদানব কর্তৃক আনীত অমঙ্গল দূরীকরণ এবং ভেষজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক মিশ্রণ থেকে উৎপন্ন ঔষধের কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদের অনেকগুলি খণ্ড জাদুমন্ত্র ছাড়া অনুষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান ও দিব্যজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। কেনেথ জিস্কের মতে, অথর্ববেদ ধর্মীয় ঔষধ-চিকিৎসাবিদ্যার বিবর্তনের সেই প্রাচীনতম নথিগুলির অন্যতম যা আজও পাওয়া যায়। তার মতে, অথর্ববেদ 'প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের লোকচিকিৎসার আদি রূপটি' প্রকাশ করেছে।

সম্ভবত সামবেদ ও যজুর্বেদের সমসাময়িক কালে অথবা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ – ১০০০ অব্দ নাগাদ অথর্ববেদ রচিত হয়েছিল। সংহিতা অংশটি ছাড়া অথর্ববেদের একটি ব্রাহ্মণ অংশ রয়েছে এবং এই বেদের শেষাংশ উপনিষদ্ দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে। অথর্ববেদের উপনিষদ্ বা শেষাংশ (বেদান্ত) তিনটি প্রধান উপনিষদ্ নিয়ে গঠিত। এগুলি হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করেছে। এগুলির নাম হল মুণ্ডক উপনিষদ্, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ও প্রশ্ন উপনিষদ্।

নাম-ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা

মনিয়ার উইলিয়ামসের মতে, অথর্ববেদের নামকরণ করা হয়েছে পৌরাণিক পুরোহিত অথর্বণের নাম অনুসারে। অথর্বণ প্রথম যাগযজ্ঞ ও সোমরস উৎসর্গ করার প্রথা উদ্ভব করেন এবং 'রোগ ও বিপর্যয়ের প্রতিকূল পদ্ধতি ও মন্ত্রগুলি' রচনা করেন। মনিয়ার উইলিয়ামস উল্লেখ করেছেন যে, অগ্নির একটি অধুনা-অবলুপ্ত নাম ছিল 'অথর'। লরি প্যাটনের মতে, 'অথর্ববেদ' নামটির অর্থ 'অথর্বণগণের বেদ'।

অথর্ববেদের প্রাচীনতম নামটি এই বেদেই (১০। ৭। ২০) উল্লিখিত হয়েছে। এটি হল 'অথর্বাঙ্গিরসঃ।' দুই জন বৈদিক ঋষি অথর্বণ ও আঙ্গিরসের নামানুসারে এই নামটি এসেছে। এই বেদের প্রত্যেকটি শাখার নিজস্ব নাম রয়েছে। যেমন 'শৌনকীয় সংহিতা'। এর অর্থ 'শৌনকের সংকলিত গ্রন্থ।' 'অথর্বণ' ও 'আঙ্গিরস' নাম দু-টি সম্পর্কে মরিস ব্লুমফিল্ড বলেছেন,এই নামদুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতক। প্রথম নামটি মাঙ্গলিক। অন্যদিকে দ্বিতীয় নামটি প্রতিকূল জাদুবিদ্যার অর্থবাচক। কালক্রমে ইতিবাচক মাঙ্গলিক দিকটি অধিকতর সমাদর লাভ করে এবং 'অথর্ববেদ' নামটিই প্রচলিত হয়। জর্জ ব্রাউনের মতে, পরবর্তী নাম 'আঙ্গিরস' অগ্নি ও বৈদিক পুরোহিতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সম্ভবত এটির সঙ্গে নিপ্পুরের একটি আরামিক গ্রন্থে প্রাপ্ত প্রোটো-ইন্দো ইউরোপীয় 'আঙ্গিরোস'-এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে।

মাইকেল উইটজেল বলেছেন, 'অথর্বণ' শব্দের মূল সম্ভবত 'অথর্বণ' বা '[প্রাচীন] পুরোহিত, জাদুকর।' এর সঙ্গে আবেস্তান 'আওরাউয়ান' (āθrauuan) বা 'পুরোহিত' ও ট্রোকারিয়ান 'অথ্র' বা 'মহত্তর শক্তি' কথাদুটির

সম্পর্ক আছে।

অথর্ববেদ 'ভার্গবাঙ্গিরসঃ' ও 'ব্রহ্মাবেদ' নামেও পরিচিত। ঋষি ভৃগু ও ব্রহ্মার নামে এই দুটি নাম এসেছে।

গ্রন্থ

অথর্ববেদ সংহিতার একটি পৃষ্ঠা। এটি গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ।

অথর্ববেদ ২০টি খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ৭৩০টি স্তোত্র ও ৬,০০০ শ্লোক আছে। প্যাট্রিক অলিভেল ও অন্যান্য গবেষকদের মতে, এই গ্রন্থ বৈদিক সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত মতবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক সংকলন। এটি যজুর্বেদের মতো শুধুমাত্র একটি ধর্মানুষ্ঠানবিধির সংকলন নয়।

শাখা

চরণব্যূহ নামে পরবর্তীকালের একটি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসারে, অথর্ববেদের ৯টি শাখা ছিল। এগুলি হল:

পৈপ্পলাদ
স্তৌদ
মৌদ
শৌনকীয়
জাযল
অলদ
ব্রহ্মবাদ
দেবদুর্শ ও
চারণবৈদ্য

এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র শৌনকীয় শাখা, এবং অধুনা-আবিষ্কৃত পৈপ্পলাদ শাখার একটি পাণ্ডুলিপিই এখন বর্তমান। পৈপ্পলাদ সংস্করণটি প্রাচীনতর। এই দুইটি শাখা বিন্যাসপ্রণালী এবং বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে পৃথক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৈপ্পলাদ শাখার ১০ খণ্ডটি অদ্বৈতবাদ, 'ব্রহ্মের একত্ব', সমগ্র জীবজগৎ ও বিশ্ব' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে।

বিন্যাস

মূল অথর্ববেদ সংহিতা ১৮টি 'কাণ্ড' বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। শেষ কাণ্ডদুটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। বেদের অপর ভাগগুলি বিষয় বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নামানুসারে বিন্যস্ত হলেও, অথর্ববেদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এই বেদে বিষয়গুলি স্তোত্রের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি কাণ্ডে প্রায় সমসংখ্যক শ্লোকের স্তোত্র সংকলিত

হয়েছে। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলিতে ক্ষুদ্রতম স্তোত্রের সংকলনটিকে প্রথম কাণ্ড বলা হয়েছে। এরপর অধিকতর বৃহদায়তন স্তোত্রের সংকলনগুলি দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদিক্রমে বিন্যস্ত। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি এর বিপরীত ক্রমও দেখা যায়। বেশিরভাগ স্তোত্রই কাব্যিক এবং বিভিন্ন ছন্দে নিবদ্ধ। তবে গ্রন্থের এক-ষষ্ঠাংশ গদ্যে রচিত।

অথর্ববেদের অধিকাংশ স্তোত্র এই বেদেরই অন্তর্গত। কেবল এই গ্রন্থের এক-ষষ্ঠাংশ স্তোত্র ঋগ্বেদ (মুখ্যত ১০ম মণ্ডল) থেকে গৃহীত। ১৯শ কাণ্ডটি অনুরূপ প্রকৃতির একটি পরিশিষ্ট। এটি সম্ভবত নতুন রচনা এবং পরবর্তীকালের সংযোজন।[১৮] অথর্ববেদ সংহিতার ২০শ কাণ্ডের প্রায় সম্পূর্ণতই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত।

অথর্ববেদের ২০টি কাণ্ডে সংকলিত স্তোত্রগুলিতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ৭টি কাণ্ডে মোটামুটি সব ধরনের চিকিৎসার জন্য জাদুমন্ত্র ও জাদুর কথা। মাইকেল উইটজেল বলেছেন, এগুলি জার্মানিক ও হাইটটাইট জাদুমন্ত্রগুলির অনুরূপ। সম্ভবত এগুলিই গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। ৮ম থেকে ১২শ খণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ১২শ থেকে ১৮শ কাণ্ড পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে
জীবনের সংস্কারমূলক অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে।

বৈতান সূত্র ও কৌশিক সূত্রের মতো শ্রৌতসূত্রগুলি অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার সঙ্গে যুক্ত। এগুলি অথর্বণ ‘প্রায়শ্চিত্ত’, দু-টি ‘প্রতিশাখ্য’ ও একটি ‘পরিশিষ্ট’ সংকলন রূপে সংকলিত হয়েছে। অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার সঙ্গে অগস্ত্য ও পৈঠিনসী সূত্রদু-টি যুক্ত। এগুলি হারিয়ে গিয়েছে, এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

বিষয়বস্তু

ঋক বেদের মত অথর্ববেদের মূল আরাধ্য দেবতা রুদ্র শিব কিন্তু এখানে তাঁর উপস্থিতি আরো স্পষ্ট । ভাষাও আরেকটু কম সরল। অথর্ববেদ সংহিতায় যে স্তোত্রগুলি আছে তার অনেকগুলিই জাদুমন্ত্র। বিশেষ কোনো কামনা সিদ্ধির জন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা বা তার হয়ে কোনো জাদুকরের দ্বারা এগুলির উচ্চারণের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই স্তোত্রগুলির অধিকাংশই প্রিয়জনের দীর্ঘায়ু কামনা বা কোনো রোগ থেকে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত মন্ত্র। এই সব ক্ষেত্রে রোগীকে গাছগাছড়া (পাতা, বীজ, শিকড়) প্রভৃতি বস্তু ও একটি কবচ দেওয়ার বিধান রয়েছে। কয়েকটি জাদুমন্ত্র সৈনিকদের জন্য। এগুলির উদ্দেশ্য যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করা। কয়েকটি আবার উৎকণ্ঠিত প্রেমিকের জন্য। এগুলির উদ্দেশ্য প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাহত করে অনিচ্ছুক প্রণয়ীকে বশীকরণ। কয়েকটি ক্রীড়া বা বাণিজ্যে সাফল্য, অধিক গবাদিপশু ও শস্যলাভ এবং ঘরের ছোটোখাটো বিপদআপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য। কয়েকটি স্তোত্র জাদুমন্ত্র-সম্পর্কিত নয়। এগুলি প্রার্থনা ও দার্শনিক চিন্তামূলক।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তু অন্য তিন বেদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯শ শতাব্দীর ভারততত্ত্ববিদ ওয়েবার এই পার্থক্য সম্পর্কে লিখেছেন, দুই সংকলনের [ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ] চরিত্র অবশ্যই অনেকাংশে ভিন্ন। ঋগ্বেদে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক অনুভূতি এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রীতির ভাব রয়েছে। অন্যদিকে অথর্ববেদে এর

বিপরীতে রয়েছে প্রকৃতির অমঙ্গলকারী সত্ত্বার প্রতি আশঙ্কা ও তার জাদুশক্তির কথা। ঋগ্বেদে আমরা মানুষকে দেখি মুক্ত কর্মোদ্যত ও স্বাধীন রূপে। অথর্ববেদে আমরা দেখি মানুষ অণুশাসন ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলে বদ্ধ।

– অ্যালবার্ট ওয়েবার, জন গোন্ডার মতে, অথর্ববেদ সংহিতাকে শুধুমাত্র জাদুমন্ত্র ও জাদুবিদ্যার সংকলন হিসেবে দেখলে ভুল হবে। সংহিতা অংশে এই জাতীয় শ্লোক অবশ্যই আছে। তবে এতে জাদুমন্ত্র ছাড়াও কিছু গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের উপযোগী স্তোত্রও আছে। আবার কিছু দিব্যজ্ঞানমূলক চিন্তাভাবনাও দেখা যায়। যেমন, এখানে বলা হয়েছে, 'সকল বৈদিক দেবতারা এক।' সংহিতা ছাড়াও অথর্ববেদে একটি ব্রাহ্মণ ও কয়েকটি প্রভাবশালী উপনিষদ্ রয়েছে।

সংহিতা

শল্যচিকিৎসা ও ঔষধ-সংক্রান্ত মন্ত্রসমূহ অথর্ববেদে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্র ও শ্লোক আছে। যেমন, সদ্য-আবিষ্কৃত পৈপ্পলাদ সংস্করণের ৪। ১৫-সংখ্যক শ্লোকে অস্থিভঙ্গ ও ক্ষতে রোহিণী লতা (ফাইকাস ইনফেক্টোরিয়া, ভারতে পাওয়া যায়) কিভাবে বাঁধতে হয় তা উল্লিখিত হয়েছে: মজ্জার সঙ্গে মজ্জা একত্রে রাখো, গাঁটের সঙ্গে গাঁট একত্রে রাখো, খণ্ডিত মাংস একত্রে রাখো, পেশী একত্রে রাখো এবং অস্থিগুলি কত্রে রাখো। মজ্জা মজ্জায় যুক্ত হোক, অস্থি অস্থির সঙ্গে বৃদ্ধি পাক। আমরা পেশীর সঙ্গে পেশী একত্রে রাখবো, চামড়াকে চামড়ার সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেবো।

– অথর্ববেদ ৪। ১৫, পৈপ্পলাদ সংস্করণ[৩৪]

জ্বর, পাণ্ডুরোগ ও অন্যান্য রোগের জন্য মন্ত্র অথর্ববেদের অনেকগুলি স্তোত্র হল কোনো শিশু বা প্রণয়ীর আরোগ্য কামনা ও স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং পরিবারের সদস্যদের নিশ্চিন্ত করার জন্য প্রার্থনা ও মন্ত্রের সংকলন। বৈদিক যুগে মানুষ মনে করত অশুভ আত্মা, অপদেবতা ও দানবীয় শক্তির কারণে অসুখবিসুখ হয়। এই সব শক্তি আক্রান্তের দেহে প্রবেশ করে রোগ বাধায়। উদাহরণস্বরূপ, পৈপ্পলাদ সংস্করণের ৫। ২১-সংখ্যক স্তোত্রটিতে আছে, আমাদের পিতা স্বর্গ, আমাদের মাতা পৃথিবী, মানব-রক্ষাকারী অগ্নি, তাঁরা দশদিনের জ্বর আমাদের থেকে দূরে অপসারিত করুন। হে জ্বর, পৃষ্ঠে সোম-ধারণকারী তুষারাবৃত পর্বতসমূহ আমাদের আরোগ্যদাতা বার্তাবহ পবনকে এখান থেকে তোমাকে মরতগণের কাছে প্রেরণ করুন। নারীগণ তোমায় চায় না, পুরুষগণও না, শিশুরাও না, এখানে বৃদ্ধরাও জ্বর-কামনায় কাঁদেন না। আমাদের বৃদ্ধদের ক্ষতি কোরো না, আমাদের বৃদ্ধাদের ক্ষতি কোরো না, আমাদের ছেলেদের ক্ষতি কোরো না, আমাদের মেয়েদের ক্ষতি কোরো না। তুমি একাধারে বলস, কাশি, উদ্রজ নামক বাণ হানো। হে জ্বর, এগুলি থেকে আমাদের দূরে রাখো।

– অথর্ববেদ ৫। ২১, পৈপ্পলাদ সংস্করণ

আয়ুর্বেদ

'আয়ু' শব্দের অর্থ 'জীবন' এবং 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বা 'বিদ্যা'। 'আয়ুর্বেদ' শব্দের অর্থ জীবনজ্ঞান বা জীববিদ্যা। অর্থাত্ যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের কল্যাণ সাধন হয় তাকে আয়ুর্বেদ বা জীববিদ্যা বলা হয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বলতে ভেষজ বা উদ্ভিদের মাধ্যমে যে চিকিৎসা দেয়া হয় তাকে বুঝানো হয়। এই চিকিৎসা ৫০০০ বছরের পুরাতন। পবিত্র বেদ এর একটি ভাগ-অথর্ববেদ এর যে অংশে চিকিৎসা বিদ্যা বর্ণিত আছে তা-ই আয়ুর্বেদ। আদি যুগে গাছপালার মাধ্যমেই মানুষের রোগের চিকিৎসা করা হতো। এই চিকিৎসা বর্তমানে 'হারবাল চিকিৎসা' তথা 'অলটারনেটিভ ট্রিটমেন্ট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এই চিকিৎসা বেশী প্রচলিত। পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও এই চিকিৎসা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ মর্ডান এলোপ্যাথি অনেক ঔষধেরই side effect বা পার্শ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেমনঃ ঔষধ সিপ্রোফ্লক্রাসিন, ফ্লুক্লক্রাসিলিন, মেট্রোনিডাজল, ক্লক্রাসিলিন প্রভৃতি ঔষধ রোগ সারানোর পাশাপাশি মানব শরীরকে দুর্বল করে ফেলে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে স্মৃতিশক্তি, যৌনশক্তি, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়।

কিন্তু তবুও দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য মানুষ এগুলো ব্যবহার করে চলেছে। পক্ষান্তরে ডাক্তারও ঔষধ ব্যবসায়ীগণ এসকল পার্শ প্রতিক্রিয়া পরোয়া না করে সুনামের জন্য অনবরত যথেচ্ছহারে রোগীদেরকে এসকল ঔষধ দিয়ে যাচ্ছেন। তাই এখন এ ঔষধের বিকল্প ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত হিসেবে বিশ্বে এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

মূল ধারণা

আয়ুর্বেদ হলো ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের এক অঙ্গ। প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে ভারতবর্ষেরই মাটিতে এই চিকিৎসা পদ্ধতির উত্পত্তি হয়। আয়ুর্বেদ শব্দটি হলো দুটি সংস্কৃত শব্দের সংযোগে সৃষ্টি-যথা 'আয়ুষ', অর্থাৎ 'জীবন' এবং 'বেদ' অর্থাৎ 'বিজ্ঞান।' যথাক্রমে আয়ুর্বেদ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'জীবনের বিজ্ঞান।' এটি এমনই এক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে রোগ নিরাময়ের চেয়ে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়। রোগ নিরাময় ব্যবস্থা করাই এর মূল লক্ষ্য।

আয়ুর্বেদের মতে মানব দেহের চারটি মূল উপাদান হোল দোষ, ধাতু, মল এবং অগ্নি। আয়ুর্বেদে এগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাই এগুলিকে 'মূল সিদ্ধান্ত' বা 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল তত্ত্ব' বলা হয়।

দোষ

'দোষ' এর তিনটি মৌলিক উপাদান হল বাত, পিত্ত এবং কফ, যেগুলি সব একসাথে শরীরের ক্যাটাবোলিক ও এ্যানাবোলিক রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনটি দোষগুলির প্রধান কাজ হল শরীরের হজম হওয়া পুষ্টির উপজাত দ্রব্য শরীরের সমস্ত স্থানে পৌঁছে কোষ পেশী ইত্যাদি তৈরীতে সাহায্য করা। এই দোষগুলির জন্য কোন গোলযোগ হলেই তা রোগের কারণ হয়।

ধাতু

ধাতু হল যা মানব দেহটিকে বহন করে। আমাদের দেহে সাতটি টিশু সিস্টেম আছে, যথা রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ধাতু দেহের প্রধান পুষ্ঠি যোগায় এবং মানসিক বৃদ্ধি ও গঠনে সাহায্য করে।

মল

মল অর্থাৎ শরীরের নোংরা বর্জ্য পদার্থ বা আবর্জনা। এটা হল শরীরের ত্রয়ীর মধ্যে দোষ ও ধাতু ছাড়া তৃতীয়। মল প্রধানত তিন প্রকার-যথা মল, প্রস্রাব ও ঘাম। দেহের সুস্থতা বজায় রাখার জন্য মলের বর্জ্য পদার্থ শরীরের বাইরে বেড়োনো অত্যন্ত জরুরী। মলের দুটি প্রধান দিক আছে-মল ও কিত্ত। মল হল শরীরের বর্জ্য পদার্থ এবং কিত্ত হল ধাতুর আবর্জনা।

অগ্নি

শরীরের সমস্ত রাসায়নিক ও পাকসংক্রান্ত কাজ হয় অগ্নি নামক দৈহিক আগুনের সাহায্যে-একে বলা হয় অগ্নি। আমাদের লিভার এবং টিস্যু কোষে উৎপন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষকে অগ্নি নামকরণ করা হয়।

দৈহিক গঠন

আয়ুর্বেদে জীবনকে ভাবা হয় দেহ, অণুভূতি, মন এবং আত্মায় এর সমন্বয়। জীবিত মানব দেহ হল এই সব উপাদান যেমন তিন দোষ (ভাটা, পিত্ত এবং কফ), সাতটি প্রাথমিক টিস্যু (রস, রক্ত, মনসা, মেডা, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র) বা ধাতু, মল বা ঘাম-এসবের এক একত্রীভবন। দেহের বৃদ্ধি ও পচন পুরোটাই নির্ভর খাদ্যের উপর যা দোষ, ধাতু ও মল এ পরিবর্তিত হচ্ছে। হজম প্রক্রিয়া, শোষণ, পরিপাক প্রনালী ও খাদ্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর আমাদের স্বাস্থ্য ও ব্যাধি নির্ভর করে। আবার আমাদের শারীরিক সুস্থতার উপর মানসিক অবস্থা ও অগ্নির প্রভাবও আছে।

পঞ্চমহাভূত

আয়ুর্বেদের মতে মানব দেহ সহ এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের উপস্থিত সমস্ত পদার্থই পাঁচটি বিশেষ উপাদানের (পঞ্চমহাভূত) সমষ্টি-যেমন পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং মহাশুন্য। শরীরের গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন অনুযায়ী এই উপাদানগুলি বিভিন্ন মাত্রায় আমাদের দেহে উপস্থিত। শরীরের বৃদ্ধির জন্য যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি আমরা নিই, সেই খাদ্যের মধ্যেও এই উপাদানগুলি বিরাজমান, যা শরীরের অগ্নির সাহায্যে পরিপাক হয়ে পুষ্টির যোগান দিয়ে শারীরিক বিকাশ ঘটায়। শরীরের টিশুগুলি বাস্তবিক গঠন সংক্রান্ত ক্রিয়া চালায় এবং ধাতুগুলি হল পঞ্চমহাভূতের বিভিন্ন বিন্যাস দ্বারা গঠিত।

সুস্থতা এবং অসুস্থতা

মানব দেহের সুস্থতা এবং অসুস্থতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে দেহে উপস্থিত উপাদানগুলির ভারসাম্য ও শারীরিক স্থিতির উপর। শরীরের অন্তর্নিহিত বা বাহ্যিক বিভিন্ন কারণের জন্য এই প্রয়োজনীয় ভারসাম্যে তারতম্য

আসতে পারে যার ফলে অসুখ করে। এই ভারসাম্যের অভাব ঘটতে পারে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ভুলের জন্য বা ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাপন বা দৈনন্দিন জীবনে কুঅভ্যাসের জন্য। ঋতুর অস্বাভাবিকতা, ভুলভাবে ব্যায়াম বা ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং দেহ ও মনের অমিলপূর্ণ ব্যবহারও দেহ ও মনের ভারসাম্যের বিঘ্নতা ঘটায়। এর চিকিৎসা হল সঠিক খাদ্য, সু-জীবনযাত্রা ও স্বভাবের উন্নতির দ্বারা শরীর ও মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা, ঔষধ গ্রহণ, নিরাময় পঞ্চকর্ম এবং রসায়ন চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় সম্ভব।

রোগ নির্ণয়

আয়ুর্বেদে রোগীর শারীরিক ও মানসিক সম্পূর্ণ অবস্থার বিচার করে তবেই রোগ নির্ণয় করা হয়। চিকিত্সক আরো কিছু বিষয়ে ধ্যান দেন, যেমন রোগীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, হজমের ক্ষমতা, কোষ, পেশী ও ধাতু ইত্যাদি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আরও অণুধাবন করেন আক্রান্ত শারীরিক টিশুগুলি, ধাতু, কোন জায়গায় রোগ স্থিত, রোগীর রোধক্ষমতা, প্রাণশক্তি, দৈনন্দিন রুটিন এবং রোগীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিতগুলির কয়েকটি পরীক্ষাও দরকার হয়:

সাধারণভাবে শারীরিক পরীক্ষা
নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা
মূত্র পরীক্ষা

মল পরীক্ষা
জিহ্বা এবং চোখ পরীক্ষা
চামড়া এবং কান পরীক্ষা, স্পর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবনেন্দ্রিয় এর ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা।

চিকিৎসা

আরোগ্য বিদ্যার মূল কথাই হল যে সেটাই সঠিক চিকিত্সা যা রোগীকে সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয় এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করেন। আয়ুর্বেদের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যরক্ষা ও তার উন্নতি, রোগরোধ ও তার সঠিক নিরাময়। [৮]

চিকিৎসার প্রধান বিষয় হল শরীরের পঞ্চকর্মের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তার কারণ অণুসন্ধান করে, তার রোধ করে পূর্বাবস্থায় ফেরানো। ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য, জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে শরীরে উপযুক্ত শক্তি যুগিয়ে এটা করা সম্ভব যাতে ভবিষ্যতেও রোগ প্রভাবিত করতে না পারে।

রোগের চিকিৎসা সাধারণত সঠিক ঔষধ, খাদ্য ও উপযুক্ত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা করা হয়। উপরে তিনটির প্রয়োগ দুই রকমভাবে করা হয়। একটা পদ্ধতিতে উপায় তিনটি রোগের এটিওলোজিক্যাল বিষয়সমূহ এবং প্রকাশের

বিরুদ্ধতা করে আক্রমণ করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটিতে ওষুধ, খাদ্য এবং ক্রিয়াকলাপকে ঐ তিনটি উপায়কেই এটিওলোজিক্যাল বিষয়সমূহ এবং প্রকাশের একই প্রভাবের জন্য লাগানো হয়। এই দুই ধরনকে বলা হয় ভিপ্রীতা এবং ভিপ্রীতার্থকারী চিকিৎসা।

সফল চিকিত্সা প্রদানের জন্য চারটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়। ঐগুলো হচ্ছে:

ঔষধ
পরিষেবিকা
রোগী

গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম স্থান চিকিৎসকের। তার যথাযথ ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবিক বোধ ও সুদ্ধ মন অত্যন্ত জরুরী। তার চিকিৎসাবিদ্যাকে যথেষ্ট নম্রতা ও বিদগ্ধতার সাথে মনবজাতির কল্যাণে ব্যয় করা উচিত। খাদ্য ও ঔষধের গুরুত্ব এর পরেই আসে। এগুলি অতি উন্নত মানের, সঠিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং সর্বসাধারণের জন্য, সর্বত্র পাওয়া যাওয়া উচিত। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের কে কবিরাজ বলা হয়।

সব সফল চিকিৎসার তৃতীয় উপাদান হল সেবাদানকারী লোকজনের যাদের সেবার ভাল জ্ঞান থাকা উচিত, তাদের কাজের দক্ষতা থাকা উচিত, পরিচ্ছন্ন ও প্রায়োগিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর পরে আসে রোগীর ভূমিকা, তাকে যথেষ্ট বাধ্য ও সহযোগিতাপূর্ণ হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলা উচিত, রোগ সম্পর্কে বলতে পারা উচিত এবং চিকিৎসার জন্য যা সহায়তা দরকার দেওয়া উচিত। রোগ শুরুর বিভিন্ন উপসর্গ থেকে শুরু করে পুরোপুরি প্রকাশ পর্যন্ত নানা কারণগুলির বিশ্লেষণের জন্য আয়ুর্বেদের সুস্পষ্ট নিয়মাবলী বা বিবরণ আছে। এর মাধ্যমে রোগের গোপন উপসর্গের পূর্বাভাসের আগেই তার আবির্ভাব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় যেটা আয়ুর্বেদের বিশেষ সুবিধা। এর ফলে রোগের গোড়া থেকেই ঔষধের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা বা পরে রোগের তীব্রতাকে রোধ করে যথাযথ আরোগ্য বিদ্যার প্রয়োগে পীড়ার প্রকোপকে সমূলে বিনাশ করা যায়।

চিকিৎসার ধরণসমূহ

শোধন চিকিৎসা (বিশুদ্ধিকরণ চিকিৎসা)

এই চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণগুলি দুর করে চিকিত্সা করা হয়। এই পদ্ধতিতে শরীরের ভিতর ও বাহিরের শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। সাধারণ পদ্ধতিগুলি হল পঞ্চকর্ম (বমনকারক ঔষধ, বিরেচন, গুহ্যদেশে প্রক্ষিপ্ত তৈল ঔষধ, মলদ্বারে প্রবেশ করানো তরল ঔষধ এবং নাসিকার মধ্যে দিয়ে দেওয়ার ঔষধ। পঞ্চকর্মপূর্ব পদ্ধতিসমূহ (বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন ওলিশন এবং কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত ঘামের মাধ্যমে চিকিত্সা)-পঞ্চকর্ম চিকিৎসায় শরীরের রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার যথাযথ পরিচালনার

মাধ্যমে চিকিত্সা করা হয়। প্রয়োজনীয় শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে আরোগ্য আনা হয়। স্নায়ুরোগের জন্য, অস্থি ও মাংসপেশীর অসুখে, কিছু ধমণী ও স্নায়ু-ধমণী সংক্রান্ত অবস্থায়, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পাচন প্রক্রিয়ার অসুখে এই চিকিৎসা বিশেষ করে উপযোগী হয়।

শমন চিকিৎসা(প্রশমণকারী চিকিৎসা)

শমন চিকিৎসায় রোগে আক্রান্ত দোষগুলিকে দমন করা হয়। যে পদ্ধতিতে দূষিত 'দোষ' বা শরীরের ভারসাম্য নষ্ট না করে পূর্বাবস্থায় ফেরে তাকে শমণ চিকিৎসা বলে। ক্ষুধার উদ্রেক ও হজমের মাধ্যমে, ব্যয়াম ও আলো হাওয়ায় শরীরকে উজ্জীবিত করে এই চিকিত্সা করা হয়। এতে রোগ উপশমকারী ও বেদনা নাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

পথ্য ব্যবস্থা (ক্রিয়াকলাপ এবং খাদ্যাভাসের নিয়মাবলী)

দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক ক্রিয়াকর্ম, অভ্যাস ও আবেগজনিত অবস্থা সংক্রান্ত উচিত অণুচিৎ বিষয়ে ইঙ্গিতসমূহ পথ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত। থেরাপেটিক পরিমাপ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে এবং প্যাথোজেনিক প্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করতে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের উপর নিষেধাবলী জারি করে অগ্নিকে উদ্দিপীত করা এবং খাদ্যবস্তুর ভালভাবে হজম করানোর মাধ্যমে কলাসমূহের শক্তি লাভই হল এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

নিদান পরিবর্জন(অসুখ হওয়া ও অসুখের বৃদ্ধিকারক কারণগুলির বর্জন)

নিদানবর্জন হল শরীর রোগগ্রস্ত হওয়ার যেসব কারণসমূহ দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় বর্তমান, সেগুলির পরিহার। যে সকল কারণে রোগগ্রস্ত শরীর আরো রোগগ্রস্ত হতে পারে, সেকারণগুলিকে পরিত্যাগ/পরিবর্তন করাও এর অন্তর্গত।

সত্ত্ববজায় (মানসিক রোগের চিকিৎসা)

সত্ত্ববজায় প্রধানতঃ মানসিক অসুবিধায় বেশী কাজ করে। মনকে অস্বাস্থ্যকর বস্তুর কামনা থেকে মুক্ত রাখা, সাহস, স্মৃতিশক্তি, বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান চর্চা অনেক বিশদভাবে আয়ুর্বেদে বর্ণিত আছে এবং মানসিক রোগের চিকিৎসার অনেক বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ আছে। [১৪]

রসায়ন চিকিৎসা(আনাক্রম্যতা এবং পুনর্যৌবনপ্রাপ্তির ঔষধ)

রসায়ন চিকিৎসা মানবদেহে শক্তি ও প্রাণশক্তি আনয়নের চিকিৎসা। শারীরিক কাঠামোর দৃঢ়তা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি, বুদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যৌবনজ্যোতি অক্ষুন্ন রাখা এবং শরীর ও ইন্দ্রীয় সমূহে পূর্ণমাত্রায় শক্তি সংরক্ষণ-রসায়ন চিকিত্সার অন্যতম উপকারীতা। অসময়ে শরীরের ক্ষয় প্রতিরোধ করা ও ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য অর্জনে রসায়ন চিকিত্সা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অথর্ববেদ

অথর্ববেদ (সংস্কৃত: अथर्ववेद, অথর্বণ ও বেদ শব্দের সমষ্টি) হল হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ বেদের চতুর্থ ভাগ। 'অথর্ববেদ' শব্দটি সংস্কৃত 'অথর্বণ' (দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী) ও 'বেদ' (জ্ঞান) শব্দ-দু'টির সমষ্টি। অথর্ববেদ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তীকালীন সংযোজন।। অথর্ববেদ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ২০টি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৭৩০টি স্তোত্র ও প্রায় ৬,০০০ মন্ত্র আছে। অথর্ববেদের এক-ষষ্ঠাংশ স্তোত্র ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। ১৫শ ও ১৬শ খণ্ড ব্যতীত এই গ্রন্থের স্তোত্রগুলি নানাপ্রকার বৈদিক ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থের দুটি পৃথক শাখা রয়েছে। এগুলি হল পৈপ্পলাদ ও শৌনকীয়। এই শাখাদুটি আজও বর্তমান। মনে করা হয় যে, পৈপ্পলাদ শাখার নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলি হারিয়ে গিয়েছে। তবে ১৯৫৭ সালে ওড়িশা থেকে একগুচ্ছ সুসংরক্ষিত তালপাতার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়।

অথর্ববেদকে অনেক সময় 'জাদুমন্ত্রের বেদ' বলা হয়। তবে অন্যান্য গবেষকরা এই অভিধাটিকে সঠিক নয় বলেই মত প্রকাশ করেছেন। অথর্ববেদের সংহিতা অংশটি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে উদীয়মান জাদুমন্ত্রমূলক ধর্মীয় রীতিনীতিগুলির প্রতিফলন। কুসংস্কারমূলক আশঙ্কা ও দৈত্যদানব কর্তৃক আনীত অমঙ্গল দূরীকরণ এবং ভেষজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক মিশ্রণ থেকে উৎপন্ন ঔষধের কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদের অনেকগুলি খণ্ড জাদুমন্ত্র ছাড়া অনুষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান ও দিব্যজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। কেনেথ জিস্কের মতে, অথর্ববেদ ধর্মীয় ঔষধ-চিকিৎসাবিদ্যার বিবর্তনের সেই প্রাচীনতম নথিগুলির অন্যতম যা আজও পাওয়া যায়। তার মতে, অথর্ববেদ 'প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের লোকচিকিৎসার আদি রূপটি' প্রকাশ করেছে।

সম্ভবত সামবেদ ও যজুর্বেদের সমসাময়িক কালে অথবা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ – ১০০০ অব্দ নাগাদ অথর্ববেদ রচিত হয়েছিল। সংহিতা অংশটি ছাড়া অথর্ববেদের একটি ব্রাহ্মণ অংশ রয়েছে এবং এই বেদের শেষাংশ উপনিষদ্ দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে। অথর্ববেদের উপনিষদ্ বা শেষাংশ (বেদান্ত) তিনটি প্রধান উপনিষদ্ নিয়ে গঠিত। এগুলি হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করেছে। এগুলির নাম হল মুণ্ডক উপনিষদ্, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ও প্রশ্ন উপনিষদ্।

নাম-ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা

মনিয়ার উইলিয়ামসের মতে, অথর্ববেদের নামকরণ করা হয়েছে পৌরাণিক পুরোহিত অথর্বণের নাম অনুসারে। অথর্বণ প্রথম যাগযজ্ঞ ও সোমরস উৎসর্গ করার প্রথা উদ্ভব করেন এবং 'রোগ ও বিপর্যয়ের প্রতিকূল পদ্ধতি ও মন্ত্রগুলি' রচনা করেন। মনিয়ার উইলিয়ামস উল্লেখ করেছেন যে, অগ্নির একটি অধুনা-অবলুপ্ত নাম ছিল 'অথর'। লরি প্যাটনের মতে, 'অথর্ববেদ' নামটির অর্থ 'অথর্বণগণের বেদ'।

অথর্ববেদের প্রাচীনতম নামটি এই বেদেই (১০। ৭। ২০) উল্লিখিত হয়েছে। এটি হল 'অথর্বাঙ্গিরসঃ'। দুই জন বৈদিক ঋষি অথর্বণ ও আঙ্গিরসের নামানুসারে এই নামটি এসেছে। এই বেদের প্রত্যেকটি শাখার নিজস্ব নাম

রয়েছে। যেমন 'শৌনকীয় সংহিতা'। এর অর্থ 'শৌনকের সংকলিত গ্রন্থ'। 'অথর্বণ' ও 'আঙ্গিরস' নাম দু-টি সম্পর্কে মরিস ব্লুমফিল্ড বলেছেন, এই নামদুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতক। প্রথম নামটি মাঙ্গলিক। অন্যদিকে দ্বিতীয় নামটি প্রতিকূল জাদুবিদ্যার অর্থবাচক। কালক্রমে ইতিবাচক মাঙ্গলিক দিকটি অধিকতর সমাদর লাভ করে এবং 'অথর্ববেদ' নামটিই প্রচলিত হয়। জর্জ ব্রাউনের মতে, পরবর্তী নাম 'আঙ্গিরস' অগ্নি ও বৈদিক পুরোহিতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সম্ভবত এটির সঙ্গে নিপ্পুরের একটি আরামিক গ্রন্থে প্রাপ্ত প্রোটো-ইন্দো ইউরোপীয় 'আঙ্গিরোস'-এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে।

মাইকেল উইটজেল বলেছেন, 'অথর্বণ' শব্দের মূল সম্ভবত 'অথর্বণ' বা '[প্রাচীন] পুরোহিত, জাদুকর'। এর সঙ্গে আবেস্তান 'আওরাউয়ান' (āθrauuan) বা 'পুরোহিত' ও ট্রোকারিয়ান 'অথ্র' বা 'মহত্তর শক্তি' কথাদুটির সম্পর্ক আছে।

অথর্ববেদ 'ভার্গবাঙ্গিরসঃ' ও 'ব্রহ্মাবেদ' নামেও পরিচিত। ঋষি ভৃগু ও ব্রহ্মার নামে এই দুটি নাম এসেছে।

গ্রন্থ

অথর্ববেদ সংহিতার একটি পৃষ্ঠা। এটি গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। অথর্ববেদ ২০টি খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ৭৩০টি স্তোত্র ও ৬,০০০ শ্লোক আছে। প্যাট্রিক অলিভেল ও অন্যান্য গবেষকদের মতে, এই গ্রন্থ বৈদিক সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত মতবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক সংকলন। এটি যজুর্বেদের মতো শুধুমাত্র একটি ধর্মানুষ্ঠানবিধির সংকলন নয়।

শাখা

চরণব্যূহ নামে পরবর্তীকালের একটি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসারে, অথর্ববেদের ৯টি শাখা ছিল। এগুলি হল :
পৈপ্পলাদ
স্তৌদ
মৌদ
শৌনকীয়
জাযল
অলদ
ব্রহ্মবাদ
দেবদুর্শ ও
চারণবৈদ্য

এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র শৌনকীয় শাখা, এবং অধুনা-আবিষ্কৃত পৈপ্পলাদ শাখার একটি পাণ্ডুলিপিই এখন বর্তমান। পৈপ্পলাদ সংস্করণটি প্রাচীনতর। এই দুইটি শাখা বিন্যাসপ্রণালী এবং বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে

পৃথক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৈপ্পলাদ শাখার ১০ খণ্ডটি অদ্বৈতবাদ, 'ব্রহ্মের একত্ব', সমগ্র জীবজগৎ ও বিশ্ব' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে।

বিন্যাস

মূল অথর্ববেদ সংহিতা ১৮টি 'কাণ্ড' বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। শেষ কাণ্ডদুটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। বেদের অপর ভাগগুলি বিষয় বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নামানুসারে বিন্যস্ত হলেও, অথর্ববেদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এই বেদে বিষয়গুলি স্তোত্রের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি কাণ্ডে প্রায় সমসংখ্যক শ্লোকের স্তোত্র সংকলিত হয়েছে। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলিতে ক্ষুদ্রতম স্তোত্রের সংকলনটিকে প্রথম কাণ্ড বলা হয়েছে। এরপর অধিকতর বৃহদায়তন স্তোত্রের সংকলনগুলি দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদিক্রমে বিন্যস্ত। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি এর বিপরীত ক্রমও দেখা যায়। বেশিরভাগ স্তোত্রই কাব্যিক এবং বিভিন্ন ছন্দে নিবদ্ধ। তবে গ্রন্থের এক-ষষ্ঠাংশ গদ্যে রচিত।

অথর্ববেদের অধিকাংশ স্তোত্র এই বেদেরই অন্তর্গত। কেবল এই গ্রন্থের এক-ষষ্ঠাংশ স্তোত্র ঋগ্বেদ (মুখ্যত ১০ম মণ্ডল) থেকে গৃহীত। ১৯শ কাণ্ডটি অনুরূপ প্রকৃতির একটি পরিশিষ্ট। এটি সম্ভবত নতুন রচনা এবং পরবর্তীকালের সংযোজন। [১৮] অথর্ববেদ সংহিতার ২০শ কাণ্ডের প্রায় সম্পূর্ণতই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত।

অথর্ববেদের ২০টি কাণ্ডে সংকলিত স্তোত্রগুলিতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ৭টি কাণ্ডে মোটামুটি সব ধরনের চিকিৎসার জন্য জাদুমন্ত্র ও জাদুর কথা। মাইকেল উইটজেল বলেছেন, এগুলি জার্মানিক ও হাইটটাইট জাদুমন্ত্রগুলির অনুরূপ। সম্ভবত এগুলিই গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। ৮ম থেকে ১২শ খণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ১২শ থেকে ১৮শ কাণ্ড পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে
জীবনের সংস্কারমূলক অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে।

বৈতান সূত্র ও কৌশিক সূত্রের মতো শ্রৌতসূত্রগুলি অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার সঙ্গে যুক্ত। এগুলি অথর্বণ 'প্রায়শ্চিত্ত', দু-টি 'প্রতিশাখ্য' ও একটি 'পরিশিষ্ট' সংকলন রূপে সংকলিত হয়েছে। অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার সঙ্গে অগস্ত্য ও পৈঠিনসী সূত্রদু-টি যুক্ত। এগুলি হারিয়ে গিয়েছে, এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

বিষয়বস্তু

ঋক বেদের মত অথর্ববেদের মূল আরাধ্য দেবতা রুদ্র শিব কিন্তু এখানে তাঁর উপস্থিতি আরো স্পষ্ট । ভাষাও আরেকটু কম সরল । অথর্ববেদ সংহিতায় যে স্তোত্রগুলি আছে তার অনেকগুলিই জাদুমন্ত্র। বিশেষ কোনো কামনা সিদ্ধির জন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা বা তার হয়ে কোনো জাদুকরের দ্বারা এগুলির উচ্চারণের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই স্তোত্রগুলির অধিকাংশই প্রিয়জনের দীর্ঘায়ু কামনা বা কোনো রোগ থেকে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত মন্ত্র। এই সব ক্ষেত্রে রোগীকে গাছগাছড়া (পাতা, বীজ, শিকড়) প্রভৃতি বস্তু ও একটি কবচ দেওয়ার বিধান রয়েছে। কয়েকটি জাদুমন্ত্র সৈনিকদের জন্য। এগুলির উদ্দেশ্য যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করা। কয়েকটি আবার উৎকণ্ঠিত প্রেমিকের জন্য। এগুলির উদ্দেশ্য প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাহত করে অনিচ্ছুক

প্রণয়ীকে বশীকরণ। কয়েকটি ক্রীড়া বা বাণিজ্যে সাফল্য, অধিক গবাদিপশু ও শস্যলাভ এবং ঘরের ছোটোখাটো বিপদআপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য। কয়েকটি স্তোত্র জাদুমন্ত্র-সম্পর্কিত নয়। এগুলি প্রার্থনা ও দার্শনিক চিন্তামূলক।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তু অন্য তিন বেদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯শ শতাব্দীর ভারততত্ত্ববিদ ওয়েবার এই পার্থক্য সম্পর্কে লিখেছেন, দুই সংকলনের [ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ] চরিত্র অবশ্যই অনেকাংশে ভিন্ন। ঋগ্বেদে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক অনুভূতি এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রীতির ভাব রয়েছে। অন্যদিকে অথর্ববেদে এর বিপরীতে রয়েছে প্রকৃতির অমঙ্গলকারী সত্ত্বার প্রতি আশঙ্কা ও তার জাদুশক্তির কথা। ঋগ্বেদে আমরা মানুষকে দেখি মুক্ত কর্মোদ্যত ও স্বাধীন রূপে। অথর্ববেদে আমরা দেখি মানুষ অণুশাসন ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলে বদ্ধ।

–অ্যালবার্ট ওয়েবার,

জন গোন্ডার মতে, অথর্ববেদ সংহিতাকে শুধুমাত্র জাদুমন্ত্র ও জাদুবিদ্যার সংকলন হিসেবে দেখলে ভুল হবে। সংহিতা অংশে এই জাতীয় শ্লোক অবশ্যই আছে। তবে এতে জাদুমন্ত্র ছাড়াও কিছু গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের উপযোগী স্তোত্রও আছে। আবার কিছু দিব্যজ্ঞানমূলক চিন্তাভাবনাও দেখা যায়। যেমন, এখানে বলা হয়েছে, ‘সকল বৈদিক দেবতারা এক।’ সংহিতা ছাড়াও অথর্ববেদে একটি ব্রাহ্মণ ও কয়েকটি প্রভাবশালী উপনিষদ্ রয়েছে।

সংহিতা

শল্যচিকিৎসা ও ঔষধ-সংক্রান্ত মন্ত্রসমূহ অথর্ববেদে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্র ও শ্লোক আছে। যেমন, সদ্য-আবিষ্কৃত পৈপ্পলাদ সংস্করণের ৪।১৫-সংখ্যক শ্লোকে অস্থিভঙ্গ ও ক্ষতে রোহিণী লতা (ফাইকাস ইনফেক্টোরিয়া, ভারতে পাওয়া যায়) কিভাবে বাঁধতে হয় তা উল্লিখিত হয়েছে: মজ্জার সঙ্গে মজ্জা একত্রে রাখো, গাঁটের সঙ্গে গাঁট একত্রে রাখো, খণ্ডিত মাংস একত্রে রাখো, পেশী একত্রে রাখো এবং অস্থিগুলি কত্রে রাখো। মজ্জা মজ্জায় যুক্ত হোক, অস্থি অস্থির সঙ্গে বৃদ্ধি পাক। আমরা পেশীর সঙ্গে পেশী একত্রে রাখবো, চামড়াকে চামড়ার সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেবো।

–অথর্ববেদ ৪। ১৫, পৈপ্পলাদ সংস্করণ[৩৪]

জ্বর, পাণ্ডুরোগ ও অন্যান্য রোগের জন্য মন্ত্র অথর্ববেদের অনেকগুলি স্তোত্র হল কোনো শিশু বা প্রণয়ীর আরোগ্য কামনা ও স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং পরিবারের সদস্যদের নিশ্চিন্ত করার জন্য প্রার্থনা ও মন্ত্রের সংকলন। বৈদিক যুগে মানুষ মনে করত অশুভ আত্মা, অপদেবতা ও দানবীয় শক্তির কারণে অসুখবিসুখ হয়। এই সব শক্তি আক্রান্তের দেহে প্রবেশ করে রোগ বাধায়। উদাহরণস্বরূপ, পৈপ্পলাদ সংস্করণের ৫। ২১-সংখ্যক স্তোত্রটিতে আছে, আমাদের পিতা স্বর্গ, আমাদের মাতা পৃথিবী, মানব-রক্ষাকারী অগ্নি, তাঁরা দশদিনের জ্বর আমাদের থেকে দূরে অপসারিত করুন। হে জ্বর, পৃষ্ঠে সোম-ধারণকারী তুষারাবৃত পর্বতসমূহ আমাদের

আরোগ্যদাতা বার্তাবহ পবনকে এখান থেকে তোমাকে মরতগণের কাছে প্রেরণ করুন। নারীগণ তোমায় চায় না, পুরুষগণও না, শিশুরাও না, এখানে বৃদ্ধরাও জ্বর-কামনায় কাঁদেন না। আমাদের বৃদ্ধদের ক্ষতি কোরো না, আমাদের বৃদ্ধাদের ক্ষতি কোরো না, আমাদের ছেলেদের ক্ষতি কোরো না, আমাদের মেয়েদের ক্ষতি কোরো না। তুমি একাধারে বলস, কাশি, উদ্রজ নামক বাণ হানো। হে জ্বর, এগুলি থেকে আমাদের দূরে রাখো।

–অথর্ববেদ ৫। ২১, পৈপ্পলাদ সংস্করণ

গাঠণিক বিভাজন

এ বিভাজনগুলো হচ্ছে মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। মন্ত্রাংশ প্রধানত পদ্যে রচিত, কেবল যজুঃসংহিতার কিছু অংশ গদ্যে রচিত। এটাই বেদের প্রধান অংশ।

সংহিতা

সংহিতা (আক্ষরিক অর্থে, "একত্রিত, মিলিত, যুক্ত" এবং "নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসারে একত্রিত গ্রন্থ বা মন্ত্র-সংকলন) হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ বেদের প্রাচীনতম অংশটিকেও 'সংহিতা' বলা হয়। এই অংশটি হল মন্ত্র, স্তোত্র, প্রার্থনা, প্রার্থনা-সংগীত ও আশীর্বচনের সংকলন। বৈদিক সংহিতাগুলির কিছু অংশ হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম অংশ যা আজও প্রচলিত আছে।

ব্রাহ্মণ

বেদের দুটি অংশ–মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বেদের যে অংশে মন্ত্রের আলোচনা ও যজ্ঞে তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে তাকে ব্রাহ্মণ বলে। এটি গদ্যে রচিত। আরণ্যক বনবাসী তপস্বীদের যজ্ঞ ভিত্তিক বিভিন্ন ধ্যানের বর্ণনা। এটি কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই।

ব্রাহ্মণ (দেবনাগরী: ब्राह्मणम्) হল হিন্দু শ্রুতি শাস্ত্রের অন্তর্গত গ্রন্থরাজি। এগুলি বেদের ভাষ্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলির মূল উপজীব্য যজ্ঞের সঠিক অনুষ্ঠানপদ্ধতি।

প্রত্যেকটি বেদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ রয়েছে। ষোড়শ মহাজনপদের সমসাময়িককালে মোট কতগুলি ব্রাহ্মণ প্রচলিত ছিল তা জানা যায় না। মোট ১৯টি পূর্ণাকার ব্রাহ্মণ অদ্যাবধি বিদ্যমান: এগুলির মধ্যে দুটি ঋগ্বেদ, ছয়টি য জুর্বেদ, দশটি সামবেদ ও একটি অথর্ববেদের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও কয়েকটি সংরক্ষিত খণ্ডগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগুলির আকার বিভিন্ন প্রকারের। শতপথ ব্রাহ্মণ সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট গ্রন্থের পাঁচ খণ্ড জুড়ে বিধৃত হয়েছে; আবার বংশ ব্রাহ্মণের দৈর্ঘ্য মাত্র এক পৃষ্ঠা।

বেদোত্তর যুগের হিন্দু দর্শন, প্রাক-বেদান্ত সাহিত্য, আইন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ব্যাকরণ

(পাণিনি), কর্মযোগ, চতুরাশ্রম প্রথা ইত্যাদির বিকাশে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোনো কোনো ব্রাহ্মণের

অংশগুলি আরণ্যক বা উপনিষদের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

ব্রাহ্মণের ভাষা বৈদিক সংস্কৃত থেকে পৃথক। এই ভাষা সংহিতা (বেদের মন্ত্রভাগ) অংশের ভাষার তুলনায় নবীন, তবে এর অধিকাংশই সূত্র সাহিত্যের ভাষার তুলনায় প্রবীন।

ব্রাহ্মণগুলি লৌহযুগ অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব নবম, অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে রচিত। কয়েকটি নবীণ ব্রাহ্মণ (যেমন শতপথ ব্রাহ্মণ) সূত্র সাহিত্যের সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত। ঐতিহাসিকভাবে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলির রচনাকাল পরবর্তী বৈদিক যুগের উপজাতীয় রাজ্যগুলির ষোড়শ মহাজনপদ রূপে উত্তরণের কাল।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলির তালিকাসম্পাদনা প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ চার বেদের কোনো না কোনো একটির সঙ্গে যুক্ত এবং বেদের সংশ্লিষ্ট শাখার অংশ:

ঋগ্বৈদিক ব্রাহ্মণ
শকল শাখা
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বা অশ্বলয়ন ব্রাহ্মণ নামেও অল্পসল্প পরিচিত।[২]
বাশকল শাখা
কৌষিতকী ব্রাহ্মণ বা সংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ।[৩]
যজুর্বৈদিক ব্রাহ্মণ
কৃষ্ণ যজুর্বেদ
কৃষ্ণ যজুর্বেদে ব্রাহ্মণ সংহিতারই অংশ।
মৈত্রায়নী সংহিতা ও একটি আরণ্যক (= মৈত্রেয়ানী উপনিষদ)

(চরক) কঠ সংহিতা; কঠ শাখায় একটি খণ্ড ব্রাহ্মণ ও একটি আরণ্যক রয়েছে। কপিস্থলকঠ উপনিষদ, এবং এই গ্রন্থের ব্রাহ্মণের কয়েকটি খণ্ড তৈত্তিরীয় সংহিতা। তৈত্তিরীয় শাখার একটি অতিরিক্ত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক রয়েছে। এছাড়া রয়েছে পরবর্তী বৈদিক যুগীয় বধুলা অন্বখ্যনা।

শুক্ল যজুর্বেদ
মধ্যন্দিনা শাখা
শতপথ ব্রাহ্মণ, মধ্যন্দিনা শাখীয়

কন্ব শাখা
শতপথ ব্রাহ্মণ, কন্ব শাখীয়
সামবৈদিক শাখা
কৌথম ও রণযানীয় শাখা

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (উক্ত উভয় শাখার প্রধান ব্রাহ্মণ)।

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট এবং ষড়বিংশ প্রপাঠক বলে অনুমিত হয়)

সংবিধান ব্রাহ্মণ (তিনটি প্রপাঠক যুক্ত)

আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (সামবেদের স্তোত্রাবলির সূচি)

দেবতাধ্যায় বা দৈবত ব্রাহ্মণ (২৬, ১১ ও ২৫টি খণ্ডিকাযুক্ত তিন খণ্ডে বিন্যস্ত)

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ (দশটি প্রপাঠকযুক্ত। প্রথম দুটি প্রপাঠক মন্ত্রব্রাহ্মণ থেকে গৃহীত এবং এগুলির প্রত্যেকটি আটটি খণ্ডে বিভক্ত। ৩-১০ প্রপাঠকগুলি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে গৃহীত।

সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণ (পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত একটি মাত্র প্রপাঠক যুক্ত) **বংশ ব্রাহ্মণ (একটি মাত্র অধ্যায় যুক্ত, বিষয়বস্তু গুরুশিষ্যপরম্পরা)।

জৈমিনীয় শাখা
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (এই শাখার প্রধান ব্রাহ্মণ এবং তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত)
জৈমিনীয় আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (সামবেদের স্তোত্রাবলির একটি সূচি, জৈমিনীয় শাখার অন্তর্গত)
জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্

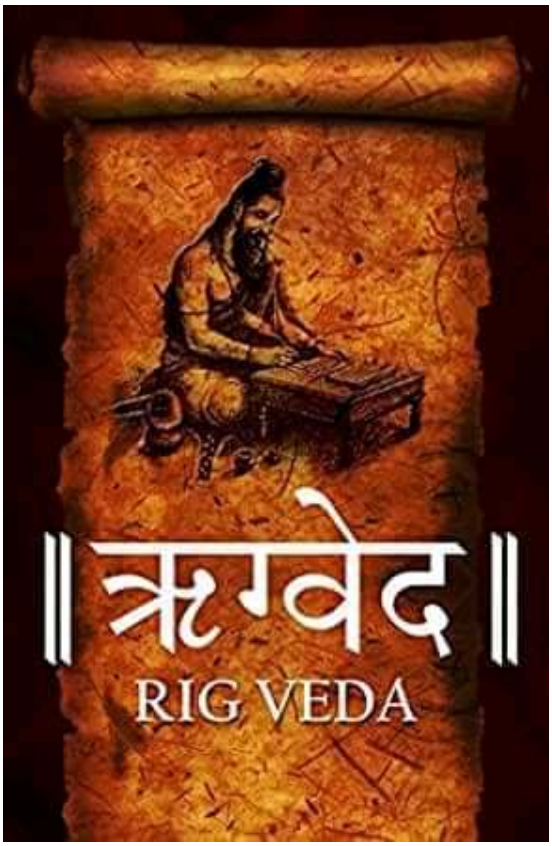

ব্রহ্মসাগরে ব্রহ্মকণারূপী জীবসত্তা

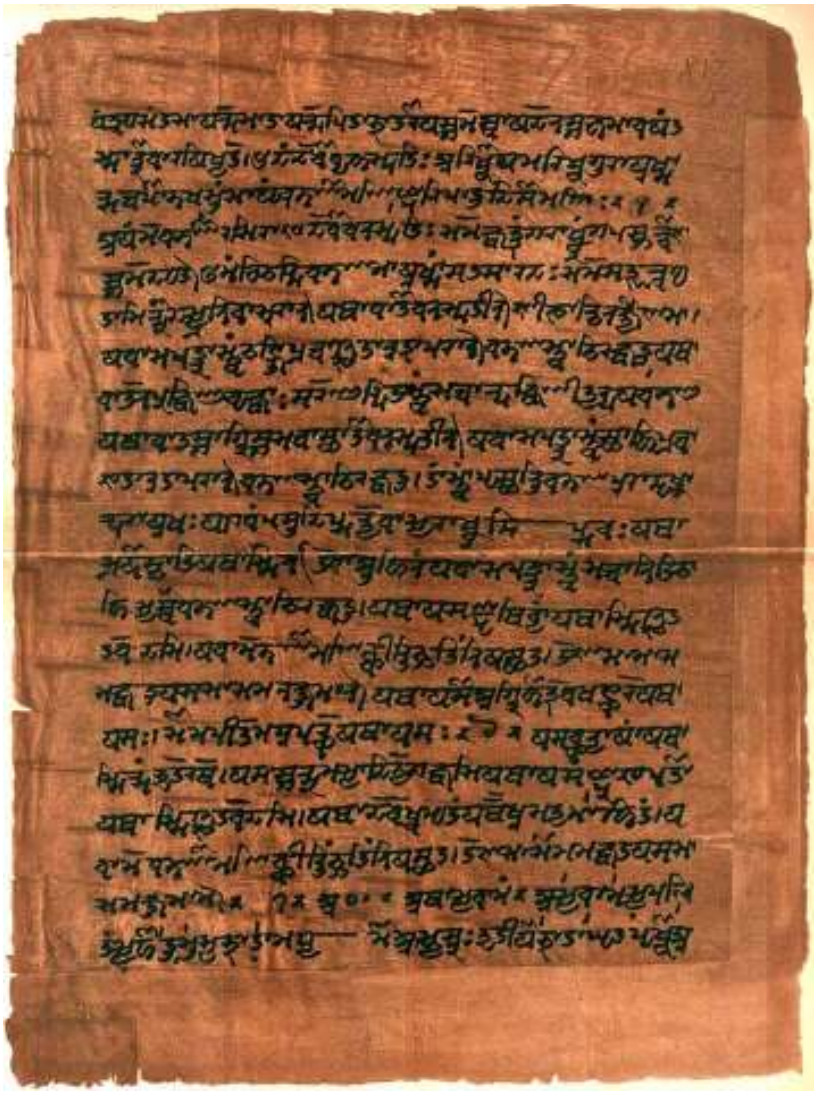

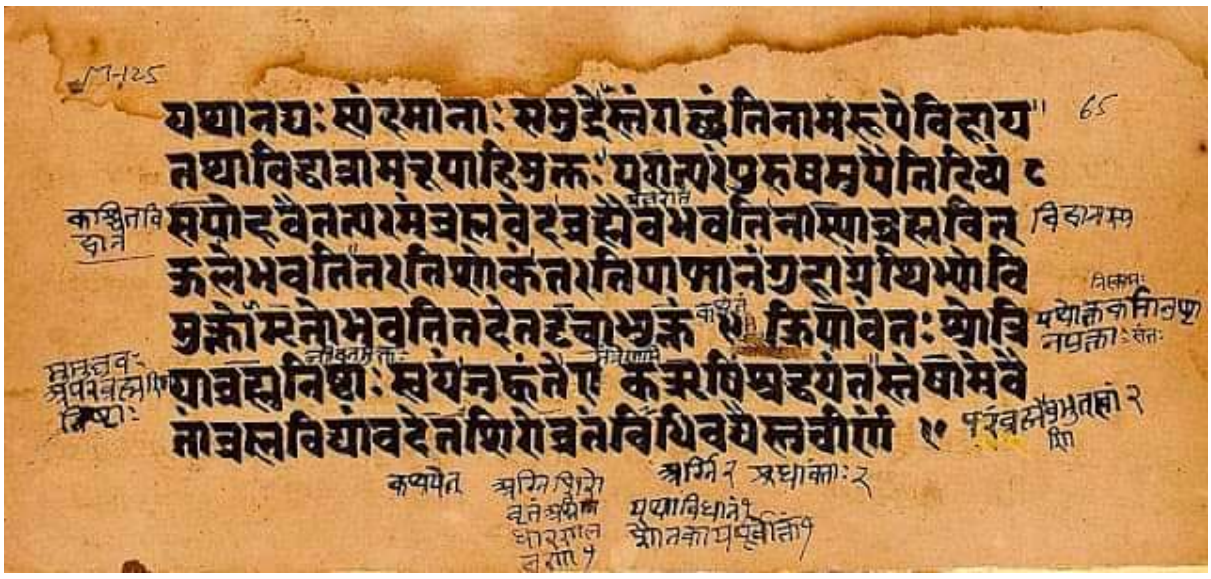

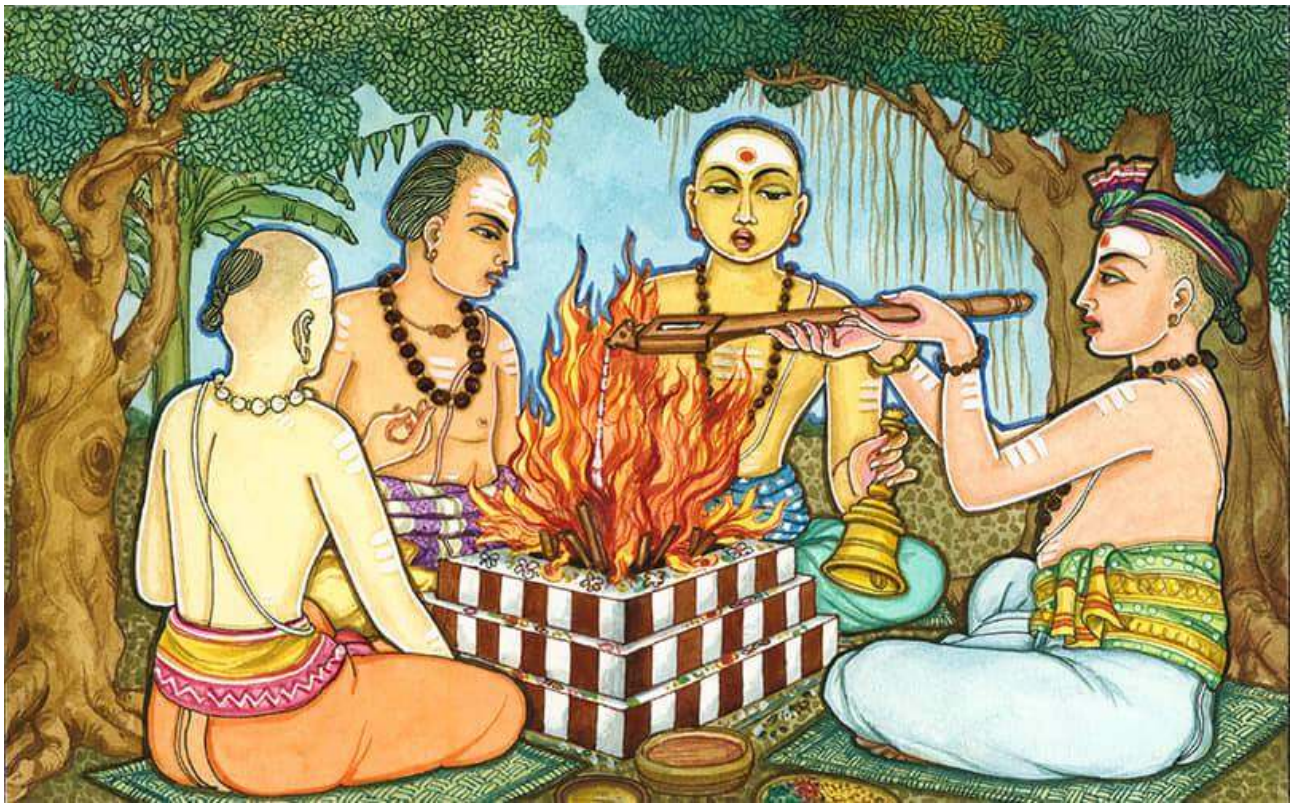

shutterstock.com • 1380478514

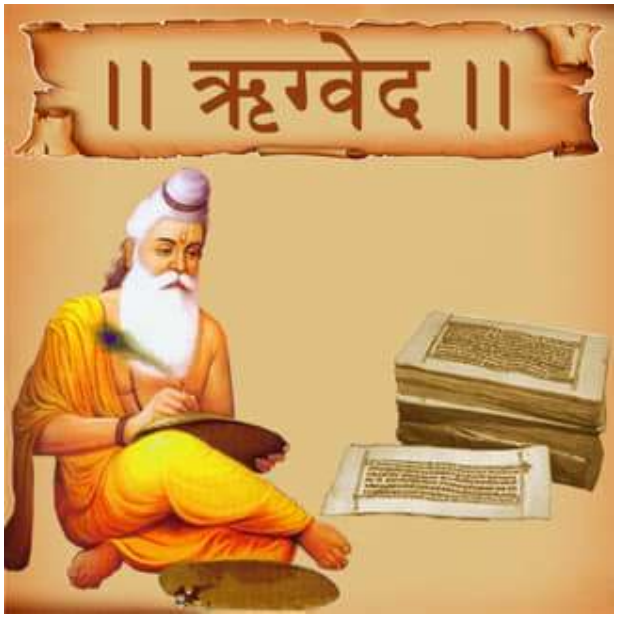
॥ ऋग्वेद ॥

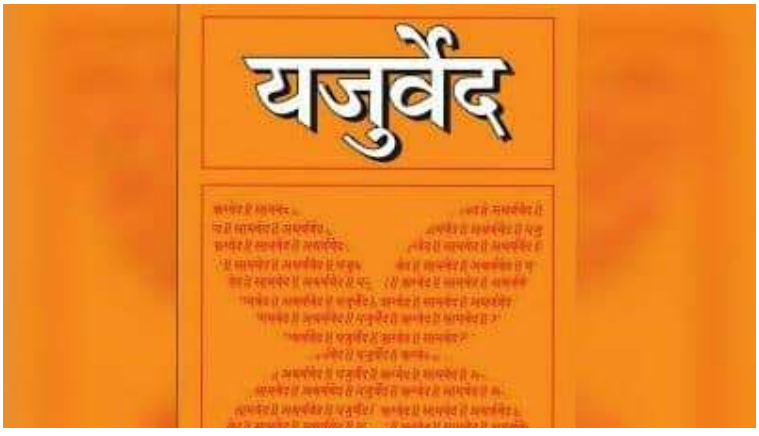
यजुर्वेद

॥বেদপ্রভা॥

ওঁ
আর্যপ্রভা
(হিন্দুর জাতীয় সংস্কৃতির কথা)

[সত্য। বেদ। অর্থবাদ। পরা শব্দ। উপনিষদ। পরা বিদ্যা, অপরাবিদ্যা। পুরুষ যজ্ঞ। অথর্ব সংহিতার কারণ। অনিত্যতার লক্ষণ। নিত্যের লক্ষণ। তদ্ভাব, Being and Becoming। তত্ত্ব। জ্ঞানকাণ্ড। শব্দ রাশি-চারবেদ। ঐতিহ্য। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। বেদাঙ্গ। প্রাদেশিকতা। যজ্ঞ। কর্মকান্ড। সকাম সাধনার উদ্দেশ্য। নিষ্কাম সাধকের যজ্ঞ। ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বৈদিক ব্যাকরণ। উচ্চারণ বৈকল্যে দোষ। লক্ষ্য লক্ষণ। Phonetic। আবৃত্তি নয় তত্ত্বজ্ঞান।]

ওঁ-নমস্তস্মৈ সদেকস্মৈ কস্মৈ চিন্মহসে নমঃ।
যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরু রাজ তে॥

(বিবেকচূড়ামণি ৫২১)

অর্থ- হে গুরুরাজ! সৎ স্বরূপ অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মকে প্রণাম এবং অনির্বচনীয় তেজঃস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে প্রণাম, যে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে আপনার সম্বন্ধে প্রকাশ পেয়েছেন।

আর্য সংস্কৃতির ইতিহাস অর্থাৎ ভারতীয় আর্য কৃষ্টির ধারা যাতে বোঝা যায়, এমন সব কথা এবং বিশেষ করে, তন্ত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি। সাধ্যমত এ সমস্ত বিষয়, ক্রমশঃ বোঝবার চেষ্টা করা যাবে।

সত্যকে আমরা দু-ভাবে দেখি। একটি জাগতিক সত্য-বাস্তব সত্য; এ সত্য মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের গোচর ও তাদের উপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত (বিজ্ঞান বা science)। আর একটি অতীন্দ্রিয় সত্য- সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। এই প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে বেদ বলা যায়। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁর নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তার নাম বেদ। আর্য জাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দ রাশি সম্বন্ধে এটাও বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে যা লৌকিক অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নয়, তাই বেদ (স্বামীজি)। ঋগ্বেদ আদি শব্দ রাশিকে বেদ আখ্যা দেওয়া হয়। বেদ বিহিত কর্মের স্তুতি, নিন্দা বা বিধি নিষেধ ইত্যাদিকে অর্থবাদ বলে। তন্ত্রের ভাষায় পর(পরা) শব্দ'ই বেদ। মায়িক বা বাস্তব সত্যে, জ্ঞানে বহুত্ব রয়েছে- পরিণাম বা পরিবর্তন আছে। যে জ্ঞানের পরিণাম হয় না, পরিবর্তন হীন যে জ্ঞান তাই বেদ-নিত্য সত্য।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১ম প্রঃ ৩য় অঃ) ও মাধ্বাচার্য্যের মতে ঐতিহ্য=স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ আদি গ্রন্থ। বেদ তত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় সত্য উপনিষদেই বর্তমান। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, আর যা কিছু সমস্তই অপরা বিদ্যার

অন্তর্গত; তাই উপনিষদকে বেদ শিব বলা হয়। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো, ব্যাকারণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" (মুণ্ডক-১/১/৫)। ঐ চার বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ-অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে পুরুষ-যজ্ঞ হতে ঋক্, যজুঃ, সাম ও ছন্দসমূহের আবির্ভাব হয় আর ঐ গুলিই অথর্ব সংহিতার কারণ। ঐ বেদ চতুষ্টয় হতে সর্বপ্রকার অপরা বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

অনিত্যতার তিন লক্ষণ, (১) সংসর্গ নিত্যতা, (২) পরিণাম নিত্যতা, (৩) প্রধ্বংস নিত্যতা। জবা ফুলের সংস্পর্শে কাচ লাল দেখায়, ফুল সরিয়ে নিলে কাচের নিজরূপ প্রকাশ হয়, ফল পাকলে ফলের পূর্ব বর্ণের পরিণতি হয়ে রঙ বদলে যায়, জিনিষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হলে তার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। নিত্যের দুই লক্ষণ, (১) যা ধ্রুব বা স্থির, কূটস্থ, (কূটঃ লৌহপিণ্ডঃ ইব তিষ্ঠতি যঃ স কুটস্থ = নিত্য, নির্বিচার, উদাসীন), অবিচালি (দেশান্তর প্রাপ্তিবিহীন-যা অন্যত্র গমন করে না), উৎপত্তিহীন, বৃদ্ধি হীন ও অক্ষয়, (২) যার তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। ("ধ্রুবং কুটস্থমবিচাল্যনপাযোপ জন বিকার্য্যনুৎপত্যবৃদ্ধ্যবয় যোগী যত্তনিত্যমিতি"- মহাভাষ্যম ১ম আঃ)। 'তদ্ভাবস্তত্ত্বম', তদ্ভাবই তত্ত্ব-যার যা ধর্ম তার নামই তত্ত্ব; আকৃতিতেও তত্ত্ব বা আকৃতিত্ব বিনষ্ট হয় না। অগ্নির দহন শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। স্বতঃস্ফূর্ত সত্য বা জ্ঞানই বেদ, সর্বত্র বিরাজিত নিত্য অস্তি (সৎ)-এই বোধের (চিৎ এর) নাম বেদ। শব্দরাশিরূপী বেদ তপস্যার ওপর জোর দিয়েছেন- তপস্যা ভিন্ন ঐ সত্য জ্ঞান স্ফুরণ হয় না, তপস্যার স্বরূপই বেদ। শ্রদ্ধা সম্পন্ন হৃদয়ে একাগ্র বুদ্ধি ধারণ করার অবিরত চেষ্টাই তপস্যা। 'তদ্ভাব- তাই হওয়া ও হয়ে যাওয়া-Being and Becoming একাগ্র বুদ্ধি ভিন্ন হয় না; সুতরাং তপস্যার ফল, সংস্কার বিমুক্ত নির্মল বুদ্ধি বা শুদ্ধ বুদ্ধি। তত্ত্ব শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের চাপে স্বতঃস্ফূর্ত আবরিত থাকে, তপস্যার বা সাধন দ্বারা ঐ চাপ দূর হয়ে সত্য উপলব্ধি হয়, প্রত্যক্ষ হয়। সত্য দ্রষ্টা'ই ঋষি- মন্ত্র দ্রষ্টা। আবিষ্কার করার কিছু'ই নেই-সবই রয়েছে, প্রয়োজন কেবল চাপ সরাবার। ঋগ্বেদ আদি শব্দ রাশির চরম শিক্ষাই, তত্ত্বোপদেশই বা তত্ত্বই বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ। উপনিষদ মানে, যে ব্রহ্মবিদ্যা গুরুর কাছে সমিৎপাণি হয়ে শ্রদ্ধার সাথে শিখতে হয়। সকল আচার্যেরা উপনিষদকেই বেদ শিব বলে স্বীকার করেছেন। আর্য কৃষ্টির মূল'ই বেদ। কোন হিন্দুই বেদ-বিরুদ্ধ কথা গ্রহণ করেন না। তত্ত্ব জ্ঞান প্রবোধক উপাসনার কথাও উপনিষদে আছে। শব্দ রাশি বেদের মন্ত্র ভাগই ঋগ্বেদ আদি সংহিতা ও যাতে মন্ত্র ব্যাখ্যা আছে তার নাম ব্রাহ্মণ। উপনিষদ ঐ মন্ত্র ভাগের ও ব্রাহ্মণ ভাগের শেষে অতি সামান্য অংশ অধিকার করে আছে বর্তমানে। মুক্তিকোপনিষদে রামচন্দ্র ১১৮০টি উপনিষদের কথা বলে, তার মধ্যে ১০৮ উপনিষদের নাম করেছেন। কথিত আছে কলির প্রারম্ভে ১১৮০টি উপনিষদ বর্তমান ছিল।

বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং অনাদি ও নিত্য। শব্দ রাশির মধ্যে ঐতিহ্য অংশ বেদ নয়, কিন্তু সব অনুষ্ঠান, যথা যজ্ঞ, হোম, উপাসনা, পূজা, স্তুতি, জীবনী ও পুরাণ কথা প্রভৃতি-সব ব্যাপারের উদ্দেশ্য তত্ত্ব জ্ঞানকে ব্যবহার গম্য করা। তদ্ভাব ও একাত্ম বোধের (Being and Becoming এর) আর্ট বা কৌশলই ঐতিহ্য, এইজন্য ঐতিহ্য ও বেদাংশ নামে পরিচিত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ- দুই বেদ নামে আখ্যাত; মাত্র মন্ত্রে কোন কাজ হয় না, যদি মন্ত্র গুলির অর্থ প্রয়োগ জানা না থাকে।

বেদাঙ্গ ৬টি, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ। শিক্ষা- উচ্চারণ করার শাস্ত্র; কল্প- যজ্ঞ আদি নিরূপণ শাস্ত্র; নিরুক্ত- বৈদিক শব্দ অভিধান। উচ্চারণ যাতে ঠিক হয়, সে বিষয়ে শাস্ত্রকারদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সে সময়ে প্রাদেশিকতাও ছিল, যেমন 'গম' ধাতুকে সুরাষ্ট্র দেশে 'হম্ম' ধাতু ও প্রাচ্য মধ্য দেশে 'রংহ' ধাতু বলত; শব (মৃত দেহ) এই ধাতুটি কাম্বোজ দেশে গতিকর্মক (গমনার্থক) বোঝাত। এই রকম দুজন ঋষি 'যদ্বা' স্থানে 'যর্দ্বা' ও 'তদ্বা' স্থানে 'তর্দ্বা' উচ্চারণ করায় তাঁদের নাম হল 'যর্দ্বা' ঋষি ও 'তর্দ্বা' ঋষি। অন্য সময়ে উচ্চারণ যেমনই হোক, যজ্ঞ আদি কালে উচ্চারণ নির্ভুল হওয়া চাই, কারণ যে শব্দের যে উচ্চারণ সেই শব্দের অন্যরকম উচ্চারণে অর্থ ও ফল বদলে যেতে পারে; এই জন্য শিক্ষা শাস্ত্র জানা দরকার। দেব উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ'ই যজ্ঞ।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিবরণ আছে-কোন অনুষ্ঠানে কি দরকার, মন্ত্র গুলি কতভাবে ও কোন মন্ত্র কোথায় প্রয়োগ করতে হবে এ সমস্ত জানা যায় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে। বিভিন্ন মতের মীমাংসা করা হয়েছে মীমাংসা দর্শনে। ঐ প্রকার অনুষ্ঠান আদির নাম কর্মকাণ্ড। ব্যাপক বা উচ্চ ভাব সকলে ধারণ করতে পারে না। উচ্চ ভাব ধারণ উপযোগী উচ্চ আধার চাই-দেহ মন চাই-সেই জন্য ভারতে সকাম সাধনার উদ্দেশ্য, যাতে এই জীবনে বা পর জীবনে আধার বড় হয়, যাতে ত্যাগ রূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে ভোগ সমাপ্তির পর কর্মক্ষয়ের পর-উচ্চাধিকার লাভ হয়। ভারতে তর বহু স্থানে এই যজ্ঞানুরূপ অনুষ্ঠান দেখা গেলেও কোন স্থানেই সকাম সাধনার উদ্দেশ্য আর্যের ন্যায় ছিল না। দেব-উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ ব্যাপার দুই ভাবে গ্রহণ হত, একটি সকাম বা সঙ্কীর্ণ ভাবে, অপরটি নিষ্কাম বা ব্যাপক ভাবে। ব্যাপক ভাবে যজ্ঞ মানে ত্যাগ; সেখানে বিশ্ব'ই দেবতা ও আত্মা'ই দ্রব্য অর্থাৎ বিশ্বের জন্য আত্মাহুতিই যজ্ঞ। এইরকম যজ্ঞের উপরই ছিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত। বেদের ঐ ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। ষড়ঙ্গের সাথে বেদ অধ্যয়ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। লোভ বা কোন প্রয়োজনের জন্য বেদ অধ্যয়নে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। হেতুশুন্য হয়ে (তপস্যার ভাবে) বেদ অধ্যয়ন করে জ্ঞান লাভ করলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়-(ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্যয়ো জ্ঞেয়শ্চিতি..ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া ইতি"-মহাভাষ্য)। ব্যাকরণ জ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞ আদি হয় না। বেদে অগ্নি দেবতার চরু নির্বাপণের মন্ত্র, "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।" সুর্য্যদেবতার মন্ত্র, ঐ স্থানে হবে, "সুর্য্যায়-নির্ব্বপামি"। এই যে বাক্য প্রয়োগের প্রভেদ, ব্যাকরণ জ্ঞান ভিন্ন জানা যায় না। বেদে লিঙ্গ ও বিভক্তি অনুসারে সব উক্ত হয় নি, এই জন্য বৈদিক ব্যাকরণ জানা দরকার। তাছাড়া ব্যাকরণে উচ্চারণ স্থান নির্ণয় করা আছে, হ্রস্ব দীর্ঘ নির্ণয় করা আছে, অল্প প্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ নিদিষ্ট করা আছে (ক বর্গ হতে প বর্গ পর্যন্ত প্রত্যেক ১ম ৩য় ও ৫ম বর্ণ 'অল্পপ্রাণ' এবং ২য় ও ৪র্থ বর্ণ, 'মহাপ্রাণ')। যে বর্ণের যে উচ্চারণ, সেই বর্ণের সেই উচ্চারণই থাকে, কোন অবস্থায় বদলায় না, যুক্তাক্ষরের বেলাতেও না। এই জন্য উচ্চারণ বৈকল্য দোষ বলে গণ্য হত। ব্যাকরণ নিয়ে অনেক বিচার আছে। এখানে আভাস মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হতে হবে। 'লক্ষ্য লক্ষণে ব্যাকারণম্' (মহাভাষ্য); লক্ষ্য লক্ষণকে ব্যাকরণ বলে। শব্দই লক্ষ্য, সূত্রই লক্ষণ; সূত্র ধরেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। এই লক্ষ্য লক্ষণ সম্মুখ ভাবই ব্যাকরণ, লক্ষ্য লক্ষণ যুক্ত অবয়ব নয়। অবয়ব লক্ষ্যেই প্রযুক্ত হয়ে ভিন্নার্থ হয়, লক্ষ্যের অক্ষর বা রূপ বদলায় না।

[উদাহরণ স্বরূপ 'বঙ্গ' শব্দটি গ্রহণ করা যাক। বঙ্গ = লক্ষ্য; 'সুত্রানুসারে বঙ্গে বাস করে যে সে বাঙ্গালী'= অবয়ব। এখানে 'বঙ্গ' শব্দটিতে ঙ+গ, এই যুক্তাক্ষর আছে, ঐ যুক্তাক্ষর মিলিত শব্দই 'লক্ষ্য', অবয়বে যদি

‘লক্ষ্যের’ রূপ বদলে যায় বা স্থান বিশেষে অক্ষর পরিবর্তন করতে হয়, ঐ সুত্রানুসারে ভুল হয়, (যেমন কোন স্থানে ‘বাঙালি’, কোন স্থানে ‘বাঙ্গালী’ ইত্যাদি)। বাঙ্গলায় অনেক পূর্ব রীতির পরিবর্তন হয়েছে, এমন কি স্বরানুসারে অধ্যয়নের রীতিও অপ্রচলিত। বহু পণ্ডিতের মত যে ঐ স্বরানুযায়ী রীতি প্রচলিত থাকলে অর্থবোধের বিশেষ সৌকর্য্য হয় ও ‘লক্ষ্যের’ ভাব সর্বদা সম্মুখে থাকে, নতুবা ভাব সৌন্দর্যের হানি হয়]।

ধ্বনি অনুযায়ী শব্দের ঝঙ্কার তোলা ভারতে তর কোন স্থানে নেই, একই লক্ষ্যে সকলের গতি, এ ভাব ও অন্যত্র নেই। মাত্র ম্লেচ্ছ দেশের Phonetic হিসাবে বানান ও উচ্চারণ অবৈজ্ঞানিক আত্মঘাতি ও লক্ষ্য হীন।

নিরুক্ত শব্দাভিধানে, শব্দের অর্থ বেদ হতেই সঙ্কলিত। ঐ সব শাস্ত্রের সকল গুলিতে বুৎপত্তি লাভ করে বেদাধ্যয়ন করা একজনের পক্ষে কঠিন। তাই ব্যবস্থা হল যে, অন্ততঃ ঐ সমস্ত শাস্ত্রের মূলতত্ত্ববোধ (Principle এর বোধ) ও ত্যাগ পূত জীবন থাকা চাই। বেদ বলেন, বেদ আবৃত্তিতে কোন ফল নেই, একমাত্র তত্ত্ব জ্ঞানেই জীবনের সার্থকতা। বেদের এই নির্দেশ ভুলেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে পঙ্গুতা এসেছে। যে বেদ আর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ভূমি, সেই বেদের ঐ রকম উক্তি ‘আবৃত্তিতে ফল নেই-এত বড় সাহসিকতা ও সত্য নিষ্ঠা ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র কোথাও এ ভাব নেই। ভাবের ঐক্য, একই ভাবের প্রবাহ-আর্যের মধ্যে সকল দিকে, সব জিনিষই আর্যের কাছে একটি কৌশল-আর্ট বা ললিত কলা বিশেষ।

(সাধন নীতি)

ললিত কলা (আর্ট) বাহিরের ও অন্তরের সৌন্দর্য প্রকাশক। ঐ কলাকে তিন ভাবে দেখা যায়-সাধারণ শিল্প, মানস শিল্প ও অধ্যাত্ম শিল্প হিসাবে। ঐ শিল্প তিনটির বিভিন্ন লিঙ্গ, পৃথক সূত্র কিন্তু লক্ষ্য একই, সুতরাং ঐ তিন শিল্পের প্রত্যেকটি সাধন। যে সাধন ভাবে সমস্ত চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আস্বাদ আনে ও সে ভাবেই জীবনকে গঠন করে, তাকে মানস শিল্প বলা যায়। যোগ একটি মানস শিল্প। নিষ্কাম হয়ে, পবিত্র চিত্তে, শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যের সাথে যে সাধন ভাব আনা যায় ও সেই ভাবে ভাবিত জীবন হয়, তাকে অধ্যাত্ম শিল্প বলা যায়।

সাহিত্য নিজ ভাব বা আদর্শকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, শিল্প ভাবকে বা আদর্শকে রূপ দেয়। আদর্শকে আকার দেওয়াই শিল্পের বিশেষত্ব। আদর্শ ভাবাত্মক শিল্পই ললিত কলা (আর্ট)। তার ভাষা লিঙ্গাত্মক বা ইঙ্গিতাত্মক। ঐ ভাষায় সুন্দর ভাবকে উচ্চ ও মহান ভাবকে রেখা ও বর্ণে প্রকাশ করে, আর যা প্রকাশ করে তার সমস্ত গুণ ও লক্ষণকে রূপ দিয়ে নতুন ছাঁচ (type) গঠন করে। একাগ্র ও একনিষ্ঠ কর্ম কৌশলই যোগ-মানস শিল্প। এই শিল্প সহায় ভাবকে-সাধনাকে যথাযথ বিনিয়োগ করতে পারা যায়, অন্তরের মানুষটি মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হবার চেষ্টা পায়; আসে তখন শ্রদ্ধার ভাব, আত্ম শ্রদ্ধাও জেগে ওঠে। শ্রদ্ধার জাগরণে পবিত্রতা স্বপ্রকাশ হয়, কারণ পবিত্রতাই ভেতরের স্বভাব। একনিষ্ঠার একান্ত অভাবে বা উচ্ছৃঙ্খলতায় পাঁচটি ভাব এলোমেলো ভাবে মিশে, উদয় হয় যেটা, সেটা অপবিত্রতা বা অশুদ্ধতা। এই যে অন্তর বাহির এক হয়ে একনিষ্ঠ বা শুদ্ধ ভাব জাগিয়ে তোলা অর্থাৎ মন-মুখ এক করা, এটাই অধ্যাত্ম শিল্প।

অধ্যাত্ম ভাব রূপক হয়, যতক্ষণ তা কল্পনায় থাকে। কবি কল্পনায় এটা সুন্দর ও মধুর, কিন্তু যখন উহা সাধক জীবনে প্রতিফলিত হয়, তখন সেটি বাস্তব সত্য। ব্রজভাব কবি কল্পনায় কমনীয় ও মধুর, মহাপ্রভুর জীবনে ব্রজভাব চলমান সত্য। কবি কল্পনাকে মাত্র সুষমা মণ্ডিত করতে পারেন, সাধক তাকে প্রত্যক্ষ করেন। কল্পনার ডাক, তার তোড় জোড়, সবই হৃদয় বৃত্তির সুষমা বিকাশের জন্য; আবাহন ও স্থাপন হয় প্রাণবন্তেরই।

পাশ্চাত্যের যুক্তি, "কল্পনার খপ্পরে পড় না, Idealistic হয়ও না, সেটি Unnatural, অস্বাভাবিক; বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য Nature বা দৃশ্য প্রকৃতিই Realistic বা বাস্তব, অতএব সাধনা Realistic এরই হওয়া উচিত" শিল্প মানে যদি একমাত্র Nature বা বাস্তবকে আকার দেওয়ার প্রচেষ্টাতে পর্যবসিত হয়, সেটি কি ঐ Nature এর একটা অনুকরণ প্রয়াস মাত্র নয়? অনুকরণই কি তৃপ্তিদায়ক, তাতে কি জীবনের সার্থকতা আনে? আমাদের বিশেষত্ব, আমাদের মৌলিকত্ব, আমাদের অন্তর্নিহিত উদ্ভাবনী শক্তির কৌশল আমাদের Creative art-কি প্রস্ফুটিত হবে অনুকরণে? উচ্চ ভাবের প্রকাশ, মানবতার ইঙ্গিত, কি মাত্র অনুকরণে হয়, না হতে পারে? আর কল্পনার নামে নাক সটকানোর কি আছে, অনুকরণেও তো কল্পনার দরকার, বর্ণ ও রেখা ফলাতে গেলেও তা মাথা ঘামাতে হয়? ঐ রকম কল্পনায় রূপ দেখা দিলে, সেটি হয় বাস্তব, আর উচ্চ মহান ভাবকে রূপদান করাটাই বুঝি অবাস্তব, অস্বাভাবিক? পাশ্চাত্য natural (স্বাভাবিক) তিনটি কে বোঝায়, যথা- (১) জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence), (২) বেঁচে থাকার সহজাত বোধ (Instinct of Self-preservation), (৩) বংশবৃদ্ধি (Reproduction of Species) ঐ তিনটে জিনিষ যাতে বজায় থাকে সেটাই পাশ্চাত্যের natural (স্বাভাবিক), আর তার ফলে আসে যোগ্যতমের উদ্বর্তন(Survival of the fittest)। জীবন সংগ্রাম, বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও বংশ বৃদ্ধি ঐ তিনটিই- উদ্ভিদ, কীট, অনুকীট ও জন্তু জানোয়ার হতে মানুষ পর্যন্ত সর্ব স্থানেই রয়েছে ও তার ফলে যে যোগ্যতমের উর্দ্ধতন হয়, তার মানে তো দাঁড়ায়, যে দৈহিক বলে বলবানেরই আছে বেঁচে থাকার অধিকার, বুদ্ধির খরচটাও হয় ঐ জন্যে। গতানুগতিক জীবনকে তুচ্ছ করে আপন আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে ও জয় করতে, নব নব উপায় আবিষ্কার করতে সদা অগ্রসর যে মানব, সেই মানুষে জৈব প্রয়োজনের (Biological necessity) সব বিধি খাটানো কি সম্ভব? মানব মন চায় সর্বজয়ী হয়ে লাভ করতে তৃপ্তি। পাশ্চাত্য স্বাভাবিকতা, দেহ রক্ষার জন্যই জীবন সংগ্রামে প্রায় সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে।

সেখানে কোথায় সৌন্দর্য বোধের অবসর, কোথায় বা তৃপ্তি? উল্লেখিত তিনটিকে ভারত দেখেছেন অন্য দৃষ্টিতে। বেঁচে থাকার ইচ্ছা মানে অন্তর্নিহিত একটি প্রবল প্রেরণা; আর সেই প্রেরণাবশেই আসে জীবন সংগ্রাম। অণু পরমাণু হতে সর্ববস্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে-সর্বত্রই ঐ ইচ্ছা, অতএব অমরত্বই সর্ব বাস্তবের প্রয়োজিকা শক্তি। পাশ্চাত্য বলেন যে, জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমরাই টিকে যায় (Survive করে)। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে কিন্তু আমরা দেখি যে Death, মৃত্যুই বরাবর সকলকে Survive করে, মৃত্যুই চিরজীবী; তা হলে কি Death মৃত্যুই Fittest যোগ্যতম বস্তু? এখানে উত্তর আসে যে, জীব বংশধারা বজায় রেখে মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়। এই রকম যুক্তিতে এটাই প্রমাণ হয় যে ব্যক্তিগত হিসাবে, মৃত্যু সকলের টুঁটি চেপে ধরে, কিন্তু বংশধারা বা প্রবাহ রূপে অমরত্বই টিকে থাকে। কিন্তু তাও কি সর্বাবস্থায় ঠিক? জীব জগতের সর্বক্ষেত্রে এক একটি জাতির লোপ হয় কেন? জগৎ হতে তাদের অস্তিত্ব মুছে যায় কেন? কোথায় এখন পৃথিবীর আদিম

অবস্থার উদ্ভিদ বা জীবজন্তু? কোথায় পুরাতন ভারতেতর জাতির সভ্যতা?

ভারত বলেন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দৃশ্য বিশ্বের, এই Nature এর-বস্তু-মাত্রেরই লক্ষণ অনিত্যতা অর্থাৎ সমস্তই প্রত্যেকটিই পরিণামী ও পরিবর্তনশীল জড়। পরিণাম প্রাপ্তি ও পরিবর্তনশীলতা থাকবেই জড়ে সর্বাবস্থায়। এই পরিণাম প্রাপ্তি প্রভৃতি কে মৃত্যু (Death) আখ্যা দেওয়া হয়। পরিণাম প্রাপ্তি, পরিবর্তন মানে বহুত্ব; অতএব বহুত্ব বন্ধ হলেই, তার পথ রুদ্ধ হলেই, অর্থাৎ তার গতিকে মোড় ফিরিয়ে একত্বের দিকে চালিয়ে দিয়ে ঐ মূল প্রয়োজিকা শক্তির সঙ্গে একাত্মতা বোধ এলেই, আসে অমরত্ব। বেদ বলেন 'তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি', 'তাকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; এই জানা মানে, প্রকৃতির স্বরূপ জানা। এই মৃত্যুকে জয় করা রূপ কৌশলই অধ্যাত্মশিল্প; এখানে বংশ ধারার (Reproduction of Species বা Multiplication এর) প্রশ্নই আসে না-একত্বে বহুত্বের স্থান কোথায় ? ঐ কৌশল অবশ্য ব্যক্তিগত, কিন্তু ঐ প্রয়োজিকা শক্তি প্রত্যেককেই একত্বের পথে চালিত করছে। প্রকৃতির রহস্যই তাই, উদ্দেশ্যও তাই। অধ্যাত্মশিল্পী, ত্যাগ প্রেম ও সংযমের জীবন যাপন করে দেখিয়ে দেন তপস্যার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন, যে জৈব সংস্কারকে অতিক্রম করাই স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি, বহুত্বে হাবুডুবু খাওয়াটাই অস্বাভাবিক অবস্থা। বেদ বলেন 'দ্বৈতাৎ ভয়ং'-বহুত্বেই ভয়, বহুত্বেই সংগ্রাম, বহুত্বই অশান্ত অবস্থা। একত্বেই নির্ভিকত্ব, একত্বেই শান্তি, একত্বেই আত্মশ্রদ্ধা, একত্বেই আত্মপ্রত্যয়।

শ্রদ্ধা ভিন্ন চিত্ত প্রসন্নতা আর কিসে বেশী হয়? চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, সৌন্দর্য, কি শুধু মাংসপেশীর সঠিক চিত্র? চিত্রের পেছনে আসল মানুষটির, যেটা সব চেয়ে বাস্তব, সেটির রূপ ফুটিয়ে তোলা কি সূক্ষ্ম ও গভীর সৌন্দর্যের পরিচয় নয়? অধ্যাত্মশিল্প শাশ্বত কে রূপ দেয়। এই প্রচেষ্টাতে ধ্যান এনে দেয়, যে ধ্যান ঐ শিল্পের সঞ্জীবনী শক্তি। ধ্যানে যে রূপ প্রকাশিত হয় তাতে সর্ব বৃত্তির চরম তৃপ্তি আসে, অপবিত্রতা সেখানে ঘেষতেই পারে না। তাতে একাত্মতার মানবতার স্ফুরণ হয় বলেই সেটি দেশকাল জয়ী চির নতুন, সেটি অন্তরের আর্ট, মানব প্রাণের রূপ। সেটি কোন ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নেই বলেই সনাতন ও সত্য স্বরূপ। অধ্যাত্মশিল্পী বলেন যে তন্ময়তা হৃদয়ের আত্যন্তিক আগ্রহ আর্টকে প্রত্যক্ষ করায়, বর্ণ ও রূপে আর্ট সামনে এসে দাঁড়ায়, বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। এই যে সাধন পথ তার অর্থ টিকি বা হাঁচি টিকটিকির ব্যাখ্যার মত রূপক নয়। ললিতকলা বা আর্ট ভাবকেই রূপ দেয়; শিল্পীর আদর্শ ফুটে ওঠে। প্রশ্ন এই যে, অধ্যাত্ম আর্ট কি সেই রূপকে চলমান জীবন্ত প্রাণ সম্পন্ন বাস্তবে পরিণত করতে পারে না ?

আর এক দিক দিয়ে পাশ্চাত্য Survival of the fittest কীট পতঙ্গ, জন্তু জানোয়ার, জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে বাঁচে, একটা আরেকটাকে মেরে। মানুষকে জীবন রক্ষা করতে হলে ঐ উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে এগুতে হয়। মানুষ কি ঐ পশুনীতি অতিক্রম করতে পারেনা ? ওরকম জীবন সংগ্রাম মানে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ। পরিবর্তন ও পরিণাম মানে মৃত্যু। যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বরণ করে, মৃত্যু বরণ করে, বেঁচে থাকার যে ইচ্ছা, তার মানে কি ? মৃত্যু বরণ করে কি Survive করা যায় ? বংশধারা রক্ষাতেই মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া যায়, এই যুক্তি মেনে নিলে দাঁড়ায় - (১) মার ধোর করে বেঁচে reproduction করে fittest হওয়া, ও Survive করা, (২) বংশধারা বজায় রাখাতেই রয়েছে অমরত্ব। অমরত্বর কি তা হলে fittest নয়? ভারত বলেন, সংগ্রাম থাকবেই কিন্তু,

“সংগ্রাম অপার সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা
চূর্ণহোক স্বার্থ সাধ মান হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে শ্যামা।”

ঐ কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়, উক্ত দুই লাইনের অর্থ পরিস্কার। আর এক কথা; fitness বা যোগ্যতা আছে বলেই সংগ্রামরত দল সংঘর্ষে অগ্রসর হয়, fitness বা যোগ্যতা আছে বলেই একজন বা উভয়েই Survive করে। Fitnessটি সর্বদাই আছে। দেখা যায়, মানুষের মধ্যে সৈন্যশক্তি দুর্বল অথবা যুদ্ধ উপকরণ দুর্বল দলও বুদ্ধিবলে জয়ী হয়-fit হয়। এখানে পশুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল প্রধান, পশুজগতের নিয়ম মানুষ এখানে অতিক্রম করেছে। জীব হলেই জৈবিক প্রয়োজন থাকবে, এই প্রয়োজনবোধ সহজাত। পশু তার প্রয়োজন বা অভাবকে কমাতে জানেনা ও পারেনা। অভাব মেটাবার জন্য লড়াই করতে সে বাধ্য। মানুষের কিন্তু এমন শক্তি আছে যার সহায়তায় সে তার সমস্ত অভাবকেই-তার তাড়নাকেও-অতিক্রম করতে পারে ও জানে। অভাব তৃপ্তির কৌশলও সে জানে। পশুর জীবন রক্ষার বিধি মানুষে খাটালে, মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ভারতের Struggle for Existence মানে আত্মরক্ষা-আত্মাকে রক্ষা- পাকা আমি’কে দেহ, মানবুদ্ধিবদ্ধ কাঁচা আমির তাড়নার অভিযান হতে রক্ষা করা, বজায় রাখা, পাকা আমিত্ব প্রাপ্ত হওয়া। ভারত বলেন- সংঘর্ষ ও লড়াই তাই তোমার কাঁচা আমির সঙ্গে, তোমার অন্তঃ প্রকৃতির ও বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে। কাঁচা আমির গোলামী করাকে স্বাধীনতা বলেনা। ‘স্ব’ কে ফুটিয়ে তোলাই দেহ মনবুদ্ধির ঐ ‘স্ব’ এর অধীন হয়ে চলাই স্বাধীনতা। যে শক্তি সর্বত্র ঠেলা দিয়ে ক্রমাগত আত্ম বিকাশ করার চেষ্টা করছে, তা রয়েছে সকলের মধ্যে, অতএব যোগ্যতা আছে সকলের। জীবের মধ্যে মানুষেই ঐ শক্তি সর্বাপেক্ষা বিকশিত বা উন্নত বলেই, মানুষই ঐ একত্ব পাবার যোগ্যতম আধার। মানুষ যে অমৃতের অধিকারী এটা জানা দরকার প্রত্যেকের। এই জানা মানে কেবল তোতাপাখীর মত বচন আবৃত্তি নয়, খালি মাথা দিয়ে বুঝে ফেলা নয়। বেদ বলেন-

“তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গাণি সত্যমায় তনম”। (কেন ২-৩৩)

সত্যায়তন সাঙ্গ বেদ-তপস্যা, দম(বৈরাগ্য) ও কর্মে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, জানা মানে সাধন ফল। যাঁরা বলেন যে সত্য লাভের জন্য তপস্যার দরকার নেই বা উপাসনাদি কর্মের দরকার নেই- সে সব চেষ্টারও আবশ্যকতা নেই, ঐ সব লোকের সঙ্গে ব্যবহারে শাস্ত্রকারেরা সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন, তন্ত্র শাস্ত্র তো তাঁদের ভণ্ড, প্রবঞ্চক ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এক জিনিষ নয়, আলোচনা ও জানা এক বস্তু নয়। আদর্শকে ছোট করে দেখার অধিকার কারোর নেই। জীবনযাপন চেষ্টা বিহীন মুরুব্বিয়ানা বড় বড় কথার মূল্য কতটুকু?

“মানস শিল্পের উদ্দেশ্য নিহিত বীর্যকে প্রকাশ করা। ভারতেতর দেশে এর আভাস মাত্র। অধ্যাত্ম শিল্প-ভারতের আদর্শ। সত্যং শিব সুন্দরং। জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড-উদ্দেশ্য। সংহিতা চতুষ্টয়ই চারবেদ। ব্যাসদেব। সরহস্য চতুর্বেদ-শাখা। বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণ, বৈদ্যক। শৌনকের চরণব্যুহ। কৌথুমী ও রাণায়ণ। ভেদ বা প্রস্থান। বেদব্যাস উপাধি বহু। পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পয়ন, সুমন্ত্র। যাজ্ঞবল্ক্য। বাজসনী, বাজসনেয়। শুক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ। ঈশোপনিষৎ। ভৃগু, অথর্বা-আসন। অঙ্গিরা। স্বাহা-অর্থ। যজমান, ঋত্বিক, হোতা, অধ্বর্য্যু। যজ্ঞ-শরীর। উদগাতা। ব্রহ্মা। হোতৃক্রিয়া, উদ্‌গান, ব্রহ্মক্রিয়া। স্বর্গ। নিরুক্ত।

বৈয়াকরণের যাজক। প্রজাজ মন্ত্র। বেদ ও তন্ত্র-দ্বিবিধ শ্রুতি। প্রভেদ। ব্রাহ্মণ, আত্মন, শক্তি। ব্রাহ্মণ ও স্ফোটবাদ। Alexandrian School। শক্তি গঠনের মূল ভাব অন্যত্র নেই। দুহিতা। প্রথম হতেই ভারতের আদর্শ। আপ্তবাক্য। মত বা জ্ঞান। ঋষি। বোধে বোধ। ব্রহ্মবিদ্যা ও তার ধারা। শ্রুতিকণ্ঠস্থ বিদ্যা নয়। বেদ, ছন্দকে অতিক্রম করেছেন। কীর্তন। নানা ছন্দ। ছান্দম। মাহেশ্বরী সূত্র। অধ্যয়ন-সংস্কার কার্য্য। পুরুষার্থ। চার রকমে বিদ্যার স্ফুর্তি। প্রথম গানই সামগান। চার রকম শব্দ, ব্রহ্মার চারি বদন। ব্রহ্মযজ্ঞের জুহূ, উপভৃত, ধ্রুবা, মেধা, অবভৃথ স্নান, উদ্‌ষন।"

সাধন দ্বারাই সত্যজ্ঞানের উদয় হয়, অনিত্যতার আবরণ অপসারিত হয়, নিত্যতার স্ফূর্তি হয়। শিল্প শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে, জীব মাত্রেই শিল্পী। জোনাকী পোকা আলো দিয়ে আহার অন্বেষণই করুক বা নিজ প্রিয় কে আহবানই করুক, সে তার ভেতরের আকর্ষণী শক্তিকেই কাজে লাগাচ্ছে; মানুষ যখন শিল্প সহায়ে এই নিহিত বীর্য কে সামনে ধরার চেষ্টা না করে মাত্র অনুকরণ করে ও বাইরের রূপটি মাত্র প্রকাশ করে সেটিকে সাধারণ শিল্প বলা যায়। এই রকম সাধারণ শিল্প বা কারুশিল্পও, বর্ণ ও রেখায় নয়ন আনন্দদায়ক হয়, শিল্পীর চেষ্টা থাকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার। অনুকরণের বস্তুকে যখন চেনার, বোঝার চেষ্টা হয়, তখন ঐ শিল্পী আর এক ধাপে উঠেন। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়। ভাবের সঙ্গে মিশে গেলে, ভাব আয়ত্তের মধ্যে আসলে, অনুকরণ আর অনুকরণ থাকে না, সেটি বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। মানসশিল্পের উদ্দেশ্য শিল্প ও শিল্পীকে এক করা, একাত্ম করা, ঐ নিহিত বীর্যকে প্রকাশ করা, ঐ নিদ্রিত ভুজঙ্গকে জাগ্রত করা। ভারতেতর দেশে সর্বত্র আজও ঐ কারুশিল্পের প্রথম দুটি ধাপ শিল্পী অতিক্রম করতে পারেন নি, মানস শিল্পের আভাস মাত্র পেয়ে তাঁরা ক্ষান্ত হয়েছেন। ক্বচিৎ কোথায় কে অতিক্রম করেছেন তার কথা হচ্ছে না। গোড়া থেকেই ভারতের আদর্শ অধ্যাত্মশিল্প। ভারতের শিল্পী সর্বত্র বহুতে একেরই প্রকাশ দেখার জন্য লালায়িত। অধ্যাত্ম শিল্পের রূপই দেখাতে তাই তাঁরা চেষ্টা করেছেন। চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে। অন্যত্র, বহুকে পৃথক পৃথক ভাবে বোঝার চেষ্টায়, রূপ ও বিভূতি, মানুষের ভোগ সাধনে, মানুষেরা সুখ সুবিধার জন্য নিয়োজিত। ভারত অন্তরের রূপকে-সত্যং শিবং সুন্দরম'কে ধরে বহুর মধ্যে বিচরণ করেছেন। অন্তরের সুন্দরে তিনি মুগ্ধ, বাইরের রূপ হয়ে গেছে তার কাছে তুচ্ছ তখন, ভুলেছেন তিনি সব, ঐ সুন্দর অন্তর ও বাহিরে সর্বত্র। অন্যত্র, বাহিরের রূপই প্রধান, বহির্জগতের সঙ্গে ব্যবহারে যে ভাব ফুটে ওঠে তারই প্রকাশে শিল্পী যত্নবান। এখন সময় এসেছে ঐ উভয়ের আদান প্রদানের।

অধ্যাত্মশিল্পরূপ সর্ব প্রাচীন সঙ্কলিত শব্দরাশি বেদ, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডে বিভক্ত, জ্ঞানকাণ্ডকে ব্যবহারগম্য করবার জন্যই উপাসনা ও কর্মকাণ্ড। বেদ তিন, কিন্তু অতি বৃহৎ বিধায়, অধ্যয়নের ও অন্যান্য সুবিধার জন্যই ব্যাসদেব দ্বাপরে বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেন, প্রত্যেকটির পৃথক নাম দেন। অধিকাংশ ঋক (সাধারণতঃ আহুতির মন্ত্র) যাতে আছে তার নাম ঋক সংহিতা, যে সব ঋক গীত হয় তার নাম সামসংহিতা, গদ্যাংশ একত্র করে নাম হয়েছে যজুঃ সংহিতা; অবশিষ্ট মন্ত্র যাতে আছে তার নাম অথর্ব সংহিতা। অথর্ববেদে যেমন শান্তি, অভিচার আদি মন্ত্র আছে, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্বের নিগুঢ় রহস্যও আছে। ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রকরণ বশে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের মধ্যে কতকগুলি সাম ও যজুমন্ত্র আছে, সামবেদের মধ্যেও কতকগুলি ঋক ও যজুঃ আছে, যজুর্বেদের মধ্যেও কতকগুলি ঋক ও সাম আছে। মন্ত্রের প্রাধান্য অনুসারে বেদের নামকরণ

হয়েছে। বর্তমানে ঐ সংহিতা চতুষ্টয়'ই চতুর্বেদ নামে পরিচিত।

ঋক সংহিতায় আছে ১০ হাজার মন্ত্র সংখ্যা, অথর্ববেদের কিছু কম ৬ হাজার। মহাভাষ্য (পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত-উদ্বোধন ১ম বর্ষ দ্রঃ) হতে জানা যায় যে সরহস্য চতুর্বেদ বহু প্রকার; অর্ধ্বয্যুর (যজুর্বেদের) শাখা ১০০, সামবেদের ১০০০ হাজার, বাহ্বচ্য ২১ প্রকার, অথর্ববেদ ৯ রকম। এ ছাড়া বাকোবাক্য (উক্তি প্রত্যুক্তিরূপ গ্রন্থ), ইতিহাস (পূর্বতন লোকের চরিত্র বর্ণন গ্রন্থ), পুরাণ (প্রাচীন কথা) ও বৈদ্যক (চিকিৎসা শাস্ত্র) শাস্ত্র আছে। বিভিন্ন শাস্ত্রের নামের শেষে বেদ এই শব্দটি যুক্ত আছে। সব গুলির লক্ষ্য এক, যথা- জ্যোতির্বেদ, ধনুর্বেদ ইত্যাদি। পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত নেই বললেই হয়, তার কারণ ঋগ্বেদের শ্লোক সংখ্যা, প্রতি শ্লোকের পদসংখ্যা, শব্দাংশের পরিমাণ, প্রত্যেক সূক্তে কতগুলি অকারান্ত, ইকারান্তাদি পদ আছে তা সমস্তই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পৈল শিষ্য-ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল ঋক সংহিতাকে দুভাগ করেন, শেখার সুবিধার জন্য। বাস্কল আবার তাকে চারভাগ করেন ও তাঁর ৪ জন শিষ্যকে শেখান; মাণ্ডুককে শেখান ইন্দ্রপ্রমতি। শৌনক চরণব্যূহ নামে বই লেখেন, তিনি লিখেছেন যে ঋগ্বেদের ৮টি শাখা থাকলেও অধিকাংশ পুর্ণ পাওয়া যায় না, ৫টি শাখা লুপ্ত। সামবেদের উত্তর ও পূর্ব এই দুই শাখার বহু প্রশাখা ছিল, এখন মাত্র দুটি পাওয়া যায়। কৌথুমী ও রাণায়ণ নামে দুইজন ঋষি ছিলেন। বাংলা দেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কৌথুমী শাখার অন্তর্গত। অথর্ববেদেরও অনেক অংশ এখন পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের ৮টি শাখাকে ভেদ বা স্থান বলা হয়।

বেদ বিভাগ করায় ব্যাসদেবের নাম হয় বেদব্যাস, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। ব্যাসদেব নিজের চার শিষ্যকে বেদ পড়ান; শিষ্যেরা- পৈল-ঋগ্বেদ; জৈমিনী-সামবেদ; বৈশম্পায়ন-যজুর্বেদ, সুমবত্র-অথর্ববেদ। ঐ সব শিষ্যেরা আপন আপন শিষ্যকে পড়ান ও তারা পুনরায় বেদকে নানাভাবে বিভক্ত করায় তাঁরা ও বেদব্যাস নামে পরিচিত হন। যাজ্ঞবল্ক্য নিজগুরু বৈশম্পায়নের কাছে একটি শাখা পান। গুরুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতভেদ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সে শাখা ত্যাগ করেন, গুরুর কাছে অভিশপ্ত হয়ে চলে যান ও অধীত বিদ্যা ভুলে যান। তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সূর্য্যদেব বাজী(অশ্ব) রূপ ধারণ করে তাঁর বাজ(কেশর) হতে বিদ্যা দান করেন। যাজ্ঞবল্ক্য যা পান তার নাম বাজসনী আর মন্ত্রগুলি বাজসনেয়। এই নতুন শাখার নাম শুক্লযজুর্বেদ; যেটি তিনি ত্যাগ করেছিলেন তার নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ। অধিকাংশ উপনিষদগুলি ব্রাহ্মণভাগের বা মন্ত্রভাগের শেষে আছে, কিন্তু বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ আছে শুক্লা-যজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতার শেষে। এই বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের মধ্যে ঈশোপনিষৎ কে পণ্ডিতেরা সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠস্থান দেন।

ব্রহ্মার এক মানসপুত্র ভৃগু, অথর্বা ঋষি নামে বিদিত। অথর্বার পরে অঙ্গিরা ঋষিত্ব লাভ করেন। অথর্ব হয়ে যায় আসনের নাম, সেই রকম অঙ্গিরাও একটি আসন। যেমন Magistrate একটি আসনের নাম, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। সেই রকম ২০ জন অথর্বা ও অঙ্গিরার নাম পাওয়া যায়। ঐ ২০ জনের হৃদয়ে বেদ প্রকাশিত হন, এটাই অথর্ববেদ বা অথর্বাঙ্গিরস। এই বেদের ৫টি উপবেদ। সকাম ও নিষ্কাম সাধক সকলের জন্যই সাধনক্রম তাতে আছে। অথর্ববেদের পূর্ব ও উত্তরকাণ্ডের মধ্যে, সায়ন পূর্বকাণ্ডের টীকা করেছেন। উত্তরকাণ্ড এখন দুষ্প্রাপ্য, লুপ্ত না হলেও।

ব্যাপক ভাবে বৈরাগ্যময় জীবনই যজ্ঞ। ত্যাগ কর্মের নাম আহুতি। অগ্নিতে ঐরূপ প্রক্ষেপই আহুতি। স্বাহা উচ্চারণ করে আহুতি দিতে হয়। ব্যাপক ভাব বরাবর আছে। পুরাণে, স্বাহা অগ্নির স্ত্রী। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) মতে, 'স্বা শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হে তি চিৎ প্রকৃতি পরা।' স্বা= জীবাত্মা-শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় এই শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্ত্রে, 'বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকে ভবেৎ স্বাহা'-স্বাহা এই বর্ণেই বিশ্ব লয় হয়। যার হিতের জন্য যজ্ঞ করা হত তার নাম যজমান। ঋত্বিক (যাজক) করতেন যজ্ঞ। বড় বড় যজ্ঞে তিনজন ঋত্বিক থাকতেন। ঋগ্বেদী প্রধান যাজক বা হোতাই দেবভাব আহবানকারী, তিনি আহুতি দেন না। যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য হব্য প্রস্তুত করা ও যথাসময়ে হব্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা ছিল অধ্বর্য্যুর কাজ (অধ্বর= স্বর্গের পথ প্রদর্শক)। বেদি নির্মাণাদিতেই যজ্ঞ-শরীর নির্মিত হয়। যিনি এটা করেন, তিনিই অধ্বর্য্যু। হব্য আদি প্রক্ষেপের সময় যজুর্মন্ত্র বলতে হত, সুতরাং অধ্বর্য্যু ছিলেন যজুর্বেদী ঋত্বিক। বড় বড় ক্রিয়ায় তার সহকারী থাকত। বেদ পাঠে বাণী শুদ্ধ চাই, সুতরাং সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতে হত। ঋকমন্ত্র উচ্চৈস্বরে, যজুমন্ত্র নিম্নস্বরে বলতে হয় ও সাম গীত হয়। সাম গানের প্রধান ঋত্বিকই উদগাতা। সর্ববেদীয় ঋত্বিকের ভুল ভ্রান্তি দেখার জন্য বা সংশোধন করার জন্য সর্বোপরি একজন ঋত্বিক থাকতেন, তাকে বলা হত ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্মা হতেন ত্রিবেদী। ব্রহ্মার এই পর্যবেক্ষণ অথবা ত্রুটি সংশোধন ক্রিয়ার নাম ব্রহ্মক্রিয়া। হোতৃক্রিয়া ঋক্‌মন্ত্রে, উদগান ক্রিয়া সামমন্ত্রে ও ব্রহ্মক্রিয়া অথর্বমন্ত্রে হত।

স্বর্গ কামনায় অনেক সময়ে যজ্ঞ হত, বলা বাহুল্য বেদের স্বর্গ ও পুরাণের স্বর্গ এক জিনিষ নয়। বেদে স্বর্গ= জ্যোর্তিলোক। নিরুক্ত না পড়লে বৈদিক মন্ত্রের পদবিভাগরীতি, এমন কি বাচনিক অর্থও বোধগম্য হয় না। তখনকার অর্থ এখন সব সময়ে নেই। উদাহরণ স্বরূপ ঋক্ ১/১/৪/২ এ (ঘৃতাচীং এর) ঘৃত=উদক বা জল যাস্ক ও সায়ন মতে। কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থ অনুসরণ করে, পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উদ্ধৃত ঋকের অর্থ করেছেন, পূতদক্ষ মিত্র ও শত্রুনাশক বরুণকে আমরা এসে প্রার্থনা করছি, তারা এসে ঘি দিয়ে আহুতি দিন; যাস্ক ও সায়ন মতে মানে হয় যে তারা উদক প্রেরণারূপ কর্ম সম্পাদন করেন। অর্থাৎ পূতদক্ষ মিত্র ও রিপুনাশক বরুণকে আহ্বান করা হচ্ছে যেন তারা প্রেরণা দেন।

[(পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণের নিরুক্ত সম্বন্ধে লেখা দ্রঃ) মিত্র ও বরুণ বেদের দুই দেবতা সুর্যেরই দুই রূপ। সূর্য যখন শিরোভাগে তখন তিনি মিত্র, যখন অধোভাগে তখন বরুণ। এইরকম চন্দ্রের আর একটি নাম গন্ধর্ব ও সুর্যের যে সমুদয় রশ্মি চন্দ্রকে দীপ্তিমান করে তার নাম সুষুম্ন।]

বৈদিক বৈয়াকরণদের মধ্যে যাজক শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ ছিল। প্রজাজ মন্ত্র সব বিভক্তি যুক্ত করে ব্যবহার করতে হত ও যিনি বাক্যকে পদানুসারে এবং বর্ণানুসারে ব্যবহার করেন তিনি আত্মিজীন অর্থাৎ যাজক বা যজমান।

বেদের আর একটি নাম শ্রুতি। ঋষি মুখ নিঃসৃত সিদ্ধ বাণীর নাম আপ্তবাক্য; আপ্তবাক্য বেদৰৎ প্রামাণ্য। শ্রুতি দ্বিবিধ- বেদ ও তন্ত্র (মনু-কুলুকভট্ট)। বেদতত্ত্বে অধিকার মাত্র ত্রিবর্ণের, মানব মাত্রই অধিকার তন্ত্র সাধনায়, এই মাত্র প্রভেদ। উপনিষদের ব্রহ্মণ, আত্মন ও তন্ত্রের শক্তি শব্দগুলির ন্যায় ব্যাপক অর্থের শব্দ কোন ভাষাতে নেই। মোক্ষমূলার সাহেবের মতে, ব্রহ্মণ ও আত্মন শব্দদ্বয় বহু প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার প্রাগৃঐতিহাসিক স্তরের,

তার মতে, ব্রহ্মণ শব্দের আদি ধাতু জানা না থাকলেও ব্রহ্মণ শব্দের গোড়ার অর্থ=যা স্ফুটীকৃত হয়, ভেঙ্গে পড়ে, তা সে চিন্তার আকারেই হোক, বাক্যের আকারেই হোক অথবা স্বজনী শক্তির আকারেই হোক বা দৈহিক বলের আকারেই হোক।

[(উক্ত সাহেবের The Vedanta Philosophy দ্রঃ)। সাহেব দেখাচ্ছেন যে, বৃহ, বৃধ্=বর্দ্ধনার্থ, বৃধ, বদ্ধ= Latın Verbum, Latınaএ 'ধ' স্থানে 'ফ' বা 'ব' উচ্চারিত হয়, তা হলে রুধির= Rufees বা Ruber-ইং, Red, যখন 'ধ' স্থানে ইংরাজিতে 'দ' হয়, তখন 'বর্দ্ধ' = Word। অর্থাৎ 'ব্রহ্মণ', 'Verbum', 'Word-সবই ঐ 'বৃহ' বা 'বৃধ্' ধাতু হাতে এসেছে ও একই অর্থ প্রকাশ করে।]

সাহেব আরো বলেছেন যে ব্রহ্মণ শব্দ হতে ক্রমশঃ ভারতীয় আর্যের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে bursting forth of the world, বিশ্ব স্ফুটিকৃত হয়েছে-এই ভাব, যার পরিণতি। স্ফোট বাদ- বাক্ এর স্ফুট্। বহু বহু পরে Alexandrian School এর ভেতর অনুরূপ ভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে দেখা যায়। মোক্ষামূলার সাহেব বলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে, উভয় জাতিই স্বাধীন চিন্তার ফলে একই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, কেউ কারও কাছে ঋণী নন। ভারতের বেলায় পাশ্চাত্যের স্বাধীন চিন্তাও সংকুচিত হয়ে যায়! একই তত্ত্ব যে বিভিন্ন দেশে দেখা যেতে পারে না, তা নয়; কিন্তু যে দেশে একটি নতুন চিন্তা ওঠে, সেটি ঐ দেশের আবেষ্টনী ও ভাবধারার ফল, অন্যত্র যদি অনুরূপ ভাবধারার সৃষ্টি হয়, তবেই সে দেশে ঐ রকম মৌলিক চিন্তা দেখা দিতে পারে, যদি বিপরীত ভাবধারা হয়, একই রকম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে না। যিশুর ভাব যিশুর দেশে ছিল না, কিন্তু তাঁর জীবন গঠিত হয় অন্য এক আবেষ্টনীর মধ্যে, যেখানে তাঁর পরবর্তী জীবনের অনুকূল ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছিল। মোক্ষামূলার সাহেব নিজেই প্রমাণ করেছেন যে, Socrates অন্ততঃ একজন ভারতীয়ের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ করেছিলেন, যে ভারতের সঙ্গে গ্রীসের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সম্বন্ধ (পারসীকদের বা জরথুষ্ট্রবাদীদের মধ্য দিয়ে) স্থাপিত হয়েছিল সক্রেটিসের পূর্বে (Theosophical or Psychological Religion. Lecture III-Maxmuller দ্রঃ), আর ঐ ভাবধারার অর্থাৎ ভারতের ভাবধারার সম্পর্কে আসার পরে Alexandrian School এর উদয় গ্রীসে সম্ভব হয়েছিল। এ বিষয়ে পরে আমরা আরো ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করব। Socrates এর জীবন গ্রীসে নতুন প্রাণ এনে দেয়; তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞ পুরুষ। দুই বিবাহ সত্ত্বেও তাঁর নিষ্কাম ও নিস্পৃহ জীবন আজও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। গ্রীসে ওরকম ভাব আসে কোথা হতে, যে দেশের শিল্প কলাও (Hellenic Art) কামভাবোদ্দীপক ও আচার বিলাস পঙ্কিল? অধুনা বহু মনীষি সক্রেটিসকে বেদান্তী বলে মনে করেন। সক্রেটিস যে ভাবধারা প্রবর্তন করেছিলেন, গ্রীস তা গ্রহণ করতে পারেনি, ধরে রাখতেও পারেনি! ভারতে শক্তিগঠনের মূল ভাব ব্রহ্মচর্য, তা অন্যত্র কোথায়? ভারতের ভাব অন্যত্র গেছে কিন্তু ভাবকে ধরে রাখতে গেলে ভারত যে উপায় অবলম্বন করেন, অন্যত্র কেউ সে দিক্ দিয়ে যান নি। প্রত্যেক নতুন ভাব গ্রহণের পূর্বে ভারতে একটি সংস্কার নিতে হত।

গোড়া থেকেই ভারত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভকে জীবনের আদর্শ করেছেন। পাশ্চত্য মনীষিরা এটা বুঝতে না পেরে ভারতের ইতিহাসে ভাবসঙ্কট উপস্থিত করেছেন। আপ্ত বাক্য সম্যক্দর্শন (সাক্ষাৎকার), অমরত্ব এই শব্দগুলিতে কি বুঝায়? মন্ত্র দ্রষ্টার সিদ্ধান্ত বাক্যই আপ্তবাক্য।

[আপ্নোতি, পাওয়া হওয়া ও হয়ে যাওয়াই-Being and Becoming=সৎ ও সম্ভূতি=লাভ

“প্রতিরোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেহমৃতম্॥” কেন।]

প্রতিরোধবিদতই মত বা জ্ঞান। প্রতিরোধ= বোধে বোধ, প্রত্যেক বোধের (প্রত্যয় বা বুদ্ধিবৃত্তির) বোধ। বোধে বোধই মত, এটাই জ্ঞান, এটাই সাক্ষাৎকার বা সম্যক্‌দর্শন, প্রত্যেক বোধ কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রকাশিত হওয়াই সম্যক দর্শন (তৎমত)। এটাই সমস্ত বোধের বা প্রত্যয় সমূহের প্রত্যাগাত্মরূপ বা ব্রহ্মের প্রকাশকরূপ। এই যে আত্মা (জ্ঞান), এর দ্বারাই বীর্যলাভ হয়, অন্য কোন শক্তি বা উপায় দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যায় না, যথার্থ বীর্য লাভ হয় না-আত্মজ্ঞান দ্বারাই মৃত্যু অভিভূত হয়; সুতরাং এই আত্মজ্ঞান রূপ বিদ্যাই অমরত্ব আনায়। মত মানে অনুভূতি লব্ধ জ্ঞান। ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টার অর্থ ও আমরা বুঝতে পারি এইখানে।

[কৈয়ট বলেন, বুদ্ধি প্রতিভাস=“যদা যদা শব্দ উচ্চাবিস্তদা তদর্থকারা বুদ্ধিরূপজায়তে ইতি প্রবাহ নিত্যত্বাদর্থস্য নিত্যনীত্যর্থঃ’ (মহাভাষ্য)। অর্থাৎ শব্দার্থ বুদ্ধির প্রতিভাসক, যখনই শব্দ উচ্চারিত হয়, তখনই অর্থাকারা বুদ্ধি জন্মায়, এই প্রকার নিত্যতা বশতঃ অর্থের নিত্যতা, সুতরাং অর্থ বোধরূপা বাক্য ও নিত্য। এই নিত্য, জগতের দিক্ দিয়ে। ইঙ্গিতেও মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, কিন্তু উচ্চ চিন্তার জন্য বর্ণাত্মক ভাষার সাহায্য অত্যাবশ্যক।]

BANGLADARSHAN.COM

ঐ বোধে বোধ আনার জন্যই সাধকের আর্তি। ভক্তির দিক দিয়ে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি বোধে বোধ টি প্রস্ফুটিত করেছেন তাঁর আর্তিতে, ‘রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।’

“যস্মিন সর্ব্বাণিভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। (‘ঈশ’)।

যার সমস্ত ভূত জগৎ আত্মাই হয়ে যায় (আত্মাএব অভূত) এবং সর্বভূতে আত্মার অনুদর্শন হওয়ায় ‘এক’ জ্ঞান(বিদ্যার) উদয় হয় (জানেন বা বুঝতে পারেন।-বিজানতা), তাঁর মোহই বা কি শোকই বা কি? এই অবস্থাপ্রাপ্ত মহাজনই আপ্ত, তাই আপ্তবাক্যকে অভ্রান্ত বলা হয়। ঐ বিদ্যার নামই ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যার ধারা চলে আসছে ও এসেছে বরাবর গুরুপরম্পরায়, তাই বেদ, শ্রুতি নামে আখ্যাত। মনে রাখতে হবে যে বিদ্যা বা জ্ঞানই চলে আসত, মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ বিদ্যা নয়। ভারতে বহু নিরক্ষর মহাপুরুষ জন্মেছেন, এটিও এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে।

পাশ্চাত্যরা করেছেন এই খানে ভুল। পাশ্চাত্য বলেন যে, তখন লিপি ছিলনা তাই বেদবিদ্যা চলে এসেছে শুনে শুনে বংশ-পরম্পরায়। তাই বেদের নাম শ্রুতি। শুনে শুনে চলে আসতে পারে গান, হাতেনাতে চলে আসতে পারে বাজনা ও সুরতালের সংযোগে কণ্ঠস্থ হতে পারে। অসংখ্য কবিতা, কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষা, অতবড় ভাষাত্মক বেদের শব্দরাশি চলে আসে বংশ পরম্পরায় কেমন করে লিপি বিনা? যদি এই মত সত্য হয়, তাহলে

মানতে হবে যে, তখন লিখন প্রণালী না থাকলেও শব্দরাশি শেখান হত ঠিক, তবে শেখাবার রীতি ছিল স্বতন্ত্র, তা হলে স্বীকার করতে হয় যে, তখন এই জাতি অত্যদ্ভূত মেধাবী ছিল, তখন না লিখে পড়ে সব হত সংযমী ও ইন্দ্রিয়জয়ী, আর এখন? এখন লেখা পড়ার এত সরঞ্জাম ও সুবিধা সত্ত্বেও পশুত্ব ঘোচেনা, আমরা ঘরের কথাও ভাবতে অক্ষম। তখন দ্বিজাতির বিবাহই হত না বেদ অধ্যয়ন না করলে, ব্রহ্মচর্য ও গুরুগৃহবাস শেষে ঘরে না ফিরলে মূর্খের সমাজে স্থান হত না। কত সহজে তখন বিদ্যা অবশ্য শিক্ষণীয় রীতিতে পরিণত হয়েছিল! পাশ্চাত্য আরো বলেন যে তখন লিপি না থাকলেও ছিল ছন্দ, কিন্তু ছন্দ থাকলে কি হবে? ছন্দের কোন নিয়ম মেনে ঋষিনামধেয় ব্যক্তিরা চলেন নি, কোন নিয়মের বাঁধ তারা মানেন নি-বেদ যে চাষার গান-ঋষি তো কৃষক ছিলেনই। চাষার গানে যদি এই হয়, যার নমুনা অন্যত্র কোথাও নেই, তখনকার উন্নত শ্রেণীর লোকের বা জ্ঞান ছিল কেমন তাহলে?

অতীন্দ্রিয় বোধকে ভাষায় নানা ভাবে প্রকাশ করতে হলে যে সর্বপ্রকার নিয়মের শৃঙ্খলাকে অতিক্রম করতে হয, এটা অসম্ভব কিসে? বাঙ্গালীর কীর্তন কি স্বরলিপিতে সব ফেলা যায় আজও? এই সে দিনকার কথা, বাঙ্গালী জয়দেবের ‘প্রলয় পয়োধিজলে’ কবিতাটি কি ছন্দের কোন নিয়ম মেনেছে, ছন্দ বিধিকে কি অতিক্রম করে যায়নি? কষ্ট কল্পনা করে পণ্ডিতেরা সমস্ত গানটিকে ভেঙ্গে বিভিন্ন ছন্দে এক রকম করে দেখিয়েছেন।

[(পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সংকলিত ‘ছন্দঃসার সংগ্রহ’ দ্রঃ)। ‘প্রলয়- পয়োধিজলে’ কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে তিনি বলছেন যে ওটি কি কোন ছন্দে লেখা? তার পরই বলছেন “The sweetness of its cadence and the regularity of its periods would at once indicate its place there ...But where is to be placed?)

অর্থাৎ সুর মাধুর্য ও তালের কালিক নিয়মের নির্দিষ্টতায় নিশ্চয়ই এটার একটা স্থান নির্দেশ করা যায়, কিন্তু কোথায় এর স্থান দেওয়া যায়? তিনি বলছেন যে ঐ রচনাকে সমবৃত্রম, অর্দ্ধসমম, বিষমম্ পর্যায়ে ফেলা যায় না। তা হলে এই একটি জাতি? এটা কোন আর্যা ও নয়, বৈতালিয়ম বা তার প্রকারভেদ ও নয়, মাত্রাসমকানির অন্তর্গত করা যায় না। এইরূপে ছন্দ শাস্ত্রের কোন পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, কিন্তু কানে বাজে যে ছন্দ? সুতরাং পণ্ডিতজি একটিকে অতিরিক্ত মাত্রা ছন্দ, অপরটিকে অনুষ্টিভতুঙ্গ, কোনটিকে বৃহত্যাং কমলা বা মাত্রাসমক, জগত্যাংতামবস ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে দেখিয়েছেন।

[ছন্দ শাস্ত্রানুসারে লঘুকর বর্গ= Pericles and Treacle, প্রামাণবর্গ=lambus) দুটি সূত্র (পিঙ্গলা বলেন)- গ্নিতি সমনী, ল্লিতি প্রমানী= Trochaic and lambic measures, সমাবৃত্ত ছন্দ-Blank verse ইত্যাদি।]

এখানে এইমাত্র বললেই হবে যে বৈদিক ছন্দের পরিমাপ, মাত্রার দ্বারা নিয়মিত নয়। বৈদিক ছন্দকেও অপৌরূষেয় বলা হয়। পানিনীয় অষ্টাধ্যায়িতে ঋগ্বেদের ভাষাকে ছান্দম্ বলা হয়েছে ও সংস্কৃত বর্ণমালাকে মাহেশ্বরী সূত্র বলা হয়েছে; কারণ, ব্রহ্মা যেমন যোগতত্ত্বের আদি উপদেষ্টা।

শিবই সেরকম প্রথম সরল ধ্বনিকে অর্থযুক্ত সাঙ্কেতিক আকার দেন। বৈদিক ছন্দ কোন বিধি মেনে চলে নি, তার লক্ষ্য যেমন সর্বশৃঙ্খলার পারে, ছন্দের গতি ও সেই রকম অবাধ। যা অপৌরুষেয় নয় তাই লৌকিক ছন্দ (গণছন্দ, মাত্রাছন্দ, অক্ষর ছন্দ-বৃত্তম, জাতি বা মাত্রাছন্দ)। যাই হোক, বৈদিক মন্ত্র গুলিতে লঘুগুরু বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি (metre) আছে। পাশ্চাত্য মতে, ঐ রকম ভঙ্গির জন্যই মন্ত্রগুলি শুনে শুনে চলে আসতে পেরেছে। চাষা ঋষি বেচারিদের তা হলে লঘুগুরু হিসাবে রচনার বুদ্ধিটুকু যুগিয়েছিল, আর বংশপরম্পরায় বিদ্যার ধারা রক্ষা করা দরকার, এ বুদ্ধিটিও ঘটে এসেছিল, যদিও ঋষি বা আচার্যকে অত শব্দরাশি লিপি বিনা শিষ্যদের কণ্ঠস্থ করাতে, কি দুর্ভোগই না পেতে হয়েছিল। বেদ অধ্যয়ন করতে হত, যখন লিপি ছিল না তখন অধ্যয়ন মানে শুধু আবৃত্তি। আর বারবার আবৃত্তি করাতে সব কণ্ঠস্থ হত ও এই রকমে বংশপরম্পরায় শুনে শুনে চলে আসত! ঋক্, ১ম, ১৭০ সূক্তের ('ননূনমস্তি নো শ্বা..') অনুবাদ দত্ত মহাশয় এরকম করেছেন, "অদ্যতন বা কল্যতন কিছুই নাই। অদ্ভুত কার্যের কথা কে বলতে পারে? অন্য লোকের মন অত্যন্ত চঞ্চল, যা উত্তমরূপে পাঠ করা যায় তাও ভুলে যাওয়া যায়।" পাঠ বা আবৃত্তি করাটা কি বিনা লিপিতে বা বিনা গ্রন্থে হত?

বেদ বলেন যে বেদপাঠ বা আবৃত্তি ও অপর বিদ্যা।

["নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ম মেধয়া বহুধা শ্রুতেন" (কঠ ২য়/২৩)। প্রবচনেন = "অনেক বেদ স্বীকরণেন"]

BANGLADARSHAN.COM

তন্ত্রে ও বহু স্থানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে বহু শাস্ত্র আদি পাঠে কিছুই হয় না-জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের কারণ। অধ্যয়ন মাত্র আবৃত্তি নয়। 'অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায় সংস্কারঃ" (মহাভাষ্য)। স্বাধ্যায় বলতে বোঝায় বেদ। 'স্বাধ্যায়ভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে' (গীত), বেদাভ্যাসই বাঙ্ময় তপস্যা। জ্ঞানি গৃহস্থ সর্বদা বাক্যে প্রাণবায়ু ও প্রাণে বাক্য আহুতি দেন।

[কথা বলবার সময়= "বাচি প্রাণং জুহোমি", চুপ করে থাকলে= "প্রাণে বাচং জুহোমি"- (মনু ৪/২৩/২৪)]

বেদের সংস্কার কার্যই অধ্যয়ন। বেদজ্ঞান লাভ করবার জন্যই পুরুষার্থ চতুষ্টয়-ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও সাধন চাই, অর্থাৎ বেদজ্ঞানরূপ ভিত্তির উপরেই পুরুষার্থ দণ্ডায়মান। বেদের দ্বারা সাধন হয় বলেই, অধ্যয়ন দ্বারাই বেদের সংস্কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই অধ্যয়নের সাক্ষাৎ ফল, বেদ-রূপ বর্ণরাশির স্বরূপ জ্ঞান, যাতে বিদ্যার স্ফুর্তি হয়। অনুষ্ঠানাদিতেও (কর্মকাণ্ডে) অর্থ বোধ চাই। চার রকমে বিদ্যার স্ফুর্তি হয়, (১) 'আগম কালেন'-বেদবিদ্যা গ্রহণ কাল দ্বারা, (২) 'স্বাধ্যায় কালেন'-অভ্যাস কাল দ্বারা, (৩) 'প্রবচন কালেন'-অধ্যাপন কাল দ্বারা, (৪) 'ব্যবহার কালেন'-প্রয়োগ কাল দ্বারা। এই যে প্রথা, এটা কি বংশপরম্পরায় বা গুরুপরম্পরায় চলে আসতে পারে না ? লিপি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে কেন ? জড়-বিজ্ঞান শাস্ত্র (Science) বুঝতে গেলে শুধু বই পড়ে হয় না, গুরুর কাছে বিদ্যা নিতে হয়, লেকচার কানে শুনতে হয়, হাতেনাতে অভ্যাস করতে হয়, অপরকে বোঝাবার মত স্পষ্ট ধারণা আনতে হয়, প্রয়োগ বা ব্যবহার জানতে হয়। গুরু বা আচার্য মুখে শুনে বোঝাকে আয়ত্তীকরণকে কি শ্রুতি বলা অসঙ্গত?

বেদে ছন্দ আছে, লঘুগুরু স্বরক্রম আছে, সাম গীত হয়, অতএব তখন সঙ্গীতবিদ্যা ও ছিল। প্রথম গানই সামগান। ব্রহ্মা হতে আসে বেদ তত্ত্ব বাক্ স্ফুটিত হয় প্রথম ব্রহ্মার মুখ হতে, শব্দের প্রকাশ হয়। শব্দ চার রকম- দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি-যার মূল স্থানের নাম শব্দব্রহ্ম; তাই শব্দব্রহ্মের প্রকাশমুখ চার; ব্রহ্মার চার বদন- পুরাণস্য কবেঃ চতুর্ম্মুখ সমীবিতং..., তাই ব্রহ্মার শক্তি 'বাক্‌দেবী', তাই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ, মন এর উপভৃৎ (ভরণ করা), চক্ষু এর ধ্রুবা, মেধা এর স্রুব, সত্যই এর অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক এর উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋগ্ মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যর্জুমন্ত্র এর সোমাহুতি, অথর্ব্বাঙ্গিরস এর মেদাহুতি, পুরাণ ইতিহাস আদি এর মধুহুতি।' (যজ্ঞকথা- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দ্রঃ)]।

বেদ, অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম-কাণ্ড বা আচার বিষয়ক সত্যজ্ঞান।

সিন্ধুনদের পূর্ব দিকে অবস্থিত ভূমিতে যে জাতীয় মানব বাস করিত ও যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহাকে ঐ সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ মানবগণ মধ্য-যুগে হিন্দু-জাতি এবং তাহাদের ধর্মকে হিন্দু-ধর্ম বলিত। কিন্তু এই হিন্দুজাতির উৎপত্তির কালের তুলনায় ঐ মধ্যযুগ অত্যন্ত আধুনিক। ঐ মধ্যযুগের পুর্বে এই জাতি আপনাদিগকে আর্য্য-জাতি এবং আপনাদের ধর্মকে সনাতন-ধর্ম অথবা বৈদিক ধর্ম বলিত। অতএব এ জাতির আদি নাম আর্য্য-জাতি এবং ধর্মের নাম বৈদিক ও সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ নিত্য। তৎপর 'ঋ' ধাত +ণাৎ=আর্য্য। 'ঋ' ধাতুর অনকে অর্থ, (১) গমন করা, (২) প্রাধান্য করা, (৩) প্রাপ্ত হওয়া প্রভৃতি।

উত্তরোত্তর ব্রহ্ম মার্গে গমনশীল, শ্রেষ্ঠ আচার-সম্পন্ন এবং সত্যজ্ঞানের জ্যেতিঃ-প্রাপ্ত মানবগণকেই আর্য্য-জাতি বলা হইত। এই জাতির ধর্মের মূল ছিল বেদ বা জ্ঞান। 'বেদ' এই শব্দের অর্থই হইতেছে জ্ঞান বা সত্যজ্ঞান। সেই বেদ বা সত্যজ্ঞান যে কোথা হইতে, কোন্ কালে ও কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বর্তমান যুগে 'বেদ' বলিলে কতকগুলি মন্ত্র-সমষ্টিকে অথবা সেই সকল শ্লোক বা মন্ত্র-বিশিষ্ট গ্রন্থকে সাধারণ মানব বুঝিয়া থাকে। পূর্বে কিন্তু বেদ সম্বন্ধে এইরূপ সংস্কার ছিল না। পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা, দর্শন ও উপনিষদেও পূর্ববর্তী বৈদিক যুগে মুদ্রাযন্ত্র অর্থাৎ ছাপার প্রচলন থাকা ও দুরের কথা, তখন অক্ষর বা বর্ণ-মালারই উৎপত্তি হইয়াছিল না। তৎকালে ব্রহ্ম, আত্মা, সত্যজ্ঞান এবং কর্মবিষয়ক জ্ঞান-রাজি মানুষের বিদ্যা, বেদ বা জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত থাকিত। কেবল গুরুশিষ্য-পরম্পরা ক্রমে সেই জ্ঞানের মুখে মুখে অর্থাৎ একের মুখ বা বাক্য হইতে অন্যের কর্ণের অভ্যন্তর দিয়া আদান প্রদান হইত। শ্রুতি, শ্রবণ বা কর্ণ-যন্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞানের আদান-প্রদান হইত বলিয়া বেদের এক নাম শ্রুতি। পরবর্ত্তী যুগে যখন বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়া পড়ে এবং মানবের বাক্য বা ভাষাকে ঐ সকল অক্ষরে লিখিয়া ব্যক্ত করার উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন হইতে যে বেদ বা জ্ঞান পূর্বে মানুষের বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে মাত্র বিরাজ করিত, তাহা অক্ষর-বদ্ধ হইয়া শ্লোক বা মন্ত্রাকারে রচিত হইতে লাগিল। ঋষিগণ তাঁহাদের বিদ্যা, প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধির অন্তগর্ত ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মজ্ঞান এবং সাধনপদ্ধতি সকল ক্রমে মন্ত্রাকারে লিখিয়া শিষ্যবর্গের স্বরণ-শক্তিতে সংরক্ষণার্থ অভ্যস্ত, মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করার জন্য প্রদান করিতেন। অক্ষর-সৃষ্টির পরে বেদ-রাশি এই ভাবে মন্ত্রাকারে এবং জ্ঞানীগণের স্মৃতিতে বিরাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময় হইতে উপনিষদ্ শাস্ত্রের প্রণয়ন আরম্ভ হয়। ইহাই স্মৃতির যুগ। তারপর সেই একই বেদ

বা সত্যজ্ঞান ক্রমে দর্শন, সংহিতা, তন্ত্র, পুরাণ ও উপ-পুরাণাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে। অতএব সত্য-জ্ঞান-বিষয়ক যে কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া উপপুরাণ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র, উপনিষদ্, শ্র"তি এবং চতুর্বেদ-শাস্ত্র, এ সবই একই 'বেদ' নামে অভিহিত বিদ্যা।

বেদ ছাড়া কোন সত্যজ্ঞান নাই। বেদই মানব-বুদ্ধির গম্য সর্বশ্রেষ্ঠ, উচ্চ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান বা বিদ্যা। বেদ বিষয়ক মন্ত্র বা শাস্ত্র সকল প্রদানতঃ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড, এই দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞানকাণ্ডই প্রকৃত বেদ; কিন্তু কর্ম-কাণ্ডের মধ্য দিয়া আরোহণ না করিলে জ্ঞানকাণ্ড লাভ করা যায় না। সাধন পদ্ধতি অর্থাৎ চিত্ত্ব-শুদ্ধির প্রক্রিয়া সমূহই কর্ম-কাণ্ড। প্রথমতঃ তমোগুণী মানবকে সকাম রূপ পূণ্য-ক্রিয়ার সাহায্যে এবং দেবগণের কৃপায় রজোগুণে ও পরে নিবৃত্তি-ধর্ম বা নিষ্কাম-কর্ম-সাহায্যে সত্বগুণে আরোহণ করিতে হয়। বেদের জ্ঞান কাণ্ড চিরনিত্য , সত্য এবং অভ্রান্ত। কোন যুগেই তাহার পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু মানবের শক্তি, জ্ঞান এবং দেশকালের অবস্থানুসারে কর্মকাণ্ড বা সাধন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইবার যোগ্য। এই করণে পরবর্তী বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সংহিতার উৎপত্তি হইয়াছিল।মানবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া-পদ্ধতি, যজ্ঞ, পূজা, দান, ব্রত, সংযম, উৎসব, অনুষ্ঠান এবং বিধি-নিষেধ-পূর্ণ শাস্ত্রানুশাসন লইয়া কর্ম-কাণ্ড। কর্মের বা ক্রিয়ার বিধানকেই কর্মকাণ্ড বলে। কিন্তু আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, পরলোক, সাধনা, যোগ, সত্য এবং সৃষ্টি প্রভৃতি-বিষয়ক যে জ্ঞান বা বেদ, তাহাই জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। এই জ্ঞানকাণ্ডের কোন, পরিবর্তন বা ভাবান্তর হইতে পারে না; যেহেতু ইহা সত্য, শুদ্ধ ও নিত্য-সিদ্ধ বিদ্যা।

BANGLADARSHAN.COM

বেদান্ত, উপনিষদ্ ও দর্শনাদি শাস্ত্র ঐ জ্ঞানকাণ্ডকে চিরদিন ঠিকই রাখিয়া সাধন-পদ্ধতি রূপ কর্মকাণ্ডকে নানা ভাবে পরিবর্তন করিয়া প্রচার করিয়াছে। বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগদর্শনের তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানে কোনই পার্থক্য নাই, অথচ সাধন-পন্থা বা সাধনার উপায় সম্বন্ধে পার্থক্য রহিয়াছে। এইরূপ উপনিষদ্ সাগর সম্বন্ধেও ঐ কথা। অতএব সর্বশাস্ত্রের যাহা প্রকৃত বেদাংশ বা জ্ঞানাংশ, তাহা চিরদিনই নিত্য, সত্য ও একরূপ্ তাহা বিভিন্ন কালের দেশের জাতির, ধর্মের ও অবস্থার সর্ববিধ মানব এবং জীবমাত্রেরই পক্ষে প্রযোজ্য ও সর্বভৌমিক সত্য। কিন্তু সেই মূল বেদার্থ-সত্যকে নিষ্কাশন করার জন্য নানা ঋষির ও মহাত্মার নানা প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা, ভাষ্য ও দীপিকা সকল প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শন সকলও ঐ জ্ঞানকাণ্ড বেদকে অতিক্রম করিয়া তদবিরুদ্ধ কোন সত্য প্রকাশ করণে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। কিন্তু কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন ও বিভিন্ন ভাব লইয়াই বিভিন্ন দেশে, ধর্মে, যুগে ও জাতিতে গোলযোগ।

এই কর্ম বা আচার-পদ্ধতি এবং সাধন ক্রিয়া কখনও দেশ কাল ও অবস্থা-নিরপেক্ষ অভ্রান্ত সত্য হইতে পারে না। দেশ, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে কর্মকাণ্ডকে পরিবর্তন করিয়া লইতেই হইবে; তাহা না লইলে এবং প্রাচীন বা পুরাতন আচার ধর্ত লইয়া প্রমত্ত থাকিলে মানব কিছুতেই সত্যের অনুসরণে সমর্থ হইবে না। কর্মকাণ্ডকে শক্তি ও অবস্থা অনুসারে বদলাইয়া না লইলে মানবত্বের অভ্যুদয় স্থগিত হইয়া যাইবে। দেশ, কাল এবং মানুষের দৈহিক, প্রাকৃতিক ও পারিমার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কর্ম-নীতিকে এবং বিধি-নিষেধমুলক শাস্ত্রানুশাসন সমুহকে পরিবর্তন করিয়া সম্যক্ পালন করাই ঐ সত্য-জ্ঞান লাভের উপায়। সকল যুগের মানুষ কখনও একই প্রকার জ্ঞান, শক্তি ও সংস্কার-সম্পন্ন হয় না; সকল দেশের জল, বায়ু, শীতোষ্ণ, ভাব এবং মৃত্তিকা কখনও একই প্রকার হয় না। কালের শক্তিতে নিয়তই মানবের ভাব, জ্ঞান ও অবস্থার পরিবর্তন সাধিত

হইতেছে। যখন বৈষয়িক স্বার্থ-ভাব দ্বারা অধিকাংশ মানবের সত্যাসত্য বিচার-বুদ্ধি আবৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে সত্য ও ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। ইহাতে দেশে অসংখ্য প্রকার অন্ধ দেশাচার, কুলাচার, ও কু-সংস্কার প্রবৃতির অভ্যুদয় হয়। তাহাতে মানুষ ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানান্ধ-কারে ডুবিয়া পশুত্বে পরিণত হয়। অতএব এই ভাবে জীবত্বের বা মানবত্বের বিকাশ সাধন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় বেদোক্ত অভ্রান্ত সত্যজ্ঞান মানবের সম্মুখে বিরাজ করিলেও তাহা তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিত্তের গোচরীভূত হয় না।

এইরূপে মানবের বিষয়-ভাবের উৎকর্ষ, আত্যাসক্তি ও সংঘর্ষ দ্বারা বেদ বাস্তবিকই বিলুপ্ত হয়। সেই বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য মুক্ত ব্রহ্মলোক হইতে মহর্ষিগণ, দেবগণ ও ভগবানগণের এ জগতে দলে দলে অবতরণ হইতে থাকে। স্বার্থ, বিষয়, সংসার, ভোগ, এবং ইন্দ্রিয়-সুখকে ত্যাগ না করিলে সত্য-লাভ হয় না। তাই ঐ সকল অবতাররূপী মহাত্মাগণ প্রায়ই সন্ন্যাষাশ্রম পরিগ্রহ করেন। ফলতঃ সন্ন্যাসী না হইলে বিষয়ী ও স্বার্থনিরত পণ্ডিত, গুরুম আচার্য্য, গোস্বমী এবং সমাজ-নেতাগণের ভ্রান্তি এবং কুসংস্কার দুর করিয়া সত্যকে অসত্যের কবল হইতে উদ্ধার করা যায় না। জীব মাত্রই একই আত্মার বিকাশ। বিভিন্ন প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মার বা আত্ম-চৈতন্যের বিভিন্ন ভাবেই বিকাশ হয় বলিয়া জীবে-জীবে ভেদ-ভাব পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র অদ্বৈতবাদ ও তৎসম্মত বিশ্ব-প্রেম-নীতিই স্বার্থ ভাবকে হত্যা করিতে সমর্থ। ত্যাগ ও সংযমাদির সাধনা ব্যতীত কদাচ ঐ বাদে ও নীতিতে আরোহণ করা যায় না। ভেদ ও সঙ্কীর্ণ দেশাচার, কুলাচার ও বর্ণাচারের গণ্ডীতে প্রমত্ত থাকিলে কখনও মানব উদার সত্যকে চক্ষে দেখিতে পারে না।

BANGLADARSHAN.COM

ঐ অদ্বৈতবাদ এবং তৎসম্ভুত বিশ্ব-প্রেম মানুষকে স্বাধীন, তেজস্বী, সর্বজ্ঞ, নির্ভয় ও শক্তিমান্ করিয়া জাগ্রত করে, মৃত্যু-ভয় দুর করিয়া দেয়, ক্ষুদ্রত্বকে বিনাশ করে, এবং মানুষকে ভগবান-পদে আরূঢ় করায়। এই বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ এবং বিশ্ব-প্রীতিই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নাশ করতঃ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে। সর্বজীবই একই আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও বিকাশ; উহারা প্রকৃতি-মাত্র বিভিন্ন হইলেও সে প্রকৃতি অনিত্যা ও ক্ষয়-যোগ্যা। এই সকল সত্য জগতের বিভিন্ন ধর্ম-ভাব ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়াও এক সুমহান্ একত্ব সংস্থাপনে সমর্থ হয়। বিভিন্ন মানবের মধ্যে, বিভিন্ন দেশে, জাতিতে এবং বিভিন্ন মানবের মধ্যে, বিভিন্ন দেশে, জাতিতে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীবর্গের মধ্যে বাহ্য আচার গত ভেদ ও বৈষম্য থাকিলেও সর্বজীবের আত্মগত, সত্যজ্ঞানগত উপাসনা-গত এবং চরমাদর্শ-গত যে কোনই পার্থক্য নাই ও থাকিতে পারে না, তাহাই সমগ্র বেদ-সমুদ্রের প্রতিপাদ্য ও প্রদর্শিত অদ্বৈত-জ্ঞান।

॥চতুরাশ্রম॥

পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চঋণ:

বৈদিক যুগে আমাদের সমাজ জীবনের চারটি পর্বের জন্য চতুরাশ্রম পালন করত। আজকে আমরা সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি। বৈদিক সমাজ সেই চারটে স্তরেই জীবনকে ভাগ করেছিল।

ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে ‘‘বিহিতত্বচ্চাশ্রম কর্মাপি’’ অর্থাৎ আশ্রম বিহিত কর্ম সকলেরই করণীয়। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার প্রকার আশ্রমক চতুরাশ্রম বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬২৮ নং মন্ত্রে চতুরাশ্রম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘‘ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানবগণকে এই তত্ত্ব বলেছিলেন। যিনি আচার্য্যকুলে গুরুসেবা করে অবসর সময়ে যথাবিধি অধ্যয়ন করেন, তারপর গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে পবিত্রস্থানে বেদ পাঠ করেন, ধার্মিক পুত্রের পিতা হন, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আত্মাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তীর্থ ভিন্ন অন্যত্র হিংসা ত্যাগ করেন এবং যাবজ্জীবন এই রকম আচরণ করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে যান, তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না’’।

আশ্রম বলতে মূলত কোনো আশ্রয়স্থলকে বোঝায়-, যেমন-ব্রহ্মচারীর আশ্রয় গুরুগৃহ, গৃহীর আশ্রয় গৃহ, বানপ্রস্থীর আশ্রয় বন এবং সন্ন্যাসীর আশ্রয় বন, মঠ, মন্দির বা সর্বত্র। ধর্মশাস্ত্রে সমগ্র মানব জীবনকে-চারটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগেই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বকর্তব্য। জন্মের পর থেকে পঁচিশ বছর -পূর্বক গার্হস্থ্য আশ্রমে -পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করা সকলের কর্তব্য। পঁচিশ বছর পর ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষে বিবাহ প্রবেশ করে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সংসারধর্ম পালন করা আবশ্যক। তারপর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে বনে গিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন এবং পঁচাত্তর বছর হতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সন্ন্যাস অবলম্বন কতর্ব্য। তবে যুগের সাথে অনেক ধর্মীয় আচার, রীতিনীতি-, বিধান প্রভৃতি পরিবর্তিত হয় কিন্তু ধর্মের পরিবর্তন ঘটে না। বর্তমান যুগে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ যুগে ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করাই সকলের অবশ্য কর্তব্য কিন্তু যারা মুমুক্ষু অর্থাৎ যাদের মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই সন্ন্যাস অবলম্বন করতে হবে। নীচে চারটি আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

ব্রহ্মচর্য

====

যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। বীর্যধারণ, গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষালাভ এবং গুরুসেবাই ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্তব্য। ব্রহ্মচারীকে ঊর্ধরেতা হতে হবে। যার রেতঃ ঊর্ধগামী তিনিই ঊর্ধরেতা। ব্রহ্মচারীর বীর্য (বীর্য) নীম্নগামী করা অনুচিত। কিন্তু কেন বীর্যকে ধারণ করতে হবে? জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে বলা হয়েছেব্রহ্মচর্যই - তপস্যার মধ্যে উৎকৃষ্ট। যিনি এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ঊর্ধরেতা হয়েছেন, তিনিই মনুষরূপী দেবতা। পতঞ্জল যোগসূত্রে বলা হয়েছে, ‘‘ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ’’ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করলে শক্তি লাভ হয়। আমাদের শরীরে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ত্বক এই সাতটি ধাতু রয়েছে। রস থেকে রক্ত (বীর্য), রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে মেদ, মেদ থেকে অস্থি, অস্থি থেকে মজ্জা এবং মজ্জা থেকে শুক্র উৎপন্ন হয়।

এই সপ্তধাতুর তেজই ওজঃশক্তি বা ব্রহ্মতেজ। শুক্র নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজঃশক্তিও নষ্ট হয়। তাই কখনই ব্রহ্মচারীর এই ব্রহ্মতেজ ক্ষয় করা উচিত নয়।

ব্রহ্মচারীদের সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে অর্থাৎ ব্রাহ্মমূর্হুতে শয্যাত্যাগ করে শুচি হয়ে জপ ধ্যান-করা বিধেয়। তাঁদের প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সন্ধ্যাকাল এই তিন সময়ে স্নান করতে হয়। তাঁদের কৃষ্ণাজিন অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া দ্বারা নিমির্ত উত্তরীয় এবং শাণ অর্থাৎ শণনির্মিত অধোবসন পরা কর্তব্য। তাঁরা মুঞ্জা নামক এক প্রকার তৃণ নির্মিত মেখলা কটিসূত্র অর্থ):ৎ কটিতে বাঁধার রজ্জুধারণ করেন। তিনটি গুণবিশিষ্ট (মেখলা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণকে প্রকাশ করে। তবে মুঞ্জাতৃণের অভাবে কুশ দ্বারা মেখলা প্রস্তুত করা যায়। তাঁরা কার্পাস সূত্র দ্বারা নির্মিত উপবীত বা পৈতা ধারণ করেন। ব্রহ্মচারীগণ কাষ্ঠ নির্মিত দণ্ড ধারণ করেন। বিল্ব, পলাশ প্রভৃতি কাষ্ঠ দ্বারা ব্রহ্মচারীর দণ্ড নির্মাণ করতে হয়। দণ্ডের উচ্চতা পা হতে মাথা পর্যন্ত হওয়া আবশ্যক। উপবীত বা উত্তরীয় বাম কাঁধে অবস্থিত এবং ডান কাঁধে অবলম্বিত করা অবস্থায় ব্রহ্মচারীকে উপবীতী বলে। আবার উপবিত বা উত্তরীয় ডান কাঁধে অবস্থিত এবং বাম কাঁধে অবলম্বিত করা অবস্থায় ব্রহ্মচারীকে প্রাচীনাবীতী বলে। কণ্ঠে সরলভাবে মালার মত অবলম্বিত উপবীত বা বস্ত্রবিশিষ্ট ব্রহ্মচারীকে নিবীতী বলে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে দণ্ড, মেখলা ধারণ (টিকী) সূত্র-ও জটাধারণ বা শিখা (কটিসূত্র), ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা-, ভিক্ষা প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর ধর্ম। কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে, ভিক্ষাচারণ, গুরুশুশ্রূষা-, বেদপাঠ, সন্ধ্যাকার্য ও অগ্নিকার্য এই সমুদয় ব্রহ্মাচারীর ধর্ম। কূর্ম পুরাণের অন্যত্র বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, যথাউপকুর্বাণ - এবং নৈষ্ঠিক। যিনি যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করেগৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন, তিনি উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী। আর যিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রম শেষে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন না অর্থাৎ সারা জীবন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। মনুসংহিতায় ব্রহ্মচারীর যে দায়িত্বকর্তব্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে-, তা নিচে সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হল-

**- প্রতিদিন স্নান করে শুদ্ধ হয়ে দেবতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ বা জলদান করা।-
** - দেবতাদের পূজা করা।
** -সকাল ও সন্ধ্যায় সমিধ দ্বারা হোম করা।
** -মধু, মদ, মাংস, কর্পূরচন্দন প্রভৃতি চিত্তে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী গন্ধদ্রব্য-, পুষ্পমাল্য, গুড়, স্ত্রীসঙ্গ, দধি জাতীয় খাদ্য এবং প্রাণিহিংসা বর্জন করা।
** -অভ্যঙ্গ রূপ তেল, চোখের কাজল, চামড়ার পাদুকা (জুতা), ছাতা, বিষয়গীত পরিত্যাগ -বাসনা এবং নৃত্য- করা।
** -একাকী ভূমিতে শয়ন করা।
** -রেতঃপাত না করা। (শুক্রপাত)
** -অনিচ্ছাবশত স্বপ্নাবস্থায় শুক্রপাত হলে স্নান করে গন্ধপুষ্পের দ্বারা সূর্যদেবের অর্চনা করে ‘‘পুনর্মামৈতু ইন্দ্রিয়ম্’’ (আমার বীর্য পুনরায়এই মন্ত্র তিন বার জপ করা (আমাতে ফিরে আসুক-।

**-আচার্যের জন্য কলসপূর্ণ জল, ফুল, গোবর, মাটি, কুশ প্রভৃতি সংগ্রহ করা।
**-প্রতিদিন ভিক্ষা করে অন্ন সংগ্রহ করা।
**-গুরুকুলে, পিতৃকুলে এবং মাতৃকুলে ভিক্ষা না করা।
**-কেবল একজন ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা না করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বহু লোকের নিকট ভিক্ষা করা।
**-প্রতিনিয়ত বেদ অধ্যয়ন করা।
**-স্ত্রী বিষয়ে চিন্তা না করা এবং স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করা।
**-মাতা, পিতা ও আচার্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা এবং তাদের যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করা।-

উপনয়ন হওয়ার পরে গুরুর নির্দেশমত কর্ম করাই ব্রচারীর কতর্ব্য। মনুসংহিতায় গুরুর প্রতি ব্রহ্মচারীর যে দায়িত্বকর্তব্য - বর্ণিত আছে, তা এরকম-

-ব্রহ্মচারী গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে। গুরু বসতে না বলা পর্যন্ত ব্রহ্মচারী বসতে পারবে না।

-গুরু খেতে না বলা পর্যন্ত ব্রহ্মাচারী খেতে পারবে না।

BANGLADARSHAN.COM

-ব্রহ্মচারী গুরুর তুলনায় নিম্নস্তরের খাদ্য গ্রহণ এবং নিম্নস্তরের বস্ত্র পরিধান করবে।

- গুরু নিদ্রা যাওয়ার পর ব্রহ্মচারী নিদ্রা যাবে এবং গুরুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করবে।

-ব্রহ্মচারী গুরুর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করবে।-

মনুসংহিতায় ব্রহ্মচারীকে মস্তক মুণ্ডন করার অথবা জটা রাখার অথবা মস্তকের মধ্যস্থলে শিখা রেখে অবশিষ্ট কেশ মুণ্ডন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী প্রাতঃকালে সূর্য এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নির উপাসনা করবে এবং উপাসনার পর গুরুকে অভিবাদন করবে। গুরু অবস্থান করলে শিষ্যও অবস্থান করবে, গুরু গমন করলে শিষ্য গমন করবে এবং গুরু বসলে থাকলে শিষ্যও বসবে। ব্রহ্মচারী গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। গুরুর আজ্ঞায় বেদ অধ্যয়ন করবে, পরে গুরুর আজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা অন্ন ভোজন করবে। গুরু স্নান করার পর শিষ্য স্নান করবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারী গুরুর জন্য কুশ, জল ও পুষ্প সংগ্রহ করবে। ব্রহ্মচারীদের অবশ্যই সত্ত্বগুণের অধিকারী হতে হবে। শুভ্র বা সাদা রং মূলত সত্ত্বগুণের প্রতীক। তাই ব্রহ্মচারীদের সাদা বস্ত্র এবং সাদা উত্তরীয় পরিধান করা কর্তব্য। তাদের সব সময় সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করতে হবে। গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন সম্পন্ন করার পর ব্রহ্মচারীকে স্নাতক বলে। স্নাতক ব্রহ্মচারীকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করতে হয়। তারপর স্নাতক ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুরু ব্রহ্মচারীকে নানা উপদেশ দিয়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি দান করেন। সমাবর্তন শেষে ব্রহ্মচারী বিবাহকার্য সম্পন্ন করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে।

জীবনের শুরুতেই এত কঠোর ব্রত কেন? শুরুতেই যদি কঠোর ব্রত না করা হয় তবে গার্হস্থ্য জীবনে খুব সহজেই দেহটা পাপবিদ্ধ হয়ে পড়বে। তাই ব্রহ্মচারী কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সংসারে প্রবেশ করলে কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না এবং ভবিষ্যতে সন্ন্যাস নেয়ার পথ সুগম হবে।

গার্হস্থ্য আশ্রম

****

ব্রহ্মচর্য আশ্রমে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকলেও গার্হস্থ্য আশ্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সমন্বয় সাধিত হয়। ব্রহ্মাপুরাণে আছে -, বিবাহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথিসৎকার-, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং সমত্মান উৎপাদন গৃহস্থের ধর্ম। কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে, গৃহস্থআশ্রমই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যত্র বলা হয়েছে-, অগ্নিরক্ষা (হোম), অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান ও দেবপূজা হল গৃহস্থের ধর্ম। গৃহস্থ বা গৃহী দুই প্রকার, যথা উদাসীন ও সাধক। যিনি ঋণত্রয় -হতে মুক্ত হয়ে, ধন সম্পদ ও স্ত্রীপুত্র পরিহার করে মোক্ষলাভের আশায় একাকী বিচরণ করেন-, তিনি উদসীন গৃহী এবং যিনি অতিথি সেবায় নিযুক্ত, তিনিই সাধক গৃহী। গৃহস্থের যে ধর্ম মনুসংহিতার বর্ণনা করা হয়েছে তা এরকম-

-পিতামাতা-, ঋষি ও পিতৃপুরুষদের পুজা ও স্তবস্তুতি করা।-

BANGLADARSHAN.COM

-অতিথিসেবা, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধকার্য এবং জীবসেবা করা।

-পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন তর্পণ বা জলদান করা। -''অগ্নয়ে স্বাহা'' মন্ত্রে অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে এবং ''সোমায় স্বাহা'' মন্ত্রে সোমদেবতার উদ্দেশ্যে হোম করা এবং পরে ''অগ্নি সোমাভ্যং স্বাহা'' মন্ত্রে একত্রে ঐ দুই দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করা।

-বিশ্বদেবগণ, ধন্বন্তরি, কুহু, অনুমতি, প্রজাপতি ব্রহ্ম, দ্যাবাপৃথিবী এবং শেষে স্বিষ্ঠকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশ্যে হোম করা।

-দশদিক প্রদক্ষিণ করে দশদিকপালগণকে প্রণাম করা।

-ব্রাহ্মণ সেবা করা।

-সূর্যাস্তের পর গৃহে কোন অতিথি আসলে তাকে ফিরিয়ে না দিয়ে তার সেবাযত্ন করা।-

-দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ এবং পরিচালকবর্গের ভোজন শেষে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকবে, তা ভোজন করা।

-দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ এবং গৃহদেতাকে পূজা করার পর সস্ত্রীক ভোজন করা।

-ঋতুকালে স্ত্রীগমন করা।

-মাতা, পিতা ও গুরুর সেবা করা।

-সন্তান প্রতিপালন করা।

মহানির্বাণতন্ত্রে গৃহস্থের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা এরকমগৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হবে -, সর্বকর্ম ব্রহ্মে সমার্পণ করবে, কখনও মিথ্যা কথা বলবে না, সর্বদা কপটআচরণ পরিত্যাগ করবে-, দেবতা ও অতিথি পূজায় নিয়োজিত হবে, পিতামাতা ও দেবতাকে রক্ষনাবেক্ষণ করবে-, পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন - করাবে, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভরণপোষণ করবে এবং গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের সেবা করবে। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে-গৃহস্থগণ পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, অন্ন দ্বারা অতিথিগণের, বেদ অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের, পুত্র উৎপাদনের দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার, বলিকর্ম দ্বারা প্রাণিগণের এবং সত্যবাক্য দ্বারা সমগ্র - পৃথিবীর অর্চনা করে উত্তমলোক গমন করেন। বিষ্ণু পুরাণে আরো বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থের একান্ত কর্তব্য কারণ গৃহস্থই তাঁদের আশ্রয়। সন্ধ্যাকালে কোন অতিথি বা সন্ন্যাসী আসলে তাঁকে অবশ্যই আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য। অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, কোন কিছু দান করে পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতাএসব গৃহস্থের জন্য বর্জনীয়। ব -্রহ্মচর্য অবলম্বনকালে মস্তকমুণ্ডন-, জটা রাখা, টিকি রাখা প্রভৃতির নির্দেশ থাকলেও গৃহস্থ আশ্রমে গৃহী চুল রাখতে ও অঙ্গসজ্জা করতে পারবে। ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকালে সাদা বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ থাকলেও গৃহস্থ আশ্রমে রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করা যাবে। এছাড়াও মাছমাংস ভক্-ষণ করা যাবে। তেল ও গন্ধদ্রব্য সহ সকল ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার এবং গীতবাদ্য শ্রবণ করা যাবে।-

বানপ্রস্থ

****

বিষ্ণুপুরাণে আছেবানপ্রস্থ আশ্রমী বনে বাস করে কেশ -, শ্মশ্রু মূল ও বৃক্ষের -ও জটা ধারণপূর্বক ফল (দাড়ি) পত্র আহার করবেন। তিনি ভূমিতে শয়ন করবেন এবং সকলপ্রকার অতিথি পূজা করবেন। তিনি চর্ম, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় তৈরি করবেন। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা, দেবপূজা, হোম, অতিথিসৎকার-, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান প্রভৃতি বনবাসীর কর্তব্যকর্ম। গায়ে বনজ তৈল মাখবেন এবং শীতগ্রীষ্ম সহ্য করে - তপস্যা করবেন। কূর্ম পুরাণে আছে, হোম, ফলমূল আহার-, বেদপাঠ, তপস্যা এবং যথাবিধি সংবিভাগ বানপ্রস্থীর ধর্ম। (সম্পদ বিভাগ)

যখন গৃহস্তের নিজ দেহে বলি উপস্থিত হবে এবং যখন পৌত্র (চুলের পক্কতা) ও পলিত (চর্মে শিথিলতা) ভূমিষ্ঠ হবে (নাতি), তখন বনে গমন করা কর্তব্য। বনে গমনের পূর্বে বনে যেতে অনিচ্ছুক পত্নীকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করা কর্তব্য। বানপ্রস্থীদের শাকব্রহ্মযজ্ঞ) মূল আহার এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের-ফল-, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞঅনুষ্ঠান করা কর্তব্য। বানপ্রস্থী নিজে যা ভক্ষণ করবেন তা থেকে সাধ্যমত ভূতব (লি দেবেন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবেন, আশ্রমে আগত অতিথিদের জলমূলাদির দ্বারা অর্চনা করবেন এবং বেদ অধ্যয়ন -ফল-যজ্ঞ সম্পাদন করবেন। ফলমূল ছাড়াও তাঁরা বন্যশস্য পাক করে ভোজন করতে পারবেন। তাঁদের শুধু -ও যাগ আশ্রমীর কর্ত-রাত্রিবেলা ভোজন করা কর্তব্য। মনুসংহিতায় বানপ্রস্থব্যকর্ম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিচে -সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

-ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্য আহার করবে এবং গরুঘোড়া-, বস্ত্র, আসনশয্যা পভৃতি পরিচ্ছদ ত্যাগ করে বনে -গমন করবে।

-স্ত্রী বনে যেতে চাইলে তাকে সঙ্গে নিতে পারবে কিন্তু যেতে না চাইলে তাকে পুত্রের হাতে অর্পণ করে বনে যাবে।

-মুনিগণের ব্যবহার্য পবিত্র অন্ন অথবা শাকসবজি, ফল প্রভৃতি ভোজন করবে।

BANGLADARSHAN.COM

- শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞ করবে।

-বানপ্রস্থাশ্রমী মৃগ বা হরিণের চর্ম অথবা বস্ত্রখণ্ড পরিধান করবে।

-উষাকালে এবং সন্ধ্যাকালে সণান করবে।

-জটা শ্মশ্রু (দাড়ি), লোম ও নখ ধারণ করবে।

-ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবে এবং অতিথিসেবা করবে।-

-স্বাধ্যায় করবে। (বেদ অধ্যয়ন)

-সকল জীবে দয়া করবে।

-প্রিয়ভাষী হবে।

-আশ্রমীদের নিকট দান গ্রহণ করবে না।

-দানধর্ম পালন করবে।

-অগ্নিত্রয় নিয়ে শ্রৌতকর্ম, যজ্ঞ ও হোম করবে।

-মধু ও মাংস বর্জন করবে।

-পিতৃতর্পণ ও দেবতপর্ণ করবে।

-মৌনতা অবলম্বন করবে

-শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা জয় করার জন্য নানা কঠোর তপস্যা করবে।

সন্ন্যাস

****

BANGLADARSHAN.COM

'ন্যাস' শব্দের অর্থ হল ত্যাগ। সম্যক রূপে যে ত্যাগ, তাই সন্ন্যাস। মূলত বিষয়বাসনা বা সংসারচিন্তা ত্যাগের -নামই সন্ন্যাস। শাস্ত্রে বানপ্রস্থের পর পঁচাত্তর বছর বয়সে সন্ন্যাস নেয়ার কথা বলা হলেও যে কোন বয়সেই কাঞ্চনে আসক্তি না থাকে এবং মুক্তিলাভের -বাসনা ও কামিনী-সন্ন্যাস নেয়া যায়। যদি যৌবনেই কারও বিষয় তীব্র ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি ব্রহ্মচর্যের পরই সন্ন্যাস আশ্রম আলম্বন করতে পারবেন। সন্ন্যাস গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। ব্রহ্মাপুরাণে বলা হয়েছে -, স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষা গ্রহণ, চৌর্য পরিত্যাগ, শুচিতা, অপ্রমাদ, স্ত্রীসম্ভোগ পরিহার, ক্রোধত্যাগ, সর্বজীবে দয়া, গুরুশুশ্-রূষা ও সত্য বাক্য বলা এই কয়েকটি ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর ধর্ম। এছাড়াও সন্ন্যাসীদের আচার শুদ্ধি, নিয়ম, প্রতিকর্ম ও সর্বভূতে সমদর্শন এই পাঁচটি উপব্রত রয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে, সন্ন্যাসী পিতামাতা-, আত্মীয়স্বজন-, বন্ধুবান্ধব-, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী সকলের অনুমতি নিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে গৃহ ত্যাগ করবেন। পিতৃঋণ, দেবঋণ ও ঋষি ঋণ হতে মৃক্তিলাভের জন্য তিনি পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের পূজা করবেন। তিনি আবাসগৃহশূন্য-, ক্ষমাশীল, মায়ামমতাশূন্য-, অহঙ্কারশূন্য, ধীর, জিতেন্দ্রিয়, সুখেদুঃখে সমজ্ঞানী হবেন।- তিনি অর্জিত বস্তু রক্ষা এবং অলব্ধ বস্তু লাভ করতে চেষ্টা করবেন না। তাঁকে শীতগ্রীষ্ম সহিষ্ণু হতে হবে। তিনি -শুভ ও অশুভ সকল বিষয় সমানভাবে দেখবেন। সন্ন্যাসী ধাতুদ্রব্য, পরনিন্দা, মিথ্যা ব্যবহার, স্ত্রীসঙ্গ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ করবেন। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণপাত্র বিবেচনা না করেই -কাল-চণ্ডাল সকলের অন্ন স্থান-কর্মের কথা -শাস্ত্র যথাবিধি অধ্যয়ন করবেন। মনুসংহিতায় সন্ন্যাসীর যে কর্তব্য-ভোজন করবেন। তিনি বেদ উলেস্নখ আছে তার সংক্ষিপ্তকারে নিচে দেয়া হল।

-সন্ন্যাসি দণ্ড, কমণ্ডলু, কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি ধারণ করবেন। (কৃষ্ণমৃগের চামড়া)

-কোন কামনার বস্তু সামনে এসে পড়লেও তাতে আকৃষ্ট হবেন না।

-সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে মমতাশূন্য হয়ে একাকী বিচরণ করবেন।

-সব সময় নির্জন স্থানে বাস করবেন। কেবলমাত্র অন্ন সংগ্রহের জন্য লোকালয়ে গৃহস্থের নিকট যাবেন।

-মাটির তৈরী ভাঙা শরা প্রভৃতি ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা করবেন-, বাসের জন্য গাছতলায় আশ্রয় নিবেন এবং ছেঁড়া ও মোটা কৌপিনাদি বস্ত্র পরিধান করবেন।

-মৌনতা অবলম্বন করবেন এবং কথা বলার প্রয়োজন হলে সত্য বাক্য বলবেন।

-মৃত্যুকে অভিনন্দন জানাবেন না আবার জীবনকেও প্রশংসা করবেন না।

BANGLADARSHAN.COM

-হাটার সময় এমন ভাবে পা ফেলবেন যাতে কোন কীট না মারা যায়। কাপড় দিয়ে ছেঁকে জল পান করবেন যাতে পেটে গিয়ে জলের কীট না মারা যায়।

-কেউ যদি অপ্রিয় কথা বলে বা আশোভনীয় আচরণ করে তা সহ্য করবেন এবং কারো সাথে শত্রুতা করবেন না।

-কেউ যদি তাঁর উপর ক্রোধান্বিত হয়, তবুও তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন না।

-সন্ন্যাসী কেশ মুণ্ডিত করবেন এবং নখ ও শ্মশ্রু কেটে ফেলবেন।

-সন্ন্যাসী ভিক্ষা করে একবার ভোজন করবেন। অতিরিক্ত ভিক্ষা করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করবেন না।

-সন্ন্যাসী তপস্যাধ্যানে অধিকাংশ সময় ব্যয় করবেন। সন্ন্যাসী কর্তৃক কোন- প্রাণী নিহত হলে পাপমুক্তির জন্য স্নান করে ছয়বার প্রাণায়াম করবেন।

সন্ন্যাসীরা জীবন্মুক্ত অর্থাৎ তাঁরা জীবিত হয়েও মুক্ত স্বভাবের। তাই সন্ন্যাসীদের মৃত্যুর পর দাহ করা অনুচিত। তাঁদের মৃত্যুতে কারও অশৌচও হয় না। যা হোক, কালের বিবর্তনে অনেক বিধিবিধানই পরিবর্তি-ত হচ্ছে। গুরুগৃহে গমনপূর্বক শিক্ষা অর্জনের প্রথা ইদানিং নেই বললেই চলে, বনে গমনেরও সুব্যবস্থা নেই এবং সন্ন্যাসও বাধ্যতামূলক নয়। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকলে গৃহে থেকেও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করা যায়।

মনুষ্য জন্ম লাভে প্রত্যেক মানুষ কয়েক প্রকার ঋণে আবদ্ধ হয়, সে ঋণগুলিকে শোধ করাটাই যজ্ঞ।

যজ্ঞকথা-: পুরুষযজ্ঞ তন্ত্রপন্থীও এই বাক্যকে ঘুরিয়ে বলেছেন-, "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পুজনম্।" মনে রাখবেন, যজ্ঞ ও পুজা উভয়েরই তাৎপর্য্য সমান। যজ্ঞ নানাবিধ -"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞাস্তথাপরে, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ-"–কারও নিকট দ্রব্য ত্যাগই যজ্ঞ, কারও বা তপস্যা যজ্ঞ, কারও যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনই কারও নিকট যজ্ঞ। কেউ বা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন, কেউ বা রূপরসাদি - ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন। আবার কেউ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ–ত্যাগাত্মক কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ ; যজ্ঞদেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্ঞ । কে কার উদ্দেশে কোন দ্রব্য আহুতি দেয়? এর উত্তরে আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণ গীতার মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্বের চরম কথা বলছেন,-"ব্রহ্মাপণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নে ব্রহ্মণা হুতম, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"-এই জীবনযজ্ঞ ব্রহ্মকর্ম্ম; ব্রহ্মই এখানে যজমান বা ঋত্বিকু সাজিয়া আহুতি দিচ্ছেন, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোমদ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে দেবতা; এই ব্রহ্মকর্ম্মসম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে । জীবনের কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ । - যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ ; ত্যাগের পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তারই ভোগ কর্ত্তব্য–এই হবিঃশেষভোজন-, অতএব অমৃতভোজন; "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজে যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে এই যজ্ঞরূপে দেখলে জীবনটাই উঁচু হয়ে যায়–নীচের পর্দা হতে উঠে অত্যন্ত উচু পরদায় উপনীত হয়; জীবনের অর্থ পর্য্যন্ত বদলে যায়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই বেদপন্থী সমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত জটিল ও যন্ত্রবদ্ধ হয়ে গেছিল, সেই সময় থেকেই এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও যে আমরা জীবনযজ্ঞের সেই তত্ত্বটি ধরে আছি, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে পারবেন। আপনারা গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা জানেন । মনুষ্য জন্ম মাত্রেই কয়েকট ঋণে বদ্ধ হয়ে জন্মায়, এটাই মানবজন্ম সম্বন্ধে অতি প্রাচীন থি-য়োরি। "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি; ঋনৈঃ ঋণবান জায়তে " উত্তর কালে এই তিন ঋণ পাঁচ ঋণে দাঁড়িয়েছে। দেবগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতা; পিতৃগণ তাকে মানবজন্ম দিয়েছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করে গেছেন, সেই বিদ্যাই তাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করেছে; বন্ধু প্রতিবেশী থেকে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাকে রক্ষা করছে; পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ পর্যন্ত কোনকোনরূপে তার জীবন রক্ষার সাহায্য করছে। অতএব এদের সকলের -না-নিকটেই ঋণ আছে। এই পাঁচটি ঋণ নিয়েই মানুষকে জন্মাতে হয়। ঋণের বোঝা ফেলে রেখে জীবনযাত্রাটি দুষ্কর্ম্ম । জীবন ধরে এই ঋণশোধের চেষ্টা করতে হবে। এক একটা ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছুকিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হ-না-য়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন,–"যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"-দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিং ফেলে দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "বং পিতৃভ্যস্বধা করোতি অপি : অপঃ, তৎ পিতৃষঙ্গ সন্তিষ্ঠতে"–পিতৃগণের উদ্দেশ্যে।

মানব জনম প্রাপ্তিতে ঋণ:

****

"মানব জনম প্রাপ্তিতে ঋণ" বিষয়টি→মানুষের জীবনে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এই বিষয়ে ধারণা থাকাটাও বিশেষভাবে জরুরী।

তাহলে এবার দেখা যাক কি কি "ঋণ"→মানুষের ঘাড়ে চাপে, আর কোন উপায়ে→সেই "ঋণ" পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

মানুষ জন্মানো মাত্রই→কতগুলি "ঋণ" তার ঘাড়ে চাপে। যা হল→"মাতৃঋণ-ঋষিঋণ-দেবঋণ-পিতৃঋণ-সমাজ বা দেশঋণ"। আমরা সকলেই→এই পঞ্চ"ঋণ"এর দ্বারা আবদ্ধ।

তার মধ্যে "মাতৃঋণপিতৃঋণ-"→অপরিশোধযোগ্য। তেমনিভাবে যে কোন নিঃস্বার্থ ভালবাসার "ঋণ"ও→অপরিশোধযোগ্য। তথাপি সন্তান দ্বারা "পিতৃঋণ" পরিশোধ হতে পারে→ ভক্তিভরে তাদের আমৃত্যু "সেবাপরিচর্যা-" করার মাধ্যমে।

শাস্ত্রকারদের মতে "ঋষিঋণ" মুক্ত হওয়া যায়→ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের "অধ্যয়নভাষ্য -মনন স্বাধ্যায়-অধ্যাপনা-, শাস্ত্র চর্চাশাস্ত্র ব্যাখ্যা-"দির দ্বারা।

পূজাযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা-তপস্যা-জপ-→"দেবঋণ" থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

"জনহিতকর কার্যেদেশকে সর্বোতভাবে সমৃদ্ধ করার কাজে-দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে-"→ আত্মনিয়োগ করলে "সমাজ বা দেশঋণ"ও শোধ হয় বলে জানা যায়।

BANGLADARSHAN.COM

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে মানুষ পাঁচটি ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে,

1. দেব ঋণ: দেবতাদের কাছে ঋণ: দেবতাদের পূজা, প্রার্থনা ও হোম যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা এই ঋণ শোধ করতে হয়।

2. ঋষি ঋণ:মুনি ঋষিদের কাছে ঋণ : ঋষি প্রণীত শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা এই ঋণ শোধ করতে হয়।

3. পিতৃঋণ: পিতামাতা ও পিতৃ পুরুষদের কাছে ঋণ: জীবিত পিতামাতা ও পিতৃ পুরুষদের সেবা এবং মৃতদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি দ্বারা এই ঋণ শোধ করতে হয়।

4.নৃ :ঋণ- আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছে ঋণ: অতিথি সেবা, এবং দুঃস্থ, আর্ত্ত, পীড়িত নরনারায়ণের সেবার দ্বারা এই ঋণ শোধ হয়।

5. ভূত:ঋণ- পশুপাখি ও উদ্ভিদাদির নিকট ঋণ, মনুষ্যেতর প্রাণী, পশু পাখি এবং বৃক্ষ লতাদির সেবা দ্বারা এই ঋণ শোধ করতে হয়। এই পাঁচটি ঋণ কে একত্রে পঞ্চঋণ বলে আর এই ঋণ সমূহকে শোধ করাকে পঞ্চযজ্ঞ বলে।

BANGLADARSHAN.COM

॥ওঁ-কার তত্ত্ব॥

ওঁ বা ওঁকারতত্ত্ব বা প্রণবতত্ত্ব-

****

ওঁ-কার কী? বেদে ওঁ-কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

‘‘সবে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রুবীম্যোমিত্যেতদ্॥’’

‘‘সবে বেদা’’-সর্ব প্রকার বেদ৷ সংস্কৃতে মূল ধাতু বিদ মানে জানা। তাই বেদ মানে জ্ঞান৷ সুতরাং সবরকম ক্রিয়াত্মক প্রয়াসে-অর্থাৎ তা জ্ঞানাত্মক বা কর্মাত্মক যাই হোক-লক্ষ্য ছিলেন পরমপুরুষ। আর এখনও তিনিই লক্ষ্য, ভবিষ্যতেও পরমপুরুষই লক্ষ্য থেকে যাবেন। ‘‘সবে বেদা যৎপদমামনন্তি’’-অর্থাৎ যাঁর অনুসন্ধান বা যাঁকে জানতে.....।

‘‘তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি’’-তপঃ মানে কৃচ্ছ সাধন-নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যের মঙ্গলসাধন৷ আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে তপঃ মানে কেবলমাত্র পরমপুরুষের সন্তোষ বিধানে কষ্টবরণ করা৷ তাই ‘‘তপাংসি সর্বাণি.....’’ কথাগুলির অর্থ অধ্যাত্মপিপাসুরা তাঁকে সন্তুষ্ট করতেই তপসাধনে রত।

সনাতন শাস্ত্রের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে ওঁম+উ+অ =কার তত্ত্ব। ওঁ-, এই ত্রিমাত্রার সমন্বয়ই ওঁ। ওঁ থেকেই সমগ্র সৃষ্টি, ওঁ ই সমস্ত কিছু হয়েছে আবার অবশিষ্টও যা আছে তাও ওঁ। পরিচালনাকারীও ওঁ, আর প্রলয়ে সমগ্র সৃষ্টি যেখানে বিলীন হয় তাও ওঁ। ওঁ ই ব্রহ্ম। সেই অদ্বিতীয় ওঁকার তত্ত্ব - নিয়ে সনাতন দর্শনের কিছু সিদ্ধান্ত লেখার চেষ্টা করছি।

আমাদের সকল কাজের শুরুতেই “ওঁ তৎ সৎ ” উচ্চারণ করে শুরু করা উচিৎ।ওঁ (ব্রহ্ম)প্রণব-, তৎজীব-, সৎ- জগৎ। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠপ্রকাশ বেদ। জীবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞ। জগত কর্মময়। কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যজ্ঞ। সুতরাং, “ওঁ তৎ সৎ” মন্ত্রে বেদ, ব্রহ্মজ্ঞ ও যজ্ঞকে বোঝায়। তাই, আমাদের সকল কাজের শুরুতেই “ওঁ তৎ সৎ ” উচ্চারণ করে শুরু করা উচিৎ। এছাড়া আমাদের সনাতন ধর্মে ওঁকারকে বলা হয় পবিত-্রতা ও মঙ্গলতার প্রতীক। প্রণব বা ওঁকারই বেদের নির্যাস ও ব্রহ্মবস্তু।-

ওঁ বা ওঁসংস্কৃত৷(অপর বানানে ওঙ্কার) কার-, অ সর্বজনীন বা প্রণব বা ত্র্যক্ষর হিন্দুধর্মের পবিত্রতম ও ।[ম্+ উ + প্রতীক। এটি হিন্দু দর্শনের সর্বোচ্চ ঈশ্বর ব্রহ্মের বাচক। এই ধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিকটেই এটি পবিত্র বলে গণ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ওঁ কার-“সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক।” রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতে, “...ওঁ হইতে ‘ওঁ শিব’, ‘ওঁ কালী’, ‘ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন।” ওঁকার বৌদ্ধ ও জৈনদেরও একটি পবিত্র প্রতীক। শিখ - সম্প্রদায়ও এটিকে সম্মান করেন। এই প্রতীকের দেবনাগরী রূপॐ, চীনা রূপ 唵, এবং তিব্বতীয় রূপ ཨཾ।

ওঁ শব্দটি সংস্কৃত 'অব' ধাতু থেকে উৎপন্ন, যা একাধারে ১৯টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী ওঁকার এমন এক শক্তি যা সর্বজ্ঞ-, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা, অমঙ্গল থেকে রক্ষাকর্তা, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, অজ্ঞাননাশক ও জ্ঞানপ্রদাতা। ওঁকারকে ত্র্যক্ষরও বলা হয়-, কারণ ওঁ তিনটি মাত্রাযুক্ত – 'অকার-', 'উকার-' ও 'মকার-'। 'অকার-' 'আপ্তি' বা 'আদিমত্ত্ব' অর্থাৎ প্রারম্ভের প্রতীক। 'উকার-' 'উৎকর্ষ' বা 'অভেদত্ব'-এর প্রতীক। 'মকার-' 'মিতি' বা 'অপীতি' অর্থাৎ লয়ের প্রতীক। অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটনকারী ঈশ্বরের প্রতীক।

'প্রণব' শব্দের আক্ষরিক অর্থ, 'যা উচ্চারণ করে স্তব করা হয়'। এর অপর অর্থ, 'যা চিরনূতন'।
ওঁকার ঈশ্বরের সকল নামের প্রতিনিধিস্বরূপ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ নাম।-

বেদ, উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে সর্বত্রই ওঁকার-ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথর্ববেদের গোপথব্রাহ্মণের একটি কাহিনি অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র ওঁকারের সহা-য়তায় দৈত্যদের পরাস্ত করেন। এই কাহিনির অন্তর্নিহিত অর্থ, ওঁকারের বারংবার উচ্চা-রণে মানুষ তার পাশব প্রবৃত্তি জয় করতে সমর্থ হয়। কঠোপনিষদ মতে, ওঁকার অব-কার পরব্রহ্ম। মুণ্ডক উপনিষদে ওঁ-লম্বনে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, তিনি সকল অক্ষরের মধ্যে ওঁকারের উচ্চারণে পরম -কার। মৃত্যুকালে ওঁ-সত্য লাভ হয়। পতঞ্জলির যোগসূত্রকারক-এ ওঁ-ে ঈশ্বরের প্রতীক বলে বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ওঁ-কারের স্মরণ ও উচ্চারণে সমাধি লাভ করা যায়।

ধর্মীয় চিহ্ন হলেও ব্যবহারিক জীবনে ওঁকারের প্র-য়োগ আরও ব্যাপক। প্রত্যেকটি মন্ত্র ওঁকার দি-য়ে শুরু হয়। চিঠিপত্রের শুরুতেও কেউ কেউ ওঁকার লিখে থাকেন। মন্দির-, ঠাকুরঘর প্রভৃতি ধর্মীয় স্থানের প্রতীকচিহ্ন রূপেও ওঁকার ব্যবহৃত হ-য়।

জেনে বা না জেনে প্রতিটি জৈবিক সত্তা পরমপুরুষকে ভালবাসে, তাঁর ভালবাসা পেতে চায়৷ আর সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই তাদের (আমি মানুষের সভ্যতার শুরু থেকে না বলে বলছি মানুষ সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে) সমস্ত আশা-আকাঙক্ষা জ্ঞাতে-জ্ঞাতে সেই পরমপুরুষের দিকেই প্রধাবিত হয়ে চলেছে।

প্রণব কথাটার অর্থ ঈশ্বরের জপ্। আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা জন্ম থেকেই প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করি। প্রণব কথাটার আর একটা মানে প্রতিনিয়ত নতুন। কথিত আছে ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে এই প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। আর এই প্রণব থেকেই সমস্ত সৃষ্টি। অতএব ব্রহ্মা যদি আমাদের পিতা হন তবে প্রণব আমাদের আদি মাতা। এই প্রণবের গর্ভেই আমাদের সবার জন্ম। আবার প্রণব কথাটার আর একটা মানে হচ্ছে যা উচ্চারণ করে স্তব করা হয় তাকেই বলে প্রণব। বেদের মূল এই প্রণব। অর্থাৎ সমস্ত শব্দের মূল এই প্রণব। আমরা এমনকি সমস্ত জীব জগৎ, জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে, এই প্রণব দিয়েই জীবনের প্রথম শব্দ উচ্চারণ করি। যা আসলে ঈশ্বরের জপ্। সমস্ত জীব জগৎ যে ভাষায় কথা বলে তাকে বলে বৈজিক ভাষা। সমস্ত ভাষার বীজ এই বৈজিক ভাষা। বৈজিক থেকে বৈদিক, গ্রিক, হিব্রু, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষার জন্ম

হয়। এই বৈজিক ভাষাতেই সমস্ত জীব কথা বলে বা মনের ভাব প্রকাশ করে। প্রণব বা ওং এই বৈজিক ভাষার উচ্চারিত ধ্বনি ।

সনাতন হিন্দুদের কাছে প্রণব মন্ত্রের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক। আমাদের সবার বীজ মন্ত্র প্রণবপুত হওয়া জরুরী। নতুবা বীজ মন্ত্রের শক্তি অপ্রকাশিত থাকে। অবশ্য হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ এখানেও জাতপাতের ব্যাপারটা নিপুন ভাবে প্রয়োগ করেছেন। তান্ত্রিক সন্ধ্যা পদ্ধতির এক জায়গায় পড়ছিলাম স্ত্রী ও শূদ্রদের ওঁ বা ওম উচ্চারন করার অধিকার নেই। তারা বলবে "ঔং" অর্থাৎ দীর্ঘ প্রণব। যজুর্বেদীয় তর্পন পদ্ধতিতেও বলা আছে, শূদ্রগন বলবে। "নমঃ" না বলে "ওঁ"

যাই হোক, "ওম কথাটাকে ভাঙলে দাঁড়ায় ." অম।-উ- সনাতন হিন্দু মতে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এর কর্তা। আবার সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিন গুনের প্রতীক হচ্ছে ।"ওম" কিন্তু কেউ কেউ বলেন, অম্-উ-আ- এই চারটি বর্ণ নিয়ে প্রণব গঠিত। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রণব পাঁচ অক্ষরের মিলন। অর্থাৎ অ ম অর্থাৎ- ঊ- উ- আ-ক্ষিতি, অপ, মরুত, ব্যোম।

আবার প্রণব লেখাও হয় - চার রকম বানানে -ওম , ওঁ, ওং, ওঁং।এর কারন কী ? ওম আসলে কত অক্ষরের মিলন তা আমরা একটু দেখে নেবো পরের পর্বে ।

BANGLADARSHAN.COM

ওঁ বা ওমকে বলা হয়- অক্ষর ব্রহ্ম। এঁকে একাক্ষর বলা যেতে পারে। অর্থাৎ অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু এগুলোকে বর্ণ থেকে বাদ দিয়ে এক অক্ষর বলা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি স্বরই পূর্ণ বর্ণ। কেবল স্বরেই পূর্ণমাত্রা আছে। ব্যঞ্জন পূর্ণ বর্ণ নহে। স্বর, স্বয়ং উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জন, অন্যকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়। সুতরং ও এবং ম্ এই দুটিতে মিলিত হয়ে যে ওম বা ওং হয়েছে, এঁকে এক বর্ণ বা এক অক্ষর বলা যেতে পারে। অতএব ব্যঞ্জন ও একটি স্বর একত্র থাকলে, এই দুটিকে একটি বর্ণ বলা হয়। অর্থাৎ প্রণব একঅক্ষর-, আবার দুইপাঁচ অক্ষর বলে বর্ণনা করা হয়।-চার-তিন-

ওম আসলে দুটো অক্ষরে লেখা হয় অর্থাৎ ও এবং ম অথবা ও এবং "ওঁ "বা "ওংতাই এঁকে দুই অক্ষরের " মিলন বলা যেতে পারে। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বা নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সক্রিয় বা সগুন ব্রহ্ম।

তবে সব থেকে প্রচলিত অর্থ যেটা আমরা জানি তা হচ্ছে, অ, উ, ম এই - তিনটি বর্ণ নিয়ে ওম বা ওঁ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা ব্রহ্মা), বিষ্ণু ও মহেশ্বর ।(

কিন্তু কেউ কেউ বলেন, অম্-উ-আ- এই চারটি বর্ণ নিয়ে প্রণব গঠিত। তাঁরা বলেন, অকার হচ্ছে পালন - কর্তা, আকার হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম-, উ কারে লয় কর্তা অর্থাৎ তমোগুণাত্মক ব্রহ্ম এবং ম বা ং- ব্রহ্ম। আর শব্দে পরব্রহ্ম অর্থাৎ গুণাতীত (অনুস্বার) চন্দ্রবিন্দু হচ্ছে স্বরের অনুনাসিকত্ব জ্ঞাপক।

আবার কেউ বলেন ওং পঞ্চবর্নাত্মক অর্থাৎ অম-উ-উ-আ- অর্থাৎ পঞ্চভূতের ক্ষিতি), অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমএর-(প্রতীক বলা যেতে পারে।

এইখানে একটা কথা আমি বলি। প্রণব অর্থাৎ ওম, বা ওং বা ওঁ বা ওঁং। একটা জিনিষ খেয়াল করুন, ও এর সঙ্গে ম বা ং বা ঁ যোগ করা আছে অর্থাৎ মহেশ্বর বা কারুর কারুর "ম" ।-, কথায় পরব্রহ্ম বা গুনাতীত ব্রহ্ম . কিন্তু,এই অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু এর অর্থ কি ? বীজ মন্ত্রের অর্থ খুঁজতে গিয়ে দেখেছি ঁ হচ্ছে (চন্দ্রবিন্দু) (অনুস্বর) দুঃখ হরাত্মক বাচক। আর ং হচ্ছে সুখপ্রদ ও দুঃখনাশন।

যাই হোক, ওম , ওঁ, ওং, ওঁং এই চারটিই প্রণব বাচক। -

প্রথম "ওম"প্রণবটি তমোগুণের প্রতিপাদক, তাই জ্ঞানীরা ব্যবহার করেন না।

দ্বিতীয় প্রণব অর্থাৎ ওঁ নৈসর্গিক ঘটনায় শোনা যায়। বহু শাস্ত্রে, এই প্রণবের ব্যবহার পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রণব অর্থাৎ ওং কার ত্রিদেবাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। অনেকেই এটির ব্যবহার করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্থ প্রণব অর্থাৎ ওঁং এর কথা প্রায় শোনা যায় না। তার কারন হচ্ছে-যাদের সগুন সাধনা সমাপ্ত না হয়েছে, তাদের পক্ষে এর ব্যবহার শক্তির অধিক কাজ বলে নির্দিষ্ট হয়। যাদের ভিতর থেকে জাতিভেদ জ্ঞান দূর হয় নাই, নির্গুণ সাধনার যোগ্য হন নাই, তাদের পক্ষে এই চতুর্থ প্রণব ব্যবহার করা উচিত নয়।

★ ওঁকার তত্ত্ব বেদান্তেই -কারের মাহাত্ম্য সনাতন শাস্ত্রের সর্বত্রই কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু অধিকতর বিস্তারিত ওঁ-এই উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব আমি সেই বেদান্ত অনুসরণ করেই সমগ্র তত্ত্বের ভিত্তি করছি । লেখার মধ্যে কোথাও আমার কোন নিজস্ব উক্তি নাই। সমস্তই শাস্ত্রের আনুকুল্যে উপস্থাপন করছি । পাঠক যদি মনে করেন কোন অংশে আমার নিজস্ব হস্তক্ষেপ রয়েছে তা হলে দয়া করে মন্তব্য করবেন। ★

★কঠোপনিষৎ ১১৭-১৫/২/ :- বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, সমস্ত তপস্যাদি কর্মরাশি যাঁর প্রাপ্তির সহায় এবং যাঁর কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, সেই প্রাপ্যবস্তু হইল ওঁ। ইঁহা ওম্ শব্দবাচ্য এবং ওঁ-কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়াত্মক। এই ওঁ-কার ইহার প্রতীক। অতএব এই ওঁ-কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে যিনি যা ইচ্ছা করেন তাঁর তাই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্ঞান কিংবা অপরব্রহ্ম জ্ঞান উভয়ই প্রাপ্ত হয়। ওঁকার অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। কঠোপনিষদ মতে-, ওঁকার পরব্রহ্ম।এই অবলম্বনকে জেনে - সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন।

[পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ তথা কার্য্যব্রহ্ম। ওঁ কার অবলম্বনে-পরব্রহ্মের ধ্যান করলে সাধক ক্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞাত হন। কিন্তু অপরব্রহ্মের ধ্যান করলে অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নয় কেননা সাধকের আত্ম স্বরূপ উপাধিবিনাশে পরব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্যপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়।[

প্রশ্ন উপনিষৎ ৫-:৭-১/ শিবিপুত্র সত্যকাম প্রশ্ন করলেনহে ভগবন্-, মনুষ্যগণের মধ্যে যে কেউ যাবজ্জীবন অনন্যসাধারণরূপে প্রণবের অভিধ্যান করেন, তিনি সেই ধ্যানসহায়ে কোন লোকটি জয় করেন?

ভগবান পিপ্পলাদ তাঁকে উত্তর দিলেনহে সত্যকাম -, এই যে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম আছেন, তদুভয়ই ওঁকার স্বরূপ-; এই হেতুই ওঁকার ব্রহ্মপ্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্মের অনুগমন করেন। সেই উপাসক - কার মাত্রার ধ্যান করেন-যদি কেবল অ, তবে তিনি উক্ত ধ্যান দ্বারা অকার মাত্রাকে সাক্ষাৎ করে শীঘ্রই - পৃথিবীতে জাত হন কারণ, এই অকার হইল ঋ-কার মাত্রা তাকে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করায়। অ-গবেদাত্মক প্রথম মাত্রা। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হয়ে জগতে মহিমা অনুভব করেন। আর যদি - নিরন্তর ধ্যান করেন কার মাত্রার প্রণবকে-সাধক উ, তবে তিনি আত্মভাব প্রাপ্ত হন কেননা উকার হল - যজুর্বেদাত্মক দ্বিতীয় মাত্রা। তিনি দেহান্তে যজুঃসমূহের দ্বারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য ভোগ করে পুনরায় মনুষ্যলোকে প্রত্যাগমণ করেন।

DANCLADARSHAN.COM

কিন্তু যে ব্যক্তি অ, উ, ম এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঁ এই অক্ষররূপ প্রতীকে সূর্যমণ্ডলস্থ সেই পরম পুরুষকে নিরন্তর ধ্যান করেন তিনি তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে জ্যোতির্ময় সূর্যে বিলীন হন। সর্প যেমন জীর্ণ খোলস ত্যাগ করে তদ্রুপ এই সাধকও সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে হিরণ্যলোক প্রাপ্ত হন। কালক্রমে তিনি হিরণ্যলোক হতেও উত্তম পরম পুরুষকে দর্শন করেন। ওঁকারের তিনটি মাত্রা মৃত্যুর অধীনে। কিন্তু এরা যদি একই ব্রহ্মে - নিবিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত হন এবং বাহ্যিক, মধ্যম এবং আভ্যন্তরিন স্থানের অধীশ্বরের প্রকৃষ্ট ধ্যান সহায়ে যোগক্রিয়া সমূহে নিযুক্ত থাকেন তবে সেই যোগী আর বিচলিত হন না। ঋকসমূহের দ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক, যজুঃসমূহের দ্বারা প্রাপ্য চন্দ্রলোক এবং সামসমূহের দ্বারা মেধাবীদের অবগম্য ব্রহ্মলোক এই ত্রিবিধ লোককেই উপাসক ওঁকার অবলম্বনে প্রাপ্ত হন। এবং যা শান্ত-, অজর, অমৃত, অভয় ও সর্বোত্তম তাহাও এই ওঁকার - হন। প্রতীক অবলম্বনেই প্রাপ্ত

মুণ্ডক উপনিষৎ ২-: ৬-৩/২/ উপনিষদে প্রসিদ্ধ মহাস্ত্র ধনু হস্তে নিয়ে সতত চিত্ত নিবিষ্ট করে সেই অক্ষরকে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। ওঁকারই ধনু। জীব হল শর-, ব্রহ্ম উক্ত শরের লক্ষ্য বলে কথিত হন। নিষ্কাম হয়ে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। অতঃপর সেই লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্ন হবে। উহা অদ্বিতীয় আত্মা। সেই আত্মাকে অবগত হও। উক্ত আত্মাকে ওঁকার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান করতে হবে। উক্ত পুরুষ এই হৃদয় মধ-্যেই নানারূপে বর্তমান। তাকেই বিবেকীরা ওঁকার সহা-য়ে সর্বতোভাবে দর্শন করে থাকেন।মুণ্ডক উপনিষদে ওঁকার অব-লম্বনে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলা হয়েছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষৎ-: এই সমস্ত কিছুই ‘ওঁ’ অক্ষরাত্মক। ব্রহ্মের সমীপবর্তীরূপে সেই ওঁ কারের-সুস্পষ্ট নির্দেশ কথিত হচ্ছে ।ভূত-, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই সমস্তই ওঁ-কার। এবং যা কিছু এই ত্রিকালের অতীত তাও ওঁ-কার মাত্রারূপেও বর্তমান। আত্মার পাদসমূহই প্রণবের -অভিন্ন। এই প্রণব ওঁ কার আত্মার সঙ্গে-কারই। এই ওঁ কার-মাত্রা এবং প্রণবের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। অ, উকার -কার এরই মাত্রা। বৈশ্বানর ও অ-কার ও ম-কার। যে উপাসক -স্থান বৈশ্বানরই প্রণবের প্রথম মাত্রা অ-উভয়েই ব্যাপক অথবা উভয়ই আদি বলে জাগরিত প জানেনএইরূ, তিনি সমুদয় কাম্য বিষয় লাভ করেন এবং সর্বাগ্রণী হয়ে থাকেন।

তৈজস এবং উকার উভয়ই উৎকৃষ্ট বলে অথবা উভয়ই মধ্যবর্তী- বলে স্বপ্নস্থান তৈজসই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা -করেন। তার মিত্রে তুল্যজ্ঞান-প্রবাহকে বর্ধিত করেন। তিনি শত্রু-কার। যিনি এরূপ জানেন তিনি বিজ্ঞান-উ কুলে অব্রহ্মজ্ঞ জাত হন না।

প্রাজ্ঞ ও মকার। যে উপাসক -স্থান প্রাজ্ঞই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা ম-কার উভয়ই বিলীয়মান আধার বলে সুষুপ্ত-এইরূপ জানেন তিনি উপাসনা দ্বারা সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ এবং কারণসমূহ হন।

এইরূপে যথোক্ত জ্ঞানবানের দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে অবশেষে মাত্রাহীন ওঁকার তুরীয়-, ব্যবহারাতীত, জগতের পরিসমাপ্তিস্থল, শিবময়, অদ্বৈত আত্মরূপেই পর্যবসিত হয়। যিনি এই সত্যস্বরূপ জানেন, তিনি স্বয়ং পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যান। আমরা এই সত্য জানলাম যে ওঁকারের তিন মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন উপাসনায় সাধক উত্তম -কারের উপাসনাতেই কেবল মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।-এবং পুণর্জন্ম হয় কিন্তু মাত্রাহীন ওঁ লোকসকল প্রাপ্ত হন

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১-: ৮/ সর্ববেদের সার ওঁ। ওঁ শব্দটিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে। শব্দরূপ ওঁকারের দ্বারা -কারস্বরূপ। ওঁ শব্দটি সম্মতিজ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু-পরিব্যাপ্ত বলে এই সমস্তই ওঁ“ওঁ দেবগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাও”- এই কথা বললে ঋত্বিকগণ শ্রবণ করিয়ে থাকেন। ওঁ উচ্চারণপূর্বক সামগান সমূহ গান করে থাকেন। ” ওঁ শোম্”- এই বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করেন। ওঁ উচ্চারণ করিয়া অধ্বর্যু প্রতিগর উচ্চারণ করেন। ওঁ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। ওঁ বলিয়া অগ্নিহোত্র অনুমতি প্রদান করা হয়। বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করব মনে করে বেদপাঠক বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ওঁ উচ্চারণ করেন, এবং তজ্জন্য তিনি অবশ্যই বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করেন।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১ম অধ্যায় -: উদগীথ্ শব্দ বাচ্য-“ওঁ” এই অক্ষরকে উপাসনা করবে; কারণ “ওঁ” এই শব্দ হতে আরম্ভ করে উদগীথ্ গান করা হয়। সেই অক্ষরের উপাসনা, ফল, মহিমা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাখ্যা করছি। ওঁ পরমাত্মার প্রিয় নাম। মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ওঁ উচ্চারণ করতে হয়। এই শ্রেষ্ঠ অক্ষরই আবার পরমাত্মার প্রতীক। ব্রহ্মের প্রতীকরূপে বা উপাসনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা হয়। পৃথিবী চরাচর ভূতবর্গের রস, জলরাশি, ঔষধিসমূহ, মানবদেহের ঔষধিরস, বাক রস, ঋক্ মন্ত্রের রস, সাম মন্ত্রের রস, উদগীথ্ ওঁকার -কার-সামমন্ত্রের রস। সেই যে উদগীথ্ ওঁ, উহাই রসসমূহের মধ্যে রসতম, সর্বোত্তম, পরমাত্মার স্থানীয় এবং অষ্টম। বাক্ই ঋক্, প্রাণই সাম এবং ওঁ। যখন নর নারী যুগলের মিলন হয় তখন উভয়েরই কাম চরিতার্থ হয়।-

এতাদৃশ উক্ত যুগলটি ওঁ এই বর্ণাত্মক অক্ষরে সম্মিলিত হয়। উক্ত এই ওঁ কার সম্মতিজ্ঞাপক। যখন কিছুর-কারকে জানেন কিংবা জানেন না তথাপি -অনুমোদন করা হয় তখন ওঁ উচ্চারণ করা হয়। যিনি এই অক্ষর ওঁ কার অবলম্বনে বেদবিদ্যা-কার দ্বারাই কর্ম করে থাকেন। ওঁ-উভয়েই এই ওঁবিহিত কর্ম প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। যখন কেউ ঋক্ কে আয়ত্ত করেন, তখনই তিনি ওঁ এই অক্ষরটি সাদরে উচ্চারণ করেন; যজুঃ ও সাম সম্বন্ধেও একইরূপ। অতএব এই যে ওঁ অক্ষর, এই 'স্বর' এই অমর ও অভয়। এতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমর ও অভয় হইলেন। অনন্তর যা উদগীথ্ তাই প্রণব, যা প্রণব তাই উদগীথ্। ঐ আদিত্যই উদগীথ্, ইনিই আবার প্রণব; কারণ এই সূর্য ওঁ উচ্চারণ করে আকাশমার্গকে ভ্রমণ করান। সূর্যের উদয় হলেই লোক কর্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব আবর্তনকালে সূর্যই যেন ওঁ উচ্চারণ করে তাদের কার্যে অনুমতি ও অনুমোদন প্রকাশ করেন।

ওঁ ই সমস্ত কিছু। আমরা যা ভোজন করি-তাও ওঁ। ওঁ পান করি। ওঁ জ্যোতির্ময়, বর্ষণকারী, প্রজাগণের পতি, জগৎ প্রসবিতা সূর্য এই স্থানে অন্ন আহরণ করেন। এতেও ওঁ উচ্চারণে অন্ন আহরিত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২য় অধ্যায় -: প্রজাপতির ধ্যানে যে প্রথম স্বর প্রাদুর্ভূত হল তা ওঁ। সেই ওঁ হতেই সমস্ত শব্দরাশি হল। কেননা অ কারই সকল শব্দে ব্যাপ্ত। অতএব -কারই সমস্ত শব্দের কারণ। অ-'এবেদং সর্বমোঙ্কার এবেদং সর্বম্' ওঁকারই এই সমস্ত।-

BANGLADARSHAN.COM

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮-: ৫/৬/ যখন জীবের দেহান্ত হয় তখন তিনি বিদ্বান হলে ওঁ উচ্চারণ হেতু দেহত্যাগ করে উর্ধ্বেই গমন করেন। অবিদ্বান হলে এমন করেন না।

অতএব বিদ্বান হওয়া আবশ্যক। যিনি এই ওঁআরম্ভ কার তত্ত্ব জানেন তিনিই বিদ্বান। যিনি ওঁ উচ্চারণ করে কার্য-করেন তিনিই বিদ্বান। যিনি ওঁ উচ্চারণ করে কার্য সমাপ্ত করেন তিনিই বিদ্বান। যিনি জানেন সমস্ত কিছুই ওঁ তিনিই বিদ্বান। যিনি ওঁকারকেই অবলম্বন করছেন। -কার তত্ত্ব জেনে কিংবা না জেনে উপাসনা করছেন তিনি ওঁ-মনে করেন কেবল তিনিই মোক্ষলাভ করেন। কারকেই একমাত্র অবলম্বন-কার মাহাত্ম্য জেনে যিনি ওঁ-ওঁ

এই সম্পর্কে গীতায় / অধ্যায় ৭)৮ নং শ্লোকভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (, "আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্যের কিরণ-, বেদের ওঁ(প্রণব), আকাশে শব্দ ও মানুষের মধ্য পুরুষত্ব রূপে বিরাজ করি।"শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি সকল অক্ষরের মধ্যে ওঁকার।-

যোগদর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য পতঞ্জলি যোগসূত্রে সমাধিপাদেম১), ২৭বলেছেন (২৮-, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"- প্রণব ঈশ্বরের নাম। তাঁর জপ ও চিন্তা করনীয়।

ওঁ বা প্রণব হচ্ছে মন্ত্রের প্রাণ। পূজা বা ধ্যানের সময় মন্ত্র উচ্চারণে "প্রণব" না থাকলে মন্ত্রের ক্রিয়া হয় না, প্রাণশক্তি নেই বলে।

“ওঁ অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি॥
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং,
তেন মাং পাহি নিত্যম্।”

(অর্থাৎ ,-“আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে আলোতে লইয়া / যাও, হে স্বপ্রকাশ ,আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো”।(

(From ignorance, lead me to truth;

From darkness, lead me to light;

From death, lead me to immortality

Aum peace, peace, peace "-)

BANGLADARSHAN.COM

‘ওঁ’. ওঁওঙ্কার.কার-, ॐ----

"ওঁনি -"য়ে করবো চিন্তা, সাধ্য কি আমার,

তবুও মন চাইলো তাই লিখলাম একটু এবার।

ওঁহলেও কার ধর্মীয় চিহ্ন- ব্যবহারিক জীবনে ওঁকারের প্র-য়োগ আরও ব্যাপক। প্রত্যেকটি মন্ত্র ওঁকার দি-য়েই হয় শুরু যাকে বলে সম্পূটিত করা ।

"ওঁ অ) শব্দ তিনটি অক্ষরে",উ ,ম (মিলিত শব্দ। তবুও আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে কি এমন শক্তি লুকিয়ের আছে এই আমাদের ধর্মের শব্দের মধ্যে। যা কিনা আমরা " ওঁ" প্রতীক রূপে মান্য করি। অসংখ শব্দ ও চিহ্নের মধ্যে কেবল ওই ওম শব্দ কে কেন/" ওঁ" এত মান্যতা। একটু দেখা যাক এই ওঁ উচ্চারনে কি পরিবর্তন হয়।

আমাদের সাধকগণ এবং তপস্বীগণ অনুভব করেছেন যে নিয়মিত নিষ্ঠা সহকারে শুদ্ধ ভাবে এর উচ্চারণে "ওঁ" হতে পারে। এবং নিয়মিত নিষ্ঠা সহকারে মানুষ বাকসিদ্ধ শুদ্ধ ভাবে এর উচ্চারণে শরীর মন শুদ্ধ হয়। সর্ব " ওঁ" প্রকার রোগ জ্বালা দূর হয়। কারণ ওঁ এমনি এক ধ্বনি যেস্থানে এই ধ্বনি নিয়মিত উচ্চারিত হয় সেই স্থানের পরিবেশ শুদ্ধ হয়।

কারণ এই ধ্বনি উচ্চারনে যে ভাইব্রেশনে/তথা কম্পন সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে ওই স্থানের উপরে প্রভাবিত অন্য সকল অশুভ ও নিগেটিভ ধ্বনি বা তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভাইব্রেশন তথা কম্পনের কুপ্রভাব নির্মূল হয়। “ওঁ” ধ্বনির ভাইব্রেশন তথা কম্পন এত প্রচন্ড শক্তিশালী যে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। মনুষ্য শরীরে এই "ওঁ" ভাইব্রেশন তথা কম্পন শরীরকে ও মনকে শান্ত ধ্বনির,নিয়ন্ত্রিত করে। সেই কারনে শুধু সনাতন ধর্মই নয়, ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে ও এই “ওঁ” এর মাহাত্বের বর্ননা পাওয়াযায়।

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে “ওঁ” এর প্রয়োগ জপ ও উপাসনাতে বিশেষ ভাবে মহত্ব লাভ করেছে।

জৈন ধর্ম ও দর্শনেও “ওঁ” এর মাহাত্বের বর্ননা পাওয়া যায়। শব্দই ব্রহ্ম। সকল শব্দের শ্রেষ্ঠ শব্দ “ওঁ”।

সকল ধর্মেরই বিশেষ বিশেষ শব্দ আছে যা তাঁরা পবিত্র বলে মনে করেন এবং বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত, ব্যবহৃত ও প্রয়োগ হয়।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির কাল থেকেই “ওঁ” শব্দের সৃষ্টি। ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির প্রকৃতির অমোঘ শক্তির লীলা খেলায় যে শব্দ বা ভাইব্রেশন তথা কম্পনের উৎপন্ন ও বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা ওই “ওঁ” শব্দ। শব্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই ব্রহ্মান্ড।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানবজীবন। তাইতো মানব শিশুর জন্ম ক্ষণ থেকেই ওই “ওঁ” শব্দের চিৎকারে সকল প্রাণী কুলকে সকল মানুষকে জানিয়ে দেয় তার আগমনী সংবাদ। এবং সেই জন্ম মুহূর্ত থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, যতদিন সে বেঁচে থাকে এই পৃথিবীতে, প্রকৃতির মাঝে, ততদিন নিরলস ভাবে সাচ্ছন্দে চলতে থাকে তাঁর অন্তরে বাহিরে প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ওই “ওঁ” শব্দ ই চলতে থেকে। এবং এই একটি মাত্র শব্দ যা মানুষের নাভি মূল (মণিপুর থেকে উৎপন্ন হয়ে শ্বাস প্রস্বাস এর(সাথে সাথে নিরলস ভাবে চলতে থাকে। এই “ওঁ” শব্দ ই ব্রহ্ম বা নাদ ধ্বনি। তপস্বীপুরুষ, ধ্যানীপুরুষ, যোগীপুরুষগণ প্রতিনিয়ত এই ধ্বনি শ্রবণ করে থাকেন বা শ্রবনে সক্ষম।

আমরা সাধারণ মানুষ এই ধ্বনি অনুভব করতে পারিনা। কারণ এহেন জাগতিক প্রবল শক্তি সম্পন্ন ধ্বনি শ্রবণ করবার বা উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। তাই তপস্বী পুরুষ, ধ্যানী পুরুষ, যোগী পুরুষগণই কেবল সক্ষম হন এহেন ধ্বনির আস্বাদন গ্রহণে।

খ্রিস্টধর্মের প্রতীক ক্রুশ ও বেল।

ক্রুশ হলো পবিত্রতার প্রতীক।যার অর্থ মানব জাতির পরিত্রাণ। বেল বা ঘণ্টার ধ্বনি অতি পবিত্র।

এই ঘণ্টার আওয়জ যতদূর যায় ততদূর পবিত্র থাকে। এই ঘণ্টার শব্দের দ্বারা পরমপিতাকে আহ্বান করা হয়। এ জন্য গির্জায় নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর ঘণ্টা বাজে।

এই ঘণ্টার মধুর আওয়াজ এর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর অনুরাগীদেরও আহ্বান করা হয়।

সনাতন ধর্মে দু'রকমের প্রতীক আছে ,শব্দ প্রতীক ও সাকার প্রতীক। শব্দের মধ্য দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

ওঁকারকে ত্র্যক্ষরও বলা হ-য়, কারণ ওঁ তিনটি মাত্রাযুক্ত ।

'ওঁ', ওঁ উচ্চারণ অত্যন্ত পবিত্র।

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বরের তিনটি কর্ম–সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ। এই তিন কার্য সম্পন্ন করার জন্য তিন দেবতার সৃষ্টি করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

এঁরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর। অন্যান্য সকল দেবদেবী এঁদের অধীন। তাই ওঁঅ উ ম -, এই তিন অক্ষর,

তিন দেবতার শক্তির পরিচয়।
অ(ব্রহ্মা) সৃষ্টির সূচক -
উ -স্থিতির সূচক (বিষ্ণু)
ম(শঙ্কর) বিনাশের সূচক -

ইংরেজিতে GOD শব্দের অর্থও তাই।
G- Generator (সৃষ্টি(
O- Operator (স্থিতি বা পালন(
D- Destructor (লয় বা বিনাশ।(

ওঁ উচ্চারণ করলে শারীরিক ও মানসিক শক্তির সৃষ্টি হয়। মনে একাগ্রতা আসে।ওঁ বা ওঁঅপর বানানে) কার-ওঙ্কারসংস্কৃত (, অ ম্।+ উ +
'অকার-', 'উকার-' ও 'মকার-'।
'অকার-'= 'আপ্তি' বা 'আদিমত্ত্ব' অর্থাৎ প্রারম্ভের প্রতীক।

‘উকার-’= ‘উৎকর্ষ’ বা ‘অভেদত্ব’-এর প্রতীক। ‘মকার-’= ‘মিতি’ বা ‘অপীতি’ অর্থাৎ লয়ের প্রতীক।

এটি হিন্দু দর্শনের সর্বোচ্চ ঈশ্বর ব্রহ্মের বাচক।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ওঁ কার-“সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক।

”রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথামতে, “...ওঁ হইতে ‘ওঁ শিব’, ‘ওঁ কালী’, ‘ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন।”

ওঁজৈনদেরও একটি পবিত্র প্রতীক। কার বৌদ্ধ ও-

শিখ সম্প্রদায়ও এটিকে সম্মান করেন।

এই প্রতীকের দেবনাগরী রূপ ॐ,
ওঁ শব্দটি সংস্কৃত ‘অব’ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যা একাধারে ১৯টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য। এই বুৎপত্তি অনুযায়ী ওঁকার এমন এক শক্তি যা সর্বজ্ঞ-, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা, অমঙ্গল থেকে রক্ষাকর্তা, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, অজ্ঞাননাশক ও জ্ঞানপ্রদাতা।

BANGLADARSHAN.COM

কারুর মতে ওঁকার সৃষ্টি-, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটনকারী ঈশ্বরের প্রতীক।

পতঞ্জলির যোগসূত্রকারক-এ ওঁ-ে ঈশ্বরের প্রতীক বলে বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ওঁকারের স্ম-রণ ও উচ্চারণে সমাধি লাভ করা যায়।

মন্দির, ঠাকুরঘর প্রভৃতি ধর্মীয় স্থানের প্রতীকচিহ্ন রূপেও ওঁকার ব্যবহৃত হ-য়।

গীতায় / অধ্যায় ৭)৮ নং শ্লোকভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (, “আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্যের কিরণ-, বেদের ওঁ(প্রণব), আকাশে শব্দ ও মানুষের মধ্য পুরুষত্ব রূপে বিরাজ করি।”

ওঁকারের বারংবার উচ্চারণে মানুষ তার প-াশব প্রবৃত্তি জয় করতে সমর্থ হয়।

মৃত্যুকালে ওঁ কারের উচ্চারণে-পরম সত্য লাভ হয়।

ওঁকার ঈশ্বরের সকল নামের প্রতিনিধিস্বরূপ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ নাম।- বেদ, উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে সর্বত্রই ওঁকার-ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ওঁকার প্রণব-,যার আক্ষরিক অর্থ, ‘যা উচ্চারণ করে স্তব করা হয়।’ প্রণব বা ত্র্যক্ষর হিন্দুধর্মের পবিত্রতম ও সর্বজনীন প্রতীক। এর অপর অর্থ, ‘যা চিরনূতন।’

রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতে, “...ওঁ হইতে ‘ওঁ শিব’, ‘ওঁ কালী’, ‘ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন।”

ওঁকার বৌদ্ধ ও জৈনদেরও একটি পবিত্র প্রতীক।-

শিখ সম্প্রদায়ও এটিকে সম্মান করেন।

এই প্রতীকের দেবনাগরী রূপ ॐ,

ওঁ (ব্রহ্ম)প্রণব-, তৎজীব-, সৎজগৎ।-

ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বেদ।

BANGLADARSHAN.COM

জীবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞ।

জগত কর্মময়।

কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যজ্ঞ।

সুতরাং, “ওঁ তৎ সৎ” মন্ত্রে

বেদ, ব্রহ্মজ্ঞ ও যজ্ঞকে বোঝায়।

সেই কারনে সকল কাজের শুভ ফল লাভের জন্য কাজের শুরুতেই-

“ওঁ তৎ সৎ”

উচ্চারণ করে শুরু করা উচিৎ।

ওঁ ই-সৃষ্টির আদি শব্দ।

নির্গুণনিস্ক্রিয় ব্রহ্মের এ সক্রিয় ভাব।-

এই সক্রিয় ভাব হতেই সৃষ্টির বিকাশ।

ওঁ এবং ঔঁ কার-এদের মাঝে পার্থক্য কি?

পার্থক্য শুধু বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়।

ওঁকার সংস্কৃতিতে।-কার বাংলায় এবং ঔঁ -

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরুপানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন -"ওঁ, ওম, ঔং, অউম, ঔঁ" এই পাঁচ প্রকার উচ্চারণের মধ্য বস্তুগত বা অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই।

আমাদের সনাতন ধর্মে ওঁকারই বেদের নির্যাস -কার কে বলা হয় পবিত্রতা ও মঙ্গলতার প্রতীক। প্রণব বা ওঁ- ও ব্রহ্মবস্তু। ওঁ বা প্রণব হচ্ছে মন্ত্রের প্রাণ। পূজা বা ধ্যানের সময় মন্ত্র উচ্চারণে"প্রণব" না থাকলে মন্ত্রের ক্রিয়া হয় না, প্রাণশক্তি নেই বলে।

BANGLADARSHAN.COM

"ওং বানানের প্রতিধ্বনি পাই শিব "পুরাণে। সেখানে ভগবান শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলছেনআমার পাঁচটা : মুখ। আর তা হচ্ছে সৃষ্টি, পালন, সংহার, তিরোভাব এবং অনুগ্রহ। সৃষ্টি ভূমিতে, স্থিতি জলে,সংহার অগ্নিতে, তিরোভাব বায়ুতে,অনুগ্রহ আকাশে স্থিত। পৃথিবী থেকে সৃষ্টি, জল থেকে বৃদ্ধি, অগ্নিতে সংহার, বায়ুতে স্থানান্তর আর আকাশ সকলকে অনুগৃহীত করে। সর্বপ্রথম আমার মুখ থেকে ওঁংকার উদ্গারিত হয়। উত্তরদিকের মুখ থেকে অকার, পশ্চিম মুখ থেকে উকার, দক্ষিণ মুখ থেকে মকার, পূর্ব মুখ থেকে বিন্দু (ঁ), মধ্যের মুখ থেকে নাদ উচ্চারিত হয়েছে। (ং) এইভাবে পাঁচ অবয়ব দ্বারা "ওং" কার বিস্তারিত হয়েছে।

বেশিরভাগ পন্ডিতদের মতে, প্রণব আসলে ত্রিবর্ণাত্মক। আ বর্ণটি প্রথমটির অর্থাৎ অ এর উচ্চারণ ভেদ মাত্র।

প্রণবকে ত্রিবর্ণাত্মক, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম গুণের প্রতীক বলা যেতে পারে। আবার পঞ্চবর্ণাত্মক অর্থাৎ অ-আ-ম-ঊ-উ অর্থাৎ পঞ্চভূতের ক্ষিতি), অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এর-(প্রতীক বলা যেতে পারে।

আবার একাক্ষর বলা যেতে পারে। অর্থাৎ অনুস্বর, চন্দ্রবিন্দু এগুলোকে বর্ণ থেকে বাদ দিয়ে এক অক্ষর বলা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি স্বরই পূর্ণ বর্ণ। কেবল স্বরেই পূর্ণমাত্রা আছে। ব্যঞ্জন পূর্ণ বর্ণ নয় । স্বর, স্বয়ং উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জন, অন্যকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়। সুতরং ও এবং ম্ এই দুটিতে মিলিত হয়ে যে ওম বা ওং হয়েছে, এঁকে এক বর্ণ বা এক অক্ষর বলা যেতে পারে। অতএব ব্যঞ্জন ও একটি স্বর একত্র থাকলে, এই দুটিকে একটি বর্ণ বলা হয়।

স্রষ্টাসৃষ্ট-সৃষ্টি- এ তিনই এক। কিন্তু এ সব কথা যতক্ষন সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মায় অর্থাৎ এক ব্রহ্মার জ্ঞান না জন্মায় ততক্ষন অনুধাবন করা যায় না। এইজন্য, যেমন সাধক, সে অনুযায়ী সে বোঝে বা তাকে সেইভাবে বোঝানো হয়।

প্রণব অসীম শক্তির আধার। এই শক্তি অজ্ঞানীর কাছে সুপ্ত। জ্ঞানীর কাছে উদ্ভাসিত। "ওমবা প্রণবের " ই এর-ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অবিরত জপ্ মাহাত্যউত্তর দিতে পারে। এইবার প্রণব সম্পর্কে সুপ্ত সত্য কথা বলবো, প্রণব আসলে একটা ধ্বনি।জীবনরূপ অগ্নি ও প্রাণরূপ বায়ুর মিথুনে বা সংঘর্ষে এই ব্রহ্ম-শব্দ উৎপত্তি হয়েছে। এটি অর্থবহ শব্দ নয়। এই ধ্বনির কোনো অর্থ হয় না। পন্ডিতরা যে যার মতো করে অর্থ বের করেছেন।এই ধ্বনি প্রতিনিয়ত উদ্গীথ হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র, ও সর্বদা। ধ্যানস্থ হয়ে কান পাতলে এই শব্দ শোনা যায়। এবার, ধ্বনি বা শব্দ সৃষ্টির রহস্যঃ একটু দেখে নেই।

আমরা জানি, ধ্বনি চার প্রকার, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী।

শব্দের বা স্বরের উৎপত্তি হচ্ছে পরা আম -োদের শরীরের ক্ষেত্রে এটি মূলাধার। এই মূলাধারে আছে বায়ুশক্তি বা উর্জা শক্তি।সৃষ্টিতত্ত্বের এখানেই অবস্থান। এইখানেই ধ্বনির উৎপত্তি। পরা কথাটার অর্থ হচ্ছে উচ্চ। অর্থাৎ ধ্বনির সর্বোচ্চ পর্যায়, যা আমাদের গোচরীভূত নয়।

KANCHANDARSHAN.COM

এর পরে আছে পশ্যন্তিএটি : আমাদের নাভিমূল। যার জন্য কেউ কেউ বলে থাকেন, প্রণব নাভি থেকে উৎপন্ন শব্দ। আমাদের নাভিচক্রের বায়ু থেকে আসে। শোনা যায় যোগীরা এই ধ্বনি শুনতে পান। একে বলে নাদব্রহ্ম। ধ্বনি এর পরে, নাভি থেকে চলে আসে হৃদয়ে। এখানকার অবস্থানে ধ্বনিকে বলা হয়, মধ্যমা। হৃদয়ের বায়ুচক্রে যখন ধ্বনি অবস্থান করে, তখন তাকে বলে মধ্যমা। এটিও সূক্ষ্ম। তাই হৃদয়ের ডাক সবাই শুনতে পায় না। এরপরে, কণ্ঠে-যেখান থেকে ধ্বনির উৎপত্তি বলে সাধারণের ধারণা। আসলে এই পর্যায়ে এসে ধ্বনি শব্দে পরিণত হয়ে যায়। এই ধ্বনি বা শব্দ আমরা শুনতে পাই। একে বলে বৈখরী।

এবার বিশ্বব্রহ্মান্ডকে যদি আমরা বিরাট পুরুষের দেহ বলে কল্পনা করি, তবে দেখতে পাবো, সেই বিরাট পুরুষের মূল ঊর্যাশক্তি থেকে এই ধ্বনির উৎপত্তি। এটি সৃষ্টির সূচক মাত্র। এর কোনো অর্থ হয় না। কেবল গুন্ বর্তমান। দ্রব্যের যেমন গুন্ বা শক্তি আছে, শব্দেরও তেমনি শক্তি আছে। ভালো সুর শুনলে আমাদের মন মোহিত হয়। আবার বাজির শব্দে বা বজ্রের শব্দে আমাদের মন চমকে ওঠে।

শব্দ দুই রকম ধ্বনি ও বর্ণ। ধ্বনি অর্থবহ নয়। যেমন বিভিন্ন বাদ্যের বাজনা।কাঁসর ঘন্টা :,বাঁশির সুর, বজ্রের ধ্বনি। মেঘের ডাক। ইত্যাদি। তেমনি প্রণব অর্থবহ নয়। প্রণব ধ্বনি, তাই অর্থবহ নয়। বর্ণ কিন্তু অর্থবহ। মানুষ এই বর্ণের সাহায্যেই কথা বলে। তাই অর্থবহ। বর্ণ আবার দুই প্রকার ব্যঞ্জন বর্ণ ও স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ নিজে থেকে উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। আমাদের মুনি ঋষিরা ধ্বনি ও শব্দ, উভয়ের মাহাত্য দিয়েছেন। বেদে ধ্বনির মাহাত্য। এইজন্য বেদের সূক্ত বা শ্লোকের উচ্চারণের প্রতি

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই জন্য এঁকে শ্রুতি বিদ্যা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটি একমাত্র গুরুমুখে শুনেই শেখা বা আয়ত্ত্ব করা যায়।

অগ্নি ও বায়ুর মিশ্রনে বর্ণের সৃষ্টি। বর্ন আর কিছুই নয় আলোর বিন্দুর সমষ্টি। পরাবিদ্যাবিদ-গন বলছেন, দেবতারা যখন কথা বলেন, তখন এক আলোর আভা দেখতে পাওয়া যায়। তাই ওম হচ্ছে আদি ধ্বনি, এটি অর্থবহ নয়।অগ্নিতত্ত্ব ও বায়ুতত্ত্বের মিশ্রনে এই প্রণবের উৎপত্তি। যে যার মতো করে আমরা অর্থ দিয়েছি মাত্র।

ফলাফল:
এবারে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের থেকে জেনে নেবো প্রণব জপ্ করলে কি হয়? ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম পাঁচটা অধ্যায় আছে এই প্রণব সম্বন্ধে।

ঈশ্বর নিরাকার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আমাদের মতো সাধারণের পক্ষে তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভবই নয়। সেই জন্য আমাদের পক্ষে সকাম উপাসনা করা ভালো। সকাম উপাসনা করলে আমাদের ধন, স্বাস্থ্য, সুনাম, ক্ষমতা ইত্যাদি, এমনকি স্বর্গলাভও হতে পারে। কিন্তু শাশ্বত শান্তি বা আনন্দ এতে পাওয়া যাবে না। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভই শাশ্বত শান্তির পথ বা মুক্তির পথ। এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উদ্গীথ বা আবৃত্তি বা "ওম" জপ করতে বলা হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে:

ওমউপাসিত-উদগীথম-অক্ষরম-তদ্-ইত্যে-: অর্থাৎ উদ্গীথ শব্দএই অক্ষরকে উপাসনা করবে। "ওম" বাচ্য-

ওমইতি- উদগায়তি : ওম দিয়েই উদ্গীথ গান করা হয়। উদ্গাতার গেয় অংশই) উদ্গীথ।(

বাক্ ও প্রাণ যখন মিলিত হয় তখন উদ্গীথ জন্ম নেয়। এই উদ্গীথ এর বর্ণাত্মক অক্ষরই ওম বা ওঁ। - “ওম” সম্মতিসূচক শব্দ। ওম অর্থাৎ হ্যাঁ। ওম সমস্ত কিছুর উৎস, সূর্যের মত ।

আচার্য্য চাণক্য বলছেন, বেদে "ওম" কে পরব্রহ্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই “ওম” শব্দের সঠিক প্রয়োগে, ও জ্ঞান অর্জনের দ্বারা, স্বর্গলোক এমনকি এই পার্থিব জগতের সমস্ত কিছুই লাভ করা যায়।

প্রণব সম্বন্ধে সন্মন্ধে শব্দের বিরাম দেব। শেষ করার আগে শুধু একটা কথা বলবো:

প্রণব সর্ব্ব শক্তির আধার, তা সে জাগতিক বলুন আর আধ্যাত্মিক বলুন।

মন্ত্র যতক্ষণ না ওঁ যুক্ত হয়, তা সাধারণ অক্ষরমাত্র ।

“মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্র উদাহৃতঃ।” যার মননের দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা সংসারসাগর - হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, দুঃখ কষ্টের হাত হতে মুক্ত হয়ে-পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে তারই নাম মন্ত্র।

মন্ত্র বহু প্রকার; যদিও সকল মন্ত্রের উদ্দেশ্য এক। মন্ত্রের অর্থ ভাল করে বুঝলে আমরা দেখতে পাব যে, তার মধ্যে, বিশেষতঃ তার বীজের মধ্যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও তৎপ্রাপ্তির উপায় নিহিত আছে। সাধারণতঃ মন্ত্রের মধ্যে তিনটি অংশ থাকে প্রণব -, বীজ ও দেবতা। একাক্ষর মন্ত্রগুলির মধ্যেও তিন তত্ত্ব নিহিত। প্রণব সর্ব্বব্যাপী ভগবৎতত্ত্ব প্রকাশ করে-, বীজ ব্যষ্টিরিত করেজীবনের লক্ষ্য নির্দ্ধা-, দেবতা সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায় জানাইয়া দেয়। বটের বীজে যেমন একটা পূর্ণ পরিণত ফলেফুলে সুশোভিত বৃক্-ষে পরিণত হবার শক্তি নিহিত, মন্ত্রের বীজের মধ্যেও সেইরূপ বিশিষ্ট জীবের পূর্ণ পরিণতি লাভের শক্তি নিহিত আছে।

ওঁকারের মধ্যে অতিসুন্দর ভাবে সর্ব্বব্যাপী ভগবৎভাবাপন্ন -তত্ত্ব নিহিত। বীজের মধ্যে ব্যষ্টি-পরমাত্মা-তত্ত্ব-চৈতন্যের সব তত্ত্ব নিহিত। দেবতাত- প্রত্যেকত্ত্বের মধ্যে কিরূপে আমাদের ভিতরকার অন্তরেন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয় ও দেহাদির সব তত্ত্বের মধ্য দিয়া সেই প্রত্যেক চৈতন্য পূর্ণভাবে পরিণতি লাভ করতে পারে-, সেই সব তত্ত্ব নিহিত আছে। ভগবৎচৈতন্য প্রকৃতির সব স্তরের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রকাশ পায়-, লীলা করেতা নিয়ে - দেবতাতত্ত্ব। দেবতা সাক্ষাৎকার করার অর্থচৈতন্যকে -সমষ্টি ভাবে ভগবৎ-সেই সব তত্ত্বগুলির মধ্য দিয়ে ব্যষ্টি-উপলব্ধি করা।-অবাধিত ভাবে ফুটিয়ে বের করা প্রণব হতে বোঝা যাবে আমার ভগবান কি তত্ত্ব, বীজ হইতে জানা যাবে আমার স্বরূপ কি, আমার সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ, ভগবানের কি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দেবতার অর্থের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারব কি উপায়ে আমার সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। প্রথমতঃ মন্ত্রের অর্থ বুঝে নিতে হয়, তারপর মন্ত্রের সাধনার দ্বারা যখন মন্ত্র চেতনহয়(জাগ্রত), তখন ভিতর থেকে সেই তত্ত্বগুলির স্ফুরণ হয়; অর্থের ভিতর দিয়া যাহা বুঝেছিলাম তা প্রত্যক্ষ হয়। সমষ্টি)এর ভিতর দিয়ে ভগবৎ তত্ত্বের "ওঁ" মন্ত্রে সাধকের সিদ্ধাবস্থায় "ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায়" উপলব্ধি হবে(ভাবের, "ক্লীং স্ফুরণ হবে এবং (ব্যষ্টিভাবের) বীজের ভিতর দিয়ে তার ভিতরে ইষ্ট কৃষ্ণতত্ত্বের " কৃষ"ণায়এই দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়ে তার জীবন কৃষ্ণময় হয়ে তার জীবনের ভাব ও কাজ কৃষ্ণ সদৃশ " র সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মন্ত্রের তিনটি অংশের মধ্যে প্রণালীর একটা চুম্বক আকারে-হয়ে পড়বে। প্রত্যেক মন্ত্র সাধন তত্ত্ব-প্রণবের সাহায্যে আমরা ভগবৎ, বীজের সাহায্যে আমাদের ভিতরকার সুপ্ত ভগবৎশক্তি এবং - প্রণালী জানতে পারি।-প্রাপ্তির সাধন-দেবতাতত্ত্বের দ্বারা আমরা আমাদের পূর্ণ বিকাশের ভগবৎ

স্ত্রীলোকদিগের যে প্রণব বাদ দিয়া দীক্ষা দেওয়ার প্রণালী বাঙ্গালা দেশে দেখতে পাওয়া যায়, তাহা অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। স্ত্রীলোকদের দাবিয়ে রাখবার জন্য যাঁরা এই যুক্তি আবিষ্কার করেছেন তাঁরা ভুলে যান যে, মৈত্রেয়ী গার্গী বাচক্নবী বৈদিক ঋষীগণও স্ত্রীদেবতা কালী-জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্ত্রী-, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে মাতৃজাতির পক্ষে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হয়ে ইয়া পড়েছে। মায়ের জাতকে এইভাবে অবমাননা করে ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ওঁকারের ভিতরে আমরা 'অ'কার 'উ'কার ও 'ম'কার এবং অর্দ্ধমাত্রা এই তত্ত্বগুলি দেখতে পাই। ভগবানের একাংশ ব্যক্ত)Emmanent)জগৎরূপে সৃষ্ট পরিণত বা বিবর্ত্তিত; অপরাংশ অব্যক্ত)transcendental)। এটিই অর্দ্ধমাত্রা।

ওঁনিস্ক্রিয় ব্রহ্মের এ সক্রিয় ভাব। এই সক্রিয় ভাব হতেই সৃষ্টির বিকাশ। তাই-ই সৃষ্টির আদি শব্দ। নির্গুণ-, যেকোনো কাজের শুরুতেই "ওঁ তৎ সৎ " উচ্চারণ করুন এবং পূজার সময় প্রথমে "ওঁ" উচ্চারণ করে মন্ত্রপাঠ শুরু করুন।

এখন দেখা যাক 'ইষ্ট' শব্দের মানে কী? 'ইষ্ট' শব্দের তাৎপর্য অনেকগুলি-''সবচেয়ে প্রিয়'', ''ভালবাসার পাত্র'', ''আকর্ষক তত্ত্ব'', ''লক্ষ্য'', ''পরম কামনার ধন'' ''যাত্রা পথের অন্তিম বিন্দু'' ইত্যাদি। 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ-''মননাৎ তারয়েৎ যস্তু সঃ মন্ত্রঃ পরিকীর্তিতঃ''। ''মনন'' মানে আন্তরিক অভিভাবন বা মনে বার বার উচ্চারণ করা। আর ''তারয়েৎ যস্তু'' মানে যা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে ত্রাণ করে।

সাধকের পক্ষে তার ইষ্টমন্ত্রই হচ্ছে প্রণব। কারণ তা তাকে পরমপুরুষের দিকে প্রেষিত করে৷ শুধু তাই নয়। এই ইষ্টমন্ত্র সাধককে পরমপুরুষের নিকটতম সংস্পর্শে আসতে, তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলেমিশে এক হয়ে যেতে সাহায্য করে। সেই জন্যে সাধকের কাছে ওং-কার প্রণব নয়, তার কাছে নিজের ইষ্টমন্ত্রই হচ্ছে প্রণব। কেননা ওঁঙ্কার পরমতত্ত্বের সঙ্গে মনকে একীভূত করতে পারে না। এই কারণে সাধনার ক্ষেত্রে ইষ্টমন্ত্রকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক সাধকের নিজস্ব ইষ্টমন্ত্রই তার কাছে সবচেয়ে অর্থবহ তথা মূল্যবহ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা শব্দনিচয়। সাধকের কাছে নিজের ইষ্টমন্ত্র ছাড়া অন্যের ইষ্টমন্ত্রের কোন মূল্যই নেই।

পুরাণের গল্প অনুযায়ী হনুমান রামের পরম ভক্ত ছিলেন। একবার হনুমানকে অন্যান্য ভক্তেরা বললেন-''হনুমান, তুমি তো জান 'রাম' আর 'নারায়ণে'র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাঁরা দু'জনে তো আসলে একই সত্তা।''

'রাম' শব্দের অর্থ-''রমন্তে যোগীনঃ যস্মিন্''-যোগীর সবচেয়ে প্রিয়, পরম কামনার ধন৷ তিনি কে?-না, পরমপুরুষ৷ 'রাম' মানে পরমপুরুষ৷ আর 'নারায়ণ' মানে কী? 'নার' মানে প্রকৃতি, ভক্তি বা জল৷ তাহলে 'নার শব্দের তিনটি অর্থ-'নার' মানে নীর অর্থাৎ জল সংস্কৃতে জলের পর্যায়বাচক শব্দগুলি হচ্ছে)'নীরম্', 'জলম্', 'পানীয়ম্', 'তোয়ম্', 'উদকম্', 'কম্বলম্')৷

'নার' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ ভক্তি। প্রাচীনকালে 'নারদ' নামে এক মহামুনী ছিলেন।] 'দ' মানে 'বিতরণকারী']। তাঁর কাজ ছিল ভারত, তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘুরে ঘুরে পরমপুরুষের নাম কীর্ত্তন করা-অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তি বিতরণ করা। তাই তিনি 'নারদ' নামে জনপ্রিয় ছিলেন-''নার দেনেবালা'' অর্থাৎ ভক্তি বিতরণকারী।

‘নার’ শব্দের প্রথম অর্থের ক্ষেত্রে তোমরা জান-রেলওয়ে ষ্টেশনে কিছু লোকের দায়িত্ব থাকে যাত্রীকে জল বিতরণ করা৷ তারাও তো সেই অর্থে ‘নারদ’। তাই না? যাই হোক, তাদের বলা হয় ‘পানী পাড়ে’।

‘নার’ শব্দের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে পরমাপ্রকৃতি, মহামায়া, মহালক্ষী-অর্থাৎ পরমপুরুষের সর্জনকারী শক্তি, সগুণাত্মক তত্ত্ব। নারায়ণের ‘অয়ন’ শব্দের অর্থ আশ্রয়৷ কালির জন্যে দোয়াত যেমন আশ্রয়। তেমনি ‘নার’ অর্থাৎ প্রকৃতির আশ্রয় হলেন ‘নারায়ণ’ অর্থাৎ পরমপুরুষ।

তাহলে দেখা গেল দার্শনিক দিক থেকে ‘নারায়ণ’ আর ‘রামে’ কোন তফাৎ নেই। কেননা ‘রাম’ মানেও পরমপুরুষ, নারায়ণ মানেও পরমপুরুষ৷ তাই হনুমানকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে-‘‘হে হনুমান, তুমি বড় ভক্ত। তুমি উচ্চস্তরের সাধক। তাহলে তুমি কেন শুধু রাম নামেরই উচ্চারণ কর। ভুলেও তো নারায়ণের জপ করনা।’’ আসল ব্যাপারটা হ’ল হনুমানের ইষ্টমন্ত্র ছিল রাম। তাই এ সম্পর্কে হনুমানের যে উত্তর ছিল তা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ৷ এটা তোমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত৷ হনুমান বললেন-

‘‘শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদ পরমাত্মনি

তথাপি মম সর্বস্ব শ্রীরাম কমললোচনা৷’’

BANGLADARSHAN.COM

-‘‘আমি জানি শ্রীনাথ)‘শ্রী’ মানে পরমাপ্রকৃতি আর ‘নাথ’ মানে প্রভু ‘শ্রীনাথ’ মানে পরমাপ্রকৃতির প্রভু অর্থাৎ নারায়ণ বা পরমপুরুষও জানকীনাথের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই৷ কেননা জানকীনাথ মানেও রাম (-জানকীর নাথ বা পতি অর্থাৎ রাম অর্থাৎ পরমপুরুষ। তাই এদের মধ্যে সত্যিকারের কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু হে প্রিয় সজ্জনেরা, শুনুন। আমার কাছে একমাত্র অর্থবহ শব্দ হচ্ছে আমার ইষ্টের নাম অর্থাৎ রাম। তাই ‘শ্রীনাথ’, ‘নারায়ণ’ এই শব্দগুলি আমার কাছে মূল্যহীন৷।আমার কাছে এই শব্দগুলির কোন স্বীকৃতিই নেই।’’

গায়ত্রী মন্ত্র:

গায়ত্রী মন্ত্র হল বৈদিক হিন্দুধর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, বেদের অন্যান্য মন্ত্রের মতো গায়ত্রী মন্ত্রও "অপৌরষেয়" (অর্থাৎ, কোনো মানুষের দ্বারা রচিত নয় এবং এক ব্রহ্মর্ষির কাছে (গা)য়ত্রী মন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রপ্রকাশিত। (

এই মন্ত্রটি বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এটি ঋগ্বেদের মণ্ডলের একটি (১০।৬২।৩)সূক্ত। গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে রচিত। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ঋগবেদ] .৩৬২১০., যজুর্বেদ ৩৩৫.,৩০২., সামবেদ উত্তরার্চ্চিক ৬পরমাত্মা-ওঁ :পদচ্ছেদ [১০.৩., ভূঃপ্রাণস্বরুপ-, ভূবঃদুঃখনাশক-, স্বঃসুখস্বরুপ-, তত্সেই-, সবিতুসমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা-, বরেণ্যমবরণযোগ্য সর্বোত্তম-, ভর্গোপাপ নাশক-, দেবস্যসমগ্র ঐশ্বর্য দাতা-, ধীমহিধারণ করি-, ধিয়ঃপ্রজ্ঞাসমূহকে-, য়ঃযিনি-, নঃআমাদের-, প্রচোদয়াত্পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ-সত্য জ্ঞান প্রদান করুক। অনুবাদ-, দুঃখনাশক ও সুখস্বরূপ। সেই জগতসৃষ্টিকারী ও ঐশ্বর্যপ্রদাতা পরমাত্মার বরণযোগ্য পাপবিনাশক তেজকে আমরা ধারণ করি। তিনি - আমাদের বুদ্ধিকে শুভ গুণ, কর্ম ও স্বভাবের দিকে চালনা করুক।

গায়ত্রী মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণঃ (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ (ভূঃপৃথিবী-, ভুবঃসূর্য-,স্বঃ-ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা এই টার্মগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। যখন একটি ফ্যান ৯০০ আরপিএম গতিতে ঘুরে, এটি বাতাসের মধ্য দিয়ে একটি শব্দ উৎপন্ন করে। একইভাবে যখন অসীম গ্রহমণ্ডলী, সৌর সিস্টেম, ছায়াপথ প্রতি সেকেন্ডে ২০,০০০ বার গতিতে ঘুরে, তারা একটি শব্দ উৎপন্ন করে।

ঋষি বিশ্বামিত্র ধ্যানের মাধ্যমে এই শব্দ শুনতে চেষ্টা করেন এবং ঘোষণা করেন যে,এই শব্দ ঐশ্বরিক ওঁ। ঐ প্রজন্মের ঋষিরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই ওঁ এই সৃষ্টিতে সবসময় উৎপাদিত হয় এবং বিদ্যমান থাকে এবং নাকি ঈশ্বরের একটি উপায় তার সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ করার। এমনকি গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরকে ওঁ ইতি একক্ষরম ব্রহ্ম হিসেবে, এটি দ্বারা বুঝায় যে ওঁ ছাড়া ঈশ্বরকে পূজা করার মত আর কোন আকৃতি নেই। যোগী এই শব্দকে "উদগীত নাদ" হিসেবে বলেন যা ধ্যানের সময় সমাধিতে পৌঁছানোর জন্য জপ করা হয়। এটা অন্য সব বৈদিক মন্ত্রের শুরুতে সংযোজন করা হয়।

(তৎ সবিতুর্বরেণ্যং(তৎস্রষ্টা-, সবিতুরসূর্য নামক একটি গ্রহ যা সংস্কৃত অর্থ মতে সূর্যের সমার্থক-, বরেণ্যম- তার সামনে নত হওয়া। এর মানে হল যে, আমরা স্রষ্টার সামনে নত হচ্ছি যার শব্দ ওঁ এবং যাকে অসীম গ্রহমণ্ডলী থেকে আগত আলোর মত দেখায়। (ভর্গো দেবস্য ধীমহি(ভর্গোআলো-, দেবস্যদেবতা-, ধীমহি- তাকে উপাসনা করা । যা অর্থ আ্মাদের আলো রুপে ঈশ্বরের উপাসনা করার প্রয়োজন। ধি)য়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ(ধিয়োজ্ঞান-, য়োকেবা-, নঃআমাদেরকে-, প্রচোদয়াৎ/যথাযথ মাধ্যম-পথে । যার মানে যিনি আমাদের জ্ঞান দান করে থাকেন বা আমাদের জ্ঞান লাভ করতে সঠিক দেখান, সেই ঈশ্বর। এভাবে ঘুরন্ত

অসীম ছায়াপথ থেকে নির্গত শক্তি এই সৃষ্টির সবদিকে ছড়িয়ে আছে বলে তাঁকে প্রণব বলা হয়। এই অনুরূপ K.E. = 1/2 mv2 । বেদের অনেক মন্ত্রের আগে তাই এই শক্তিশালী ওঁ যুক্ত করা হয়েছে এবং বিশ্বের এমনকি অনেক অন্য ধর্মেও এই শব্দ সামান্য পরিবর্তন করে যোগ করেছেন এবং তাদের প্রার্থনায়ও যুক্ত করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

॥শিবতত্ত্ব॥

স্বল্প পরিসরে শিবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা আমার নেই, শিবের সত্য সুন্দর শান্ত মূর্তি এক অনির্বচনীয় পবিত্র ভাব আনে হৃদয়ে।সেই হৃদয়ে বসত করা শিবমূর্তিকে একটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এই লেখাতে। আমি নেহাতই অজ্ঞ, অধম, আমার শিবস্বরূপ গুরু আমায় দিয়ে যেটুকু লেখাচ্ছেন সেটাই তুলে ধরছি।

উপনিষদে শিববন্দনা হয়েছে এই মন্ত্রে:

ঋতং সত্যম পরম ব্রহ্ম পুরুষম কৃষ্ণপিঙ্গলম
উর্দ্ধঃরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ।

–অর্থাৎ সেই শাশ্বত সত্য পরম ব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ পিঙ্গল বর্ণের পুরুষ যিনি ঊর্ধরেত, বিরূপে কুটিল যার আঁখি সেই বিশ্বরূপসদৃশ পুরুষকে প্রণাম জানাই।

ঋতং সত্যম পরম ব্রহ্ম পুরুষম আনন্দস্বরূপং
উর্দ্ধঃরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বেশ্বরায় বৈ নমঃ ।

–অর্থাৎ সেই শাশ্বত সত্য পরম ব্রহ্মরূপী আনন্দ স্বরূপ পুরুষ যিনি ঊর্ধরেত, বিরূপে কুটিল যার আঁখি সেই বিশ্বের ঈশ্বরসদৃশ পুরুষকে প্রণাম জানাই।

সনাতন ধর্মের শাস্ত্রসমূহে শিব পরমসত্ত্বা রূপে ঘোষিত। শিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ তিন কারণের কারণ, পরমেশ্বর-এটা তার প্রণাম মন্ত্রেই বার বার উঠে এসেছে। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, সর্বকারণের কারণ; তিনি স্ব-স্বরূপে বর্তমান, সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি; তিনি তুরীয়, অন্ধকারের অতীত, আদি ও অন্তবিহীন।

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্।
–শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য, বেদসার শিবস্তোত্রম্

এছাড়াও বেদান্ত অনুসারে তিনিই মহা ঈশ্বর অর্থাৎ মহেশ্বর । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে–
“যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।”

অর্থাৎ যখন আলো ছিল না, অন্ধকারও ছিল না; দিন ছিল না, রাত্রিও ছিল না; সৎ ছিল না, অসৎ ও ছিল না- তখন কেবলমাত্র ভগবান শিবই ছিলেন। উল্লেখ্য বেদান্ত বৈদিক সনাতন ধর্মের ভিত্তি তথা বেদের শিরোভাগ; সম্পূর্ণ বেদান্তে শিব ব্যতীত কারো সম্পর্কে এভাবে বলা হয়নি। শুধুমাত্র শিবের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে “শিব এব কেবলঃ।” সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র শিবই বর্তমান ছিলেন। তিনিই লীলাচ্ছলে ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপ ধারণ করে পালন করেন আবার রুদ্ররূপ ধারন করে সংহার করেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর তারই সৃষ্টি-স্থিতি-

লয়ের তিনটি রূপভেদ মাত্র। তাই এই তিন রূপের মধ্যে সত্বার কোন পার্থক্য নেই। তবু সনাতন রূপ পরম শিবরূপই মূলস্বরূপ। তাই ভগবান শিব সৃষ্টির প্রাক্ষালে শ্রীবিষ্ণুকে বলেন–

"অহং ভবানয়ঞ্চৈব রুদ্রোহয়ং যো ভবিষ্যতি।
একং রূপং ন ভেদোহস্তি ভেদে চ বন্ধনং ভবেৎ।।
তথাপীহ মদীয়ং শিবরূপং সনাতনম্।
মূলভূতং সদা প্রোক্তং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্॥"(-জ্ঞানসংহিতা)।

অর্থাৎ আমি, তুমি, এই ব্রহ্মা এবং রুদ্র নামে যিনি উৎপন্ন হবেন, এই সকলই এক। এদের মধ্যে কোনো ভেদ নাই, ভেদ থাকলে বন্ধন হত। তথাপি আমার শিবরূপ সনাতন এবং সকলের মূল স্বরূপ বলে কথিত হয়, যা সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ।

এজন্য ভগবান বিষ্ণু এবং তার বিভিন্ন অবতারগণ সর্বদা শিব উপাসনাই করতেন। তাই শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধ্য ছিলেন পরমেশ্বর শিব। ভগবান শিবের বরেই বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ভগবত্বা। তাই হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভ ত্রিশক্তির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) মধ্যে শিবই প্রধান । তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্যতম শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। এছাড়া শিব স্মার্ত সম্প্রদায়ে পূজিত ঈশ্বরের পাঁচটি প্রধান রূপের (গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা) একটি রূপ। তার বিশেষ রুদ্ররূপ ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতারূপে বন্দিত।

সর্বোচ্চ স্তরে শিবকে সর্বোৎকর্ষ, অপরিবর্তনশীল পরম ব্রহ্ম মনে করা হয়। ব্রহ্ম স্বরূপে পরমাত্মা শিব বিন্দুর ন্যায় অর্থাৎ নিরাকার, এই অবস্থায় শিবকে কল্পনাও করা যায়না, তিনি কালচক্র ও সংসারের সকল গুণ-অগুণ এর উর্দ্ধে। শিবের অনেকগুলি সদাশয় ও ভয়ঙ্কর মূর্তিও আছে। সদাশয় রূপে তিনি একজন সর্বজ্ঞ যোগী। তিনি কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। আবার গৃহস্থ রূপে তিনি পার্বতীর স্বামী। তার দুই পুত্র বর্তমান। এঁরা হলেন গণেশ ও কার্তিক। ভয়ঙ্কর রূপে তাকে প্রায়শই দৈত্যবিনাশী বলে বর্ণনা করা হয়। শিবকে যোগ, ধ্যান ও শিল্পকলার দেবতাও মনে করা হয়। এছাড়াও তিনি চিকিৎসা বিদ্যা ও কৃষিবিদ্যারও আবিষ্কারক।

শিব কী?

সত্য ও সুন্দরই শিব। এই পৃথিবীতে সবাই সত্যকে, সুন্দররূপে মঙ্গলকেই চায়। কেউই অমঙ্গল, অসুন্দর, অশিবকে চায়না। ফলে সকলেই এই শিব পূজার অধিকারী।

শিব লিঙ্গম কি?

"লীনং বা গচ্ছতি, লয়ং বা গচ্ছতি ইতি লিঙ্গম্" যা লয়প্রাপ্ত হয় তাই লিঙ্গ। আবার কারো মতে সর্ববস্তু যে আধারে লয়প্রাপ্ত হয় তাই লিঙ্গম। কিন্তু বৈয়াকরণিকগণের মতে "লিঙ্গতে চিহ্নতে মনেনেতি লিঙ্গম্।" লিঙ্গ শব্দের অর্থ 'প্রতীক' বা 'চিহ্ন।' যার দ্বারা বস্তু চিহ্নিত হয়, সত্য পরিচয় ঘটে তাই-ই লিঙ্গ। অর্থাৎ যার দ্বারা সত্যবিজ্ঞান লাভ হয়, যার সাহায্যে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় তাকেই বস্তু পরিচয়ের চিহ্ন বা লিঙ্গ বলে। আর

এজন্যই দেহ প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থান করে বলেই চিদ্ জ্যোতিকে বলা হয় লিঙ্গ। ভূমা ব্রহ্মের গুহ্য নাম "শিব" এবং ভূমা ব্রহ্মের পরিচায়ক বলে আত্মজ্যোতির উদ্ভাসনের নাম শিবলিঙ্গ।

শিবলিঙ্গের আবির্ভাবঃ

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাম আদিদেবো মহানিশি।
শিবলিঙ্গ তয়োদ্ভুতঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ।।

মাঘ মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দশী তিথির মহানিশিতে কোটি সূর্য সমপ্রভ তেজোময় আদিদেব (জ্যোতির্মূর্তি) লিঙ্গমূর্তিতে আবির্ভূত হন।

শ্রী রামচন্দ্র কর্তৃক শিবের আরাধনাঃ
প্রলয়ের কারণ বলে লোকে মহাদেবকে লিঙ্গ বলে।

এই লিঙ্গ ব্রহ্মের পরম শরীর। আর এ জন্যই ত্রেতাযুগে রাবণ বধে যাত্রার সময় সেতুবন্ধে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বরে শিবের পূজা করেন। আবার পরশুরামও পশুপতি শিবের তপস্যা করেই পশুপাত অস্ত্র লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক লিঙ্গপূজাঃ

দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রী জাম্ববতীসহ উপমন্যু মুনির আশ্রমে গমন করেন এবং তথায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণান্তে অমিত মহাদেবের লিঙ্গমূর্তিতে পূজা করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে গিয়ে ভুতিভূষণ শিবের পূজা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শিবের আরাধনার কারণঃ

"মহাদেব আত্মারই মূল। ইহা জানাবার জন্যই আমি তাঁহার পূজা করছি। বেদতত্ত্বজ্ঞ পন্ডিতগণ আমাকেই শিবলিঙ্গ বলে থাকেন। অতএব আমি স্বয়ং আপনাতে আপনি মহাদেবের পূজা করছি। আমি শিবময়, ফলে আমাদের মধ্যে রূপ ভিন্ন হলেও কোন প্রভেদ নেই। সংসার-ভীরু সাধারণ লোক লিঙ্গমূর্তিতে দেবাদিদেব মহেশ্বরের ধ্যান ও পূজা বন্দনা করবে।"

শিবতত্ত্বঃ

জ্ঞানের রাজ্য পার হয়েই জানা যায় শিবকে। জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতী পূজার পরই আসে শিবরাত্রি। এরও একটি গভীর তাৎপর্য আছে। দেবী সরস্বতী হংসরূঢ়া। হংসটি কিন্তু সাধারণ হংস নয়। মানুষের কূটস্থে যে দ্বিদলপদ্ম আছে, এতে "হং" এবং "সঃ" দুইটি বীজ। এই দুইটি বীজে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানক্ষেত্র খুলে যায়। আবার জ্ঞানক্ষেত্রে চতুর্বেদ রাগিনী সরস্বতী উপবিষ্ট। তাই ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে সুসংযত করে কুটস্থে রাখতে পারলে সরস্বতীর কৃপা লাভ সম্ভব।

জ্ঞানক্ষেত্র পার হলে পৌঁছা যায় ব্যোমক্ষেত্রে আমাদের কূটস্থের পর দহরাকাশ, চিদাকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ ও আত্মাকাশ। এই পঞ্চ আকাশেই ব্যোমক্ষেত্র বা শিবক্ষেত্র। এ জন্যই শিবের অপর নাম পঞ্চানন। মানুষ সাধন

ক্রিয়া দ্বারা এই ব্যোমক্ষেত্রে পৌছালে শিব শীঘ্র তুষ্ট হন। এ জন্য শিবের আর এক নাম আশুতোষ। এছাড়াও শিব আরও যে যে রূপে মূর্ত হন তা নিম্নরূপ:

০১। চন্দ্রনাথদেবেরই আর এক নাম শিব। শিব অর্থ মঙ্গল বা শুভ। পুনর্জন্ম নিরোধ করে অর্থাৎ মোক্ষ দান করে তিনি জীবের মঙ্গলই করেন। তিনি আবার পঞ্চানন নামেও খ্যাত। পঞ্চ আনন (মুখ) যাঁর তিনিই পঞ্চানন। পঞ্চমুখ দেবতাই শিব।
০২। 'ওঁ'-তত্ত্বের ত্রিদেবতা-ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। পঞ্চানন শিবই এই মহেশ্বর। মহেশ্বরী শক্তির অধিকারী তিনি। মহাপ্রলয়ের নটরাজ তিনি। তিনি ঈশান নামেও খ্যাত। ঈশান-ই বিষাণে অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে তিনি মহাপ্রলয় ঘোষণা করবেন।

০৩। মহাশক্তির দেবতা মহেশ্বর। সকল দেবতা ঐক্যশক্তি দিয়ে যা করতে পারেননা, মহেশ্বর একাকী তা সম্পন্ন করতে সমর্থ। দেবতার মাঝে বিচিত্র অদ্ভূতকর্মা দেবতা তিনি।

০৪। মৃত্যুকে জয় করেছেন বলে তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাইতো তিনি অকাতরে সমুদ্র মন্থনের হলাহল অর্থাৎ বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছেন। বিষের ক্রিয়ায় তার কণ্ঠদেশ হয়েছে নীল। সে কারণে তার নাম নীলকণ্ঠ।

০৫। বাঘের চামড়াকে বলে কৃত্তি। কৃত্তি পরিধান করে নাম ধরেছেন কৃত্তিবাস।

০৬। বিচিত্রকর্মা মহেশ্বর। অর্থাৎ তার সকল কর্মই অদ্ভূত ও বৈচিত্র্যময়। গঙ্গার ধারা ধারণকালে ত্রিশূল হাতে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে থমকে দাঁড়িয়েছেন এবং মস্তকের জটাজুটকে উত্থিত করে দিয়েছেন ব্যোমে অর্থাৎ আকাশের দিকে এবং নাম ধরেছেন ব্যোম্‌কেশ। তার সেই উত্থিত জটাজুটের মাধ্যমে গঙ্গার ধারা পৃথিবীতে নেমে আসে। তবেই না মর্ত্যের মানুষ গঙ্গার পূত-পবিত্র সলিলে অবগাহন করে নিষ্পাপ হচ্ছে এবং মরণের পরে স্বর্গবাসী হচ্ছে।

০৭। 'ধূর' শব্দের অর্থ জটাভার বা ত্রিলোকের চিন্তাভার। মহাদেব চন্দ্রনাথই শিরে জটাভার ধারণ করেন অথবা ত্রিলোকের চিন্তাভার ধারণ ও বহন করেন। এসকল ভার বহন ও ধারণের কারণে তারই নাম ধূর্জটি।

০৮। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে-'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন'। এখানে 'গুণ নাই'-এর অর্থ সত্ত্বঃ, রজ ও তম গুণের অতীত। মহাদেব ত্রিগুণাতীত। তিনটি নেত্র বা লোচন তার। একারণে দেব ত্রিলোচনও বলা হয় তাকে। তার ললাটের তৃতীয় নয়ন দিয়ে সর্বদাই ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলতে থাকে। 'কপালে আগুন' বলতে অন্নপূর্ণা দেবী ইঙ্গিতে মহাদেবের ললাট নেত্রের কথাই বলেছেন। আগুন আলোর প্রতীক। অন্ধকার দূর করতে আলোরই প্রয়োজন। তার ত্রিনেত্রের অগ্নি জ্ঞানরূপে আলো জ্বালানোর প্রতীক। অর্থাৎ মানুষকে জ্ঞান-চর্চা করতে হবে।

০৯। ত্রিগুণাতীত বলে শিব সর্বদাই নির্বিকার নির্বিকল্প। তাই শবরূপে তিনি শ্রীকালী মাতার চরণতলে শায়িত। শবরূপে শিব মানুষকেও বিকার রহিত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ শবেরইতো কোন বিকার নেই। তার ত্রিশূলও ত্রিগুণের প্রতীক। তিনি নিজে ত্রিগুণাতীত হয়ে মানুষকেও তার হস্তধৃত ত্রিশূল দেখিয়ে ত্রিগুণাতীত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

১০। শিব 'হর' এবং 'শম্ভু' নামেও খ্যাত। তিনি জীবের চিত্তকে, তাদের পাপকে হরণ করেন এবং কালপূর্ণ হলে জীবের জীবনকেও হরণ করেন। এসকল হরণ করার কারণে তার নাম 'হর'। আবার তিনিই জীবের যম-ভয় অর্থাৎ শঙ্কা হরণ করে তাদের কল্যাণ সাধন করেন। তার নাম গ্রহণ করলেই আর কোন শঙ্কাই থাকে না। এ কারণে শংকর তার নাম। আবার 'শম্' শব্দের অর্থও কল্যাণ। যেহেতু তিনি কল্যাণ দান করেন, সেহেতু 'শম্ভু' নামেও তিনি বিশ্বখ্যাত।

১১। ত্রিপুর নামক অসুরের অত্যাচারে ত্রিপুরাবাসী অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসী দেবতা, মানব এবং যক্ষকুল অতীষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তখন শিব শরাসন থেকে শর নিক্ষেপ করে ত্রিপুরাসুরকে নিধন করেন। আর এই ত্রিপুরাসুরকে নাশ করে নাম ধরেছেন দেব ত্রিপুরারি।

১২। শিব অল্পেই বা শীঘ্রই সন্তুষ্ট হন। এ কারণে তাঁর এক নাম আশুতোষ।

১৩। শিব দেবগণ কতৃক বন্দিত, তাই তাঁর নাম মহাদেব।

১৪। শিব সকল জীবের প্রভু, তাই তিনি ঈশান।

১৫। শিবের জন্মদাতা বা জন্মদাত্রী কেউ নেই, তাই তিনি স্বয়ম্ভু।

১৬। পশু ও জীবের কর্মবন্ধন মোচন করেন বলে তিনি পশুপতি।

১৭। প্রতিকল্পে আপন লীলা মহিমায় তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস সাধন করেন, তাই তিনি মহাকাল। সত্যই জগতের প্রতিটি বস্তুকণায় শিবের অস্তিত্ব বর্তমান। "যত্র জীব-তত্র শিব"-পরমপুরূষ শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এ সত্যই উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিৎ জীব সেবার মাধ্যমে শিব সেবায় ব্রতী হওয়া। সেই পরমেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম–

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

প্রশ্ন : শিব লিঙ্গ কি? সর্বত্র মূর্তিতেই দেবতাদের পুজো করা হয় (লিঙ্গে নয়), কিন্তু শিবের পুজো লিঙ্গেতে এবং মূর্তিতে কেন করা হয়?

উত্তর: আক্ষরিক বিশ্লেষণে দেখা যায়–'শিব' শব্দের অর্থ 'মঙ্গল' আর 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ প্রতীক বা চিহ্ন। শাস্ত্র 'শিব' বলতে নিরাকার সর্বব্যাপি পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মকে বোঝায়। তাই 'শিবলিঙ্গ' হচ্ছে মঙ্গলময় পরমাত্মার প্রতীক।

[*শিবপুরাণ ও অন্যান্য সকল শাস্ত্রেই 'শিবলিঙ্গ' বলতে 'পরমব্রহ্মের প্রতীক'-ই বোঝানো হয়েছে।] শিবপুরাণ অনুসারে ভগবান শিবই একমাত্র ব্রহ্মরূপ হওয়ায় তাঁকে 'নিষ্কল' (নিরাকার) বলা হয়। যেহেতু তিনি 'সর্বশক্তিমান' তাই তিনি জগতকল্যাণের জন্য রূপধারণও করতে পারেন। রূপবান হওয়ায় তাঁকে 'সকল' বলা হয়। তাই তিনি 'সকল' এবং 'নিষ্কল'-দুইই। শিব নিষ্কল-নিরাকার হওয়ায় তাঁর পূজার আধারভূত লিঙ্গও

নিরাকার অর্থাৎ লিবলিঙ্গ শিবের নিরাকার স্বরূপের প্রতীক। তেমনই শিব সকল বা সাকার হওয়ায় তাঁর পূজার আধারভূত বিগ্রহ সাকাররূপ।

'সকল' (সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ সাকার) এবং 'অকল' (হস্তপদমুখচক্ষু ইত্যাদি অঙ্গ-আকার থেকে সর্বতোভাবে রহিত নিরাকার) রূপ হওয়াতেই শিব 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা কথিত পরমাত্মা। এইজন্যই সকলে লিঙ্গ (নিরাকার স্বরূপ) এবং মূর্তি (সাকার স্বরূপ)-দুয়েতেই পরমেশ্বর শিবের পূজা করে থাকেন। শিব ব্যতীত অন্য যেসকল দেবতা আছেন, তাঁরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম নন, তাই কোথাও তাঁদের নিরাকার লিঙ্গ দেখা যায় না। লিঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের প্রতীক।
আসলে হাজার বছরের বিদেশি শাসনে পরাধীন থাকায় বিদেশী শাসকগন সনাতন ধর্মকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছে। শুধু উপাসনালয় ভেঙ্গেই ক্ষান্ত থাকেনি, নানা কুৎসা রটাতেও পিছপা হয়নি। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় মুসলিম শাসকরা মন্দির ধ্বংসে মনযোগী ছিল আর ইংরেজরা মন্দির ভাঙ্গেনি ঠিক তবে বুদ্ধিমান পাদ্রীরা আমাদের ধর্মকে আঘাত করেছে অন্যভাবে। ১৮১৫ সালে আ ভিউ অফ দ্য হিস্ট্রি, লিটারেচার, অ্যান্ড মিথোলজি অফ দ্য হিন্দুজ গ্রন্থে লেখক ব্রিটিশ মিশনারি উইলিয়াম ওয়ার্ড হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে লিঙ্গপূজারও নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে লিঙ্গপূজা ছিল, "মানুষের চারিত্রিক অবনতির সর্বনিম্ন পর্যায়।" শিবলিঙ্গের প্রতীকবাদটি তাঁর কাছে ছিল "অত্যন্ত অশালীন; সে সাধারণের রুচির সঙ্গে মেলানোর জন্য এর যতই পরিমার্জনা করা হোক না কেন।" ব্রায়ান পেনিংটনের মতে, ওয়ার্ডের বইখানা "ব্রিটিশদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণা ও উপমহাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল।" ব্রিটিশরা মনে করত, শিবলিঙ্গ পুরুষ যৌনাঙ্গে আদলে নির্মিত এবং শিবলিঙ্গের পূজা ভক্তদের মধ্যে কামুকতা বৃদ্ধি করে প্রতীক।" ডেভিড জেমস স্মিথ প্রমুখ গবেষকেরা মনে করেন, শিবলিঙ্গ চিরকালই পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গটি বহন করছে। জেনেন ফলারের মতে, লিঙ্গ "পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গে নির্মিত এবং এটি মহাবিশ্ব-রূপী এক প্রবল শক্তি। আবার ইউরোপের সব বুদ্ধিজীবী হিন্দু বিদ্বেষী ছিল এটা বলা অন্যায় হবে। কারন অনেকেই শিব লিঙ্গ সম্পর্কে উপরোক্ত মতবাদকে গ্রহণ না করে সত্য অনুসন্ধান করেছেন। যেমন ১৮২৫ সালে হোরাস হেম্যান উইলসন দক্ষিণ ভারতের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি বই লিখে এই ধারণা খণ্ডানোর চেষ্টা করেছিলেন। নৃতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার জন ফুলারের মতে, হিন্দু দেবতাদের মূর্তি সাধারণত মানুষ বা পশুর অনুষঙ্গে নির্মিত হয়। সেক্ষেত্রে প্রতীকরূপী শিবলিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম। কেউ কেউ মনে করেন, লিঙ্গপূজা ভারতীয় আদিবাসী ধর্মগুলি থেকে হিন্দুধর্মে গৃহীত হয়েছে।

এবার আমরা জানব শিবলিঙ্গ আসলে কিঃ

শিবলিঙ্গ বা লিঙ্গম্ দেবতা শিবের একটি প্রতীক।আমি যদি এক কথায় বলি তাহলে,শিব শব্দের শাব্দিক অর্থ মঙ্গল; আর লিঙ্গ মানে চিহ্ন। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ মানে মঙ্গলময় চিহ্ন। হিন্দু মন্দিরগুলিতে সাধারণত শিবলিঙ্গে শিবপূজা করা হয়ে থাকে।একটি সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী, শিবলিঙ্গ শিবের আদি-অন্তহীন সত্ত্বার প্রতীক এক আদি ও অন্তহীন স্তম্ভের রূপবিশেষ।

শিব এক অনাদি অনন্ত লিঙ্গস্তম্ভের রূপে আবির্ভূত, বিষ্ণু বরাহ বেশে স্তম্ভের নিম্নতল ও ব্রহ্মা উর্ধ্বতল সন্ধানে রত। এই অনাদি অনন্ত স্তম্ভটি শিবের অনাদি অনন্ত সত্ত্বার প্রতীক মনে করা হয়।

শিবলিঙ্গ একটি গোল কিম্বা উপবৃত্তাকার যা কোন বৃত্তাকার ভূমি (base) কে কেন্দ্র করে স্থাপিত । এই গোল ভূমি কে আদি পরশক্তি বা চূড়ান্ত শক্তি। আর সেই গোল কিম্বা বৃত্তাকার অংশ দ্বারা অসীম কে বোঝান হয় যার কোন আদি অন্ত নেই অর্থাৎ যা সর্ববিরাজমান । সর্ববিরাজমান অর্থ হল যা সব জায়গায় অবস্থিত ।

শিবলিঙ্গ ধরনাটি সাধারণত infinity বোঝাতে কিম্বা জীবনের continuation বোঝাতে অবতারণা করা হয়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় অথর্ববেদে একটি স্তম্ভের স্তব করা হয়েছে। এটিই সম্ভবত শিব লিঙ্গ পূজার উৎস। কারোর কারোর মতে যূপস্তম্ভ বা হাঁড়িকাঠের সঙ্গে শিবলিঙ্গের যোগ রয়েছে। উক্ত স্তবটিকে আদি-অন্তহীন এক স্তম্ভ বা স্কম্ভ-এর কথা বলা হয়েছে; এই স্কম্ভ চিরন্তন ব্রহ্মের স্থলে স্থাপিত। যজ্ঞের আগুন, ধোঁয়া, ছাই, সোমরস ও যজ্ঞের কাঠ বহন করার ষাঁড় ইত্যাদির সঙ্গে শিবের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির যোগ লক্ষিত হয়। মনে করা হয়, কালক্রমে যূপস্তম্ভ শিবলিঙ্গের রূপ নিয়েছিল। লিঙ্গপুরাণে এই স্তোত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি কাহিনির অবতারণা করা হয়। এই কাহিনিতে উক্ত স্তম্ভটিকে শুধু মহানই বলা হয়নি বরং মহাদেব শিবের সর্বোচ্চ সত্ত্বা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারত ও কম্বোডিয়ায় প্রচলিত প্রধান শৈব সম্প্রদায় ও অনুশাসন গ্রন্থ শৈবসিদ্ধান্ত মতে, উক্ত শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা পঞ্চানন (পাঁচ মাথা-বিশিষ্ট) ও দশভূজ (দশ হাত-বিশিষ্ট) সদাশিব প্রতিষ্ঠা ও পূজার আদর্শ উপাদান হল শিবলিঙ্গ।

মনিয়ার উইলিয়ামস তাঁর ব্রাহ্মণইজম্ অ্যান্ড হিন্দুইজম্ বইয়ে লিখেছেন, "লিঙ্গ" প্রতীকটি "শৈবদের মনে কোনো অশালীন ধারণা বা যৌন প্রণয়াকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয় না। অন্যদিকে এন. রামচন্দ্র ভট্ট প্রমুখ গবেষকেরা মনে করেন, পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা। এম. কে. ভি. নারায়ণ শিবলিঙ্গকে শিবের মানবসদৃশ মূর্তিগুলি থেকে পৃথক করেছেন। তিনি বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার অনুপস্থিতির কথা বলেছেন এবং এর যৌনাঙ্গের অনুষঙ্গটিকে তান্ত্রিকসূত্র থেকে আগত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১৯০০ সালে প্যারিস ধর্মীয় ইতিহাস কংগ্রেসে ভারত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, শিবলিঙ্গ ধারণাটি এসেছে বৈদিক যূপস্তম্ভ বা স্কম্ভ ধারণা থেকে। ১৯০০ সালে প্যরিসে হয়ে যাওয়া ধর্মসমূহের ঐতিহাসিক মূল শীর্ষক সম্মেলনে বিশ্ববাসীর সামনে অথর্ববেদের স্কম্ভসুক্তের সাহায্যে তুলে ধরেন যে শিবলিঙ্গ মূলত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ই প্রতীক। যূপস্তম্ভ বা স্কম্ভ হল বলিদানের হাঁড়িকাঠ। এটিকে অনন্ত ব্রহ্মের একটি প্রতীক মনে করা হত। জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ গুস্তাভ ওপার্ট শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর গবেষণাপত্রে এগুলিকে পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গে সৃষ্ট প্রতীক বলে উল্লেখ করে তা পাঠ করলে, তারই প্রতিক্রিয়ায় বিবেকানন্দ এই কথা বলেছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শালগ্রাম শিলাকে পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গ বলাটা এক কাল্পনিক আবিষ্কার মাত্র। তিনি আরও বলেছিলেন, শিবলিঙ্গর সঙ্গে পুরুষাঙ্গের যোগ বৌদ্ধধর্মের পতনের পর আগত ভারতের অন্ধকার যুগে কিছু অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মস্তিস্কপ্রসূত গল্প।

স্বামী শিবানন্দও শিবলিঙ্গকে যৌনাঙ্গের প্রতীক বলে স্বীকার করেননি। স্বামী শিবানন্দ বলেন,"এটি শুধু ভূল ই নয় বরং অন্ধ অভিযোগ ও বটে যে শিবলিঙ্গ পুরুষলিঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী।" তিনি লিঙ্গপুরানের নিম্নলিখিত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন–
"প্রধানাম প্রকৃতির যদাধুর লিঙ্গমুত্তমম গান্ধবর্নরসাহ্নম শব্দ স্পর্শাদি বর্জিতম।"

অর্থাত্ লিঙ্গ হল প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশক যা স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধহীন।

১৮৪০ সালে এইচ. এইচ. উইলসন একই কথা বলেছিলেন। ঔপন্যাসিক ক্রিস্টোফার ইসারউড লিঙ্গকে যৌন প্রতীক মানতে চাননি। ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়ায় "Lingam" ভুক্তিতেও শিবলিঙ্গকে যৌন প্রতীক বলা হয়নি।

মার্কিন ধর্মীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ওয়েনডি ডনিগার তাঁর দ্য হিন্দুজ: অ্যান অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি বইতে লিখেছেন, কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে শিবলিঙ্গকে ঈশ্বরের বিমূর্ত প্রতীক বা দিব্য আলোকস্তম্ভ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব বইতে লিঙ্গের কোনো যৌন অনুষঙ্গ নেই।
হেলেন ব্রুনারের মতে, লিঙ্গের সামনে যে রেখাটি আঁকা হয়, তা পুরুষাঙ্গের গ্ল্যান্স অংশের একটি শৈল্পিক অনুকল্প। এই রেখাটি আঁকার পদ্ধতি মধ্যযুগে লেখা মন্দির প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত অনুশাসন এবং আধুনিক ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠাপদ্ধতির কিছু কিছু প্রথার সঙ্গে যৌন মিলনের অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। যদিও গবেষক এস. এন. বালগঙ্গাধর লিঙ্গের যৌন অর্থটি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

লিঙ্গাষ্টকম

BANG

ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিঙ্গম
নির্মলভাসিত শোভিত লিঙ্গম।
জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গম
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম ॥১॥
দেবমুনি প্রবরার্চিত লিঙ্গম
কামদহন করুণাকর লিঙ্গম।
রাবণ দর্প বিনাশন লিঙ্গম
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥২॥
সর্ব সুগংধ সুলেপিত লিঙ্গম
বুদ্ধি বিবর্ধন কারণ লিঙ্গম।
সিদ্ধ সুরাসুর বংদিত লিঙ্গম
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম॥৩॥
কনক মহামণি ভূষিত লিঙ্গম
ফণিপতি বেষ্টিত শোভিত লিঙ্গম।
দক্ষসুযজ্ঞ বিনাশন লিঙ্গং
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্॥৪॥
কুংকুম চংদন লেপিত লিঙ্গম
পংকজ হার সুশোভিত লিঙ্গম।
সংচিত পাপ বিনাশন লিঙ্গং
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্॥৫॥
দেবগণার্চিত সেবিত লিঙ্গং

ভাবৈ-র্ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম।
দিনকর কোটি প্রভাকর লিঙ্গং
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্॥ 6 ॥
অষ্টদোপরিবেষ্টিত লিঙ্গং
সর্বসমুদ্ভব কারণ লিঙ্গম্।
অষ্টদরিদ্র বিনাশন লিঙ্গং
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্॥৭॥
সুরগুরু সুরবর পূজিত লিঙ্গং
সুরবন পুষ্প সদার্চিত লিঙ্গম্।
পরাৎপরং (পরমপদং) পরমাত্মক লিঙ্গং
তৎপ্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্॥৮॥
লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেশ্শিব সন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥

রামেশ্বরম

******

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শৈব তীর্থক্ষেত্রের মানে রামেশ্বরম। এই শিব লিঙ্গ শ্রীরামনাথস্বামী হিসাবে পরিচিত। এটা তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত। ভারতের মহাপবিত্র বিখ্যাত চারধাম যথাক্রমে-উত্তরে বদ্রীনাথ, পূর্বে পুরীর শ্রীজগন্নাথ, পশ্চিমে দ্বারকা ও দক্ষিণে রামেশ্বরম। এছাড়াও এই তীর্থ দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। বলা হয় বারাণসীর অর্থাৎ কাশীর বিশ্বনাথজির দর্শনে ও পূজায় যে পূণ্য লাভ হয় শ্রীরামেশ্বরের দর্শন ও পূজায় সমপরিমাণ পূণ্য লাভ হয়। কাশীযাত্রার পূর্ণতা লাভ হয় তখনই যখন রামেশ্বর যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। এ এক এমন জাগ্রত তীর্থ যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া কারণ এই লিঙ্গ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত। যার জন্যে এই তীর্থ রামভক্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সবার কাছে পরম পবিত্র। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে বিশাল উৎসব হয়। তখন শিবপূজো এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল শ্রীরামনাথস্বামী ও মাতা পার্বতীর রথপরিক্রমা। এখানেই আছে ইতিহাস বিখ্যাত শ্রীরামের বানর সেনাদের দ্বারা তৈরি বিখ্যাত সেতু যাতে করে তিনি লঙ্কায় গিয়েছিলেন সীতাকে উদ্ধারে। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকানণ্ডে বর্ণিত আছে মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে পিতা বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপুনতার সহিত সমুদ্রের পরপার পর্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে ওই সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই বর্ণনা আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে NASA র স্যাটেলাইটে তোলা ছবিতে প্রমানিত হয়েছে। ১৯৮০ সালের আগে কিছুদূর এতে হাটাও যেত কিন্তু ১৯৮০ সালের সামুদ্রিক ঝড়ে এটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়। স্যাটেলাইটের থেকে পাওয়া তথ্যনুযায়ী ভারতের মহাকাশ গবেষনা কেন্দ্রের (ISRO) মেরিন অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস গ্রুপ অফ স্পেস অ্যাপলিকেশন সেন্টার (SAC) অনুসন্ধান অনুসারে ১০৩ টি শীলা প্রাচীর জলের তলে লক্ষ করা যায়।

যাই হোক বিভিন্ন পুরানে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। সব জায়গায় এটা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হলেও কাহিনীর কিছু বিভেদ আছে। রামায়ণ, শিবপুরান, পদ্মপুরান অনুসারে দুটি কাহিনী আমরা পাই যথাক্রমে–

১। লঙ্কা পাড়ি দেয়ার জন্যে শ্রীরাম যখন সেতু নির্মান করতে চাইলেন তখন এই বিশাল কার্য সঠিক ভাবে সম্পাদনের জন্যে তিনি বালুকা দ্বারা একটি শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজো করে মহাদেব কে প্রসন্ন করেন। তিনি লঙ্কা থেকে সীতা কে নিয়ে ফিরবার সময় তাকেও সেটা দেখান।

২। অন্যমতে মহর্ষি পুলস্তের বংশধর রাবণ তাই তাকে হত্যা করে শ্রীরাম ব্রহ্ম হত্যার পাপ করেছেন। তাই লঙ্কা ত্যাগ করে সীতা রাম যখন রামেশ্বর দ্বীপে আসলে তখন ঋষি অগস্ত্য তাকে শিব পূজোর বিধান দেন। শ্রীরাম হনুমানকে কৈলাশে পাঠান শিবলিঙ্গ আনতে। কিন্তু তার দেরী দেখে সীতা বালির শিবলিঙ্গ তৈরি করেন এবং সেই লিঙ্গেই পূজা শুরু করে দেন রামচন্দ্র। ইতিমধ্যে হনুমান শিবলিঙ্গ নিয়ে আসেন। তার মন খারাপ হল কারণ তার আনিত বিগ্রহে পূজো হল না। তখন প্রভু শ্রীরাম ভক্তের ইচ্ছ বুঝতে পেরে সেই বিগ্রহে আবার পুজো করেন। তার পর পুজো শেষে মাতা সীতা সেই বিগ্রহ সরাতে বললে সেটা সরানো গেল না। পরে সীতা যে লিঙ্গটি গড়েছিলেন সেটার নাম হল রামলিঙ্গম আর তার ভক্ত হনুমান আনিত বিগ্রহের নাম হল বিশ্বলিঙ্গম। এবং এই নিয়ম করেন আগে বিশ্বলিঙ্গমের পুজো পরে রামলিঙ্গম। এটা মন্দিরে আজও অনুসৃত হয়ে থাকে। এই হনুমান আনিত বিশ্বলিঙ্গম বিগ্রহ আজ এই মন্দিরে বিশ্বনথ নামে পরিচিত। এই মন্দিরের প্রধান দেবতা রামনাথস্বামী হলেও ভক্ত হনুমানের সন্তুষ্টির জন্যে এই লিঙ্গ প্রথম পূজিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই তীর্থকে খুব ভালবাসতেন। তিনি দুবার এসেছিলেন এখানে প্রথমবার ১৮৯২ সালে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সময়। দ্বিতীয়বার ১৮৯৭ সালের ২৭ জানুয়ারী শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভায় হিন্দু ধর্মের বিজয় পতাকা উড়িয়ে এসে এই মন্দিরে তখন তাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এখানকার সেতুপতি রাজারা ছিল স্বামীজির ভক্ত। তাছাড়া তার খ্যাতি তখন আসমুদ্রহিমাচল। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজীতে ভাষণ দেন যেটা পুরোটা পাথরে খোদাই করে শ্রীরামনাস্বামী মন্দিরের মূল প্রবেশ পথের দুই দিকের দেয়ালে স্থাপন করা। এই মন্দিরের ভিজিটার্স বুকে মন্দিরের পূজারী ও কর্মীদের সম্পর্কে লেখা তার মূল্যবান মন্তব্যটিও একটি পাথরে খোদাই করে টানানো আছে। সেখানে তিনি লিখেন নিজ হাতে-I have great pleasure in testifying to the politeness and ready service of the priests and supervisors of this temple. যাই হোক এই মন্দিরে নানা দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সারা বছর তাদের পূজো হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে মহাশিরাত্রী অন্যতম। এছাড়া প্রায় সকল উৎসবই হয়। এই মন্দির বহিঃআক্রমনের স্বীকার তেমন হয় নি তাই এর ঐতিহ্য সবসময় সমুন্নত থেকেছে। এই মন্দিরের কয়েক লক্ষ একর জমি রয়েছে।বাৎসরিক ব্যায় প্রায় ৭ কোটি টাকা। মন্দিরে বিশাল রত্ন ভান্ডার রয়েছে যা কালে কালে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রতিদিন ৩০০ দুস্থ মানুষকে এখানে ভোজন করানো হয়।

শিব পুরাণ অনুসারে ভগবান শিব সর্বত্র বিরাজমান হলেও ১২টি স্থানে তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে বিরাজমান। নিম্নে সে সকল স্থানের বর্ণনা দেয়া হল–

১. সোমনাথঃ বিশ্ব বিখ্যাত মন্দির এটি। এই মন্দির যেমন পবিত্র তেমনি ছিল ঐশ্বর্যশালী। অনেক বার এটা লুণ্ঠনকারিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু বারবার বাবা সোমনাথের কৃপায় নতুন করে সে সব তৈরি হয়েছে। ভারতের গুজরাটের কাঠিয়াবাড়িক্ষেত্রে সমুদ্রের কিনারায় এই মন্দির অবস্থিত। এটি প্রাচীনকালে প্রভাসক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নরলীলা সংবরণ করেন। মন্দিরের অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম সোমনাথ।

২. মল্লিকার্জুনঃ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীশৈল পর্বতের উপর এই জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির অবস্থিত। এই পর্বত দক্ষিণের কৈলাশ নামেও পরিচিত। মন্দিরের অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম মল্লিকার্জুন। পৌরাণিক তথ্য থেকে জানা যায় প্রথম মল্লিকা ফুল দিয়ে পুজো হয়েছিল তাই এর নাম মল্লিকার্জুন।

৩. মহাকালেশ্বরঃ এটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। ভারতের মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী নগরীতে এই শিবলিঙ্গ অবস্থিত। এখানে রয়েছে পূণ্যসলিলা শিপ্রা নদী।

৪. শ্রীওঙ্কারেশ্বর/অমলেশ্বরঃ এই জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতের মধ্যপ্রদেশে মহাপবিত্র নদী নর্মদার তীরে অবস্থিত। এই নদী দুই ধারায় বিভক্ত হওয়ায় মধ্যেখানে একটি ঢিপির সৃষ্টি হয়েছে।এই ঢিপিকেই মান্ধাতা পর্বত বা শিবপুরী বলা হয়। পুরাকালে এই পর্বতে কিংবদন্তি মহারাজা মান্ধাতা তপস্যা করে ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করেন। তার নাম অনুসারে এই পর্বতের নাম। এই মন্দিরে সারক্ষণ অন্ধকার থাকে তাই সবসময় আলো জ্বালানোর দরকার হয়। এটা প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট শিবলিঙ্গ। এই শিব লিঙ্গের দুই রূপ। এক ওঙ্কারেশ্বর, দুই অমলেশ্বর। অমলেশ্বর ওঙ্কারেশ্বর থেকে কিছুটা দূরে নর্মদার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। দুই শিব লিঙ্গকে এক হিসাবে গণনা করা হয়।

৫. কেদারনাথঃ কেদারনাথ এক জগৎ বিখ্যাত তীর্থ। এটা হিমালয়ের কেদার শৃঙ্গে অবস্থিত। এর পশ্চিমপাশে রয়েছে পবিত্র মন্দাকিনী নদী। কেদার শৃঙ্গের পূর্বদিকে অলকনন্দা নদীর তীর রয়েছে আরেক বিখ্যাত তীর্থ বদ্রীনাথ ধাম।

৬. ভীমেশ্বরঃ আসামের গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুর পাহাড়ে এই জ্যোর্তিলিঙ্গ অবস্থিত। রাবণের ছোট ভাই কুম্ভকর্ণের পুত্র ছিল ভীম, সে কামরূপে থাকত। তিনি তার পিতার হত্যার প্রতিশোধের জন্যে তপস্যা করে দিগ্বিবিজয়ের বর নিলেন। সব সময় শ্রীহরির বিরুদ্ধে চিন্তা তার। এসময় কামরূপের পরম শিবভক্ত রাজা সুদক্ষিণকে সে আক্রমণ করে। তাকে বন্দি করে। এদিকে দেবতাদের শিব কথা দিয়েছেন এই অত্যাচারীকে বধ করবেন। অন্যদিকে শিবভক্ত রাজা সুদক্ষিণ বন্দি অবস্থায় একটি শিবলিঙ্গে পুজো করতেন। এটা দেখে ভীম সেটা ভাঙতে আসলে স্বয়ং দেবাদিদেব প্রকটিত হয়ে তাকে ধ্বংস করেন। সেই থেকে এখানে বাবা জ্যোর্তিলিঙ্গ রূপে বিরাজিত।

৭. বিশ্বেশ্বরঃ এই জ্যোর্তিলিঙ্গ ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাণসী বা কাশি নগরীতে অবস্থিত। এ এক মন্দিরের শহর। এখানে ভগবান শিব বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বনাথ নামে পরিচিত।

৮. শ্রীত্র্যম্বকেশ্বরঃ এটি ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশে অবস্থিত। এই প্রদেশের নাসিক থেকে ৩০ কিঃমিঃ পশ্চিমে এর অবস্থান।

৯. বৈদ্যনাথঃ বাবা বৈদ্যনাথ নামে পরিচিত এই জ্যোর্তিলিঙ্গ ভারতের বিহারের সাওতাল পরগণাতে অবস্থিত। এই জ্যোতির্লিঙ্গের কৃপাতে মানবের রোগ মুক্তি হয় বলে বিশ্বাস আছে। এটিই একমাত্র তীর্থ যা একাধারে জ্যোতির্লিঙ্গ ও শক্তিপীঠ।

১০. নাগেশ্বরঃ এই জ্যোতির্লিঙ্গটিও গুজরাটে অবস্থিত। দ্বারকা থেকে কিছু দূরে এর অবস্থান।

১১. সেতুবন্ধ রামেশ্বরঃ এটি দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশে অবস্থিত। বিস্তারিত জানতে ১৯০ নং প্রশ্ন দেখুন।

১২. শ্রীঘুশ্মেশ্বর/ঘৃষ্ণেশ্বরঃ এটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের শেষ জ্যোতিলিঙ্গ। এটা মহারাষ্ট্র প্রদেশের দৌলতবাদ থেকে বার মাইল দূরে বেরুল গ্রামের কাছে অবস্থিত। মন্দিরটি ইলোরার গুহামন্দিরের কাছে অবস্থিত। সুদর্শন চক্র দ্বারা খন্ডনকৃত সতীর ডান হাত পড়ে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ ধামে। গবেষকদের মতে সতীর স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ ধামের নাম প্রথমে ছিল সতীকুন্ড কালের বিবর্তনে তা সীতাকুন্ড হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তবে বিষয়টি বির্তকিত। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী (শিব চতুর্দশী) তিথিতে মানুষের মেলা বসে চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৭ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত সীতাকুন্ড পাহাড়ে। ৩৫০ কিলোমিটারের এক বিশাল অংশের পাহাড় এলাকা ঘিরেই আবর্তিত এ তীর্থক্ষেত্র। এ অংশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। পাশাপাশি এখানে দুই পাহাড়ের শীর্ষস্থানে আছে দুটি মন্দিরের অবস্থান। একটি বিরুপাক্ষ মন্দির অন্যটি চন্দ্রনাথ মন্দির। চন্দ্রনাথ মন্দিরটি সমতল ভূমি থেকে ১৩০০ ফুট উচ্চে পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এ মন্দির তথা পাহাড় একে অন্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে চন্দ্রনাথ ধাম হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। প্রতি বছর শ্রীশ্রী শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রধান তীর্থস্থান হিসাবে খ্যাত চন্দ্রনাথ ধামে বসে মানুষের মিলন মেলা।

তীর্থস্থান পবিত্র স্থান। তীর্থের জল, মাটি বাতাস সবই পবিত্র। তাইতো তীর্থ স্থানে গেলে মন পবিত্র হয়। মনে ধর্ম ভাব জাগে। ধর্মভাব জাগরনে মনের কলুষতা দূর হয়। পাপ কাজ থেকে মনকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়। তীর্থস্থান মানুষের মিলন মেলার স্থান। সেখানে গেলে কোন হিংসা-বিদ্বেষ, উচু নীচু ভেদ বৈষম্য কিংবা জাগতিক লোকসানের চিন্তাবোধ থাকেনা। তীর্থস্থান ভ্রমনের ফলে মনের ময়লা দূর হয়, পূর্ন্য আসে, মন জুড়ায়, অশান্তি দুর হয়। তাইতো কবি বলেছেন–

“তীর্থের মহিমা না করা যায় বর্ণন ,
করিলে ভ্রমন হয় মনের পবিত্রতায় পুণ্য সঞ্চালন।”

সীতা মন্দির নামে পাহাড়ের পাদদেশে আছে একটি মন্দির। এ মন্দিরটির অবস্থান আকর্ষনীয়। ধর্মীয় গাম্ভীর্যের ভাব আর প্রকৃতির নির্ঝরনী শব্দ দুয়ে মিলে মনোরম দৃশ্য মুগ্ধ করে আগন্তুক ভক্তদের। উক্ত মন্দির অভ্যন্তরে আছে চতুর্ভূজা সীতাদেবীর মূর্তি। ত্রিপুরার ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী সম্ভুনাথ মন্দিরের প্রথম কাজ হয়েছিল ১৫০১ খ্রিষ্ঠাব্দে। ১৯২০/১৯২৪ সালে এ মন্দিরটি সংস্কার করেন ত্রিপুরার মহারানী রত্নমঞ্জরী। এ ছাড়াও মধ্যবর্তী পাহাড়ে আছে আরও বেশ কয়েকটি মন্দির। স্বয়ম্ভুনাথ, রামকুন্ড, লক্ষনকুন্ড মন্দিরের নাম বিশেষভাবে উল্যেখযোগ্য। উল্লেখিত মন্দির গুলোর মধ্যে এই তিথিতে ভক্ত সমাগম ও পুজার্চনা হয় সম্ভুনাথ মন্দিরে। কেননা সুউচ্চ পাহাড়ে যাদের পক্ষে উঠা সম্ভব হয়না তারাই এ মন্দিরে পুজার্চনা করেন। সম্ভুনাথ

মন্দিরটি ষোড়শ শতাব্দিতে ধনমানিক্য বাহাদুর, পরৈকোড়ার জমিদার বৃন্দাবন দেওয়ানের মাতা দুর্গারানী, প্রতাপ চৌধুরী ও মুক্তাগাছার জমিদার বিদ্যাময়ী দেবীর অর্থায়নে নির্মিত। ১৯২৩ সালে বর্ধমান জেলার শিয়ালশোলের রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া শম্ভুনাথ মন্দিরে যাওয়ার ৬৮টি সিড়ি নির্মান করে দেন। চন্দ্রনাথ পাদদেশ থেকে শীর্ষস্থান পর্যন্ত থাক থাক করে বানানো হয়েছে সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন বানিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ সিঁড়ির গায়ে খোদিত আছে উদ্যোক্তার নাম। পাপ খন্ডন অথবা নিকট আত্নীয়দের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে সিঁড়িগুলো। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, সিঁড়ি নির্মানের প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করেন চব্বিশ পরগনা নিবাসী শ্রীগঙ্গারাম বিশ্বাস। তার বৃদ্ধ মাতা চন্দ্রনাথ দর্শনে এসে পাহাড়ী দূর্গমপথে পৌছুতে পারেননি চন্দ্রনাথ মন্দিরে। এ কারনে বৃদ্ধমাতা ছেলেকে নির্দেশ দেন–সীতাকুন্ড পাহাড়ে সিঁড়ি নির্মান করে দেওয়ার। মাতৃ আজ্ঞা পালন করতে ১২৭০ বঙ্গাব্দে শ্রীগঙ্গারাম বিশ্বাস সীতাকুন্ডের পাহাড়ী পথে ৭৮২টি সিঁড়ি নির্মান করেন। নানা কারনে সিঁড়ি গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হলে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সিঁড়িগুলো সংস্কার করে দেন চব্বিশ পরগনার জমিদার শ্রীসূর্যকান্ত রায় চৌধুরী। এরপর শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা ও মধুসূধন সাহা নামের দুই সহোদর বিরুপাক্ষ মন্দির থেকে চন্দ্রনাথ মন্দির পর্যন্ত প্রায় ১.২৫ কিলোমিটারের পথে সিঁড়ি নির্মান করে দেন। এছাড়াও শ্রীঅন্নদারঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ও বসন্ত কুমারী দেবীর নামে রয়েছে কিছু সিঁড়ি। এ সিঁড়িগুলো নির্মানের ফলে তীর্থযাত্রীরা পৌছাতে পারেন শীর্ষস্থানে। মূল পাহাড়ী চুঁড়ায় অবস্থিত মন্দিরটি চন্দ্রনাথ মন্দির এবং সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত বিরূপাক্ষ মন্দির। পরৈকোড়ার জমিদার নারায়ণ লালা এ মন্দিরগুলোর নির্মাতা। তিনি চন্দ্রনাথ মন্দির ও বিরূপাক্ষ মন্দিরের জল সরবরাহের খরচ নির্বাহে ৮০০ দ্রোন লাখেরাজ ভূমি দান করেছিলেন। ১৩২৫ সালে মন্দির গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হলে রংপুরের ডিমলার রানী শ্রীমতী বৃন্দারানী চৌধুরানী বহু অর্থ ব্যায় করে মন্দিরগুলোর সংস্কার করে দেন। এ ছাড়াও তিনি ১৩০৪ বঙ্গাব্দে চন্দ্রনাথ ও বিরুপাক্ষ মন্দিরের সিঁড়ি ও লৌহ সেতু নির্মান করে দেন এবং তাঁর স্বামী রাজা শ্রীজানকিবল্লভ সেনের নামে স্মৃতি ফলক দেন। মন্দির নির্মান, সংস্কার ও উন্নয়নে আরও অনেক ব্যাক্তির অবদান রয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার রাজা শ্রীগোবিন্দ মানিক্য, সরোয়াতলী গ্রামের জমিদার শ্রীরামসুন্দর সেন এবং ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীরাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী অন্যতম।

বর্তমানে মন্দিরগুলো হারিয়েছে পূর্বশ্রী।তাই, সংস্কার করা জরুরী।

তথ্যসূত্রঃ

১. ঈশ্বরের অবতার রহস্য, ভবেশ রায়
২. ওঁম নমঃ শিবায়, গীতাপ্রেস
৩. পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার
৪.সেতুবন্ধ রামেশ্বরম ,সুমন গুপ্ত ,শারদীয়া বর্তমান ১৪

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং * রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ
স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যাং বিশ্ববীজং

নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তরমং ত্রিনেত্রম্।”

শিবমূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল তার তৃতীয় নয়ন, গলায় বাসুকী নাগ, জটায় অর্ধচন্দ্র, জটার উপর থেকে প্রবাহিত গঙ্গা, অস্ত্র ত্রিশূল ও বাদ্য ডমরু। শিবকে সাধারণত ‘শিবলিঙ্গ’ নামক বিমূর্ত প্রতীকে পূজা করা হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজে শিবপূজা প্রচলিত আছে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রে বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের কিছু অংশে শিবপূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষিত হয়। সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহে শিব পূজা কে সর্বশ্রেষ্ঠও সর্বাধিক ফলপ্রদ বলে বর্ণনা করা হয়ে।

সংস্কৃত শিব (দেবনাগরী: शिव, śiva) শব্দটি একটি বিশেষণ, যার অর্থ “শুভ, দয়ালু ও মহৎ।” ব্যক্তিনাম হিসেবে এই শব্দটির অর্থ “মঙ্গলম।” রূঢ় রুদ্র শব্দটির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কোমল নাম হিসেবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ হিসেবে শিব শব্দটি কেবলমাত্র রুদ্রেরই নয়, অন্যান্য বৈদিক দেবদেবীদের অভিধা রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সংস্কৃতে শৈব শব্দটির অর্থ "শিব সংক্রান্ত"। এই শব্দটি হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম প্রধান শাখাসম্প্রদায় ও সেই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বীদের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শৈবধর্মের কয়েকটি প্রথা ও ধর্মবিশ্বাসের বিশেষণ রূপেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শৈবধর্ম আবার হিন্দুধর্মের প্রবেশদ্বার। শিব শব্দটির একাধিক অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন: “পবিত্র ব্যক্তি”, “প্রকৃতির তিন গুণের (সত্ত্ব, রজ ও তম) অতীত যিনি”, অথবা “যাঁর নাম উচ্চারণ মাত্রেই মানুষ পাপমুক্ত হয়।” স্বামী চিন্ময়ানন্দ তার বিষ্ণু সহস্রনাম অনুবাদে স্তবটির ব্যাখ্যা আরও প্রসারিত করে বলেছেন: শিব শব্দের অর্থ যিনি চিরপবিত্র বা যিনি রজ বা তমের দোষ কর্তৃক স্পর্শিত হন না।
শিবের নাম সম্বলিত শিব সহস্রনাম স্তোত্রের অন্তত পাঠান্তর পাওয়া যায়। মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্ব অনুশাসনপর্ব-এর অন্তর্গত পাঠটি এই ধারার মূলরচনা বলে বিবেচিত হয়। মহান্যাসে শিবের একটি দশ সহস্রনাম স্তোত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। শতরুদ্রীয় নামে পরিচিত শ্রীরুদ্রম্ চমকম্ স্তোত্রেও শিবকে নানা নামে বন্দনা করা হয়েছে।

রুদ্র

***

আধুনিক শিবের সঙ্গে বৈদিক দেবতা রুদ্রের নানা মিল লক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজে রুদ্র ও শিবকে একই ব্যক্তি মনে করা হয়। রুদ্র ছিলেন বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের দেবতা; তাকে একজন ভয়ানক, ধ্বংসকারী দেবতা হিসেবে কল্পনা করা হত।

হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হল ঋগ্বেদ। ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় যে ১৭০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থের রচনা। ঋগ্বেদে রুদ্র নামে এক দেবতার উল্লেখ রয়েছে। রুদ্র নামটি আজও শিবের অপর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঋগ্বেদে (২।৩৩) তাকে “মরুৎগণের পিতা” বলে উল্লেখ করা হয়েছে; মরুৎগণ হলেন ঝঞ্ঝার দেবতাদের একটি গোষ্ঠী। এছাড়াও ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে প্রাপ্ত রুদ্রম্ স্তোত্রটিতে রুদ্রকে নানা ক্ষেত্রে শিব নামে বন্দনা করা হয়েছে; এই স্তোত্রটি হিন্দুদের নিকট একটি অতি পবিত্র স্তোত্র। তবে শিব শব্দটি ইন্দ্র, মিত্র ও অগ্নির বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হত।

রুদ্রকে "শর্ব" (ধনুর্ধর) নামেও অভিহিত করা হয়। রুদ্রের একটি প্রধান অস্ত্র হল ধনুর্বাণ। নামটি শিব সহস্রনাম স্তোত্রেও পাওয়া যায়। আর. কে. শর্মা মনে করেন, পরবর্তীকালের ভাষাগুলিতেও এই নামটি শিবের অপর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির বুৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ শর্ব থেকে, যার অর্থ আঘাত করা বা হত্যা করা। আর. কে. শর্মার ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই শব্দটির অর্থ “যিনি অন্ধকারের শক্তিসমূহকে হত্যা করতে সক্ষম।” শিবের অপর দুই নাম ধন্বী (“ধনুর্ধারী”) ও বাণহস্ত (“ধনুর্বিদ”, আক্ষরিক হস্তে “বাণধারী”) ধনুর্বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হিন্দু দেবমণ্ডলী একজন প্রধান দেবতারূপে শিবের উত্থানের পশ্চাতে কার্যকরী ছিল অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু প্রমুখ বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

গোস্বামী তুলসীদাসজী বিরচিত রুদ্রাষ্টকম:
রুদ্রাষ্টকম্

নমামীশ মীশান নির্বাণরূপং
বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদ স্বরূপং।
নিজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং
চিদাকাশ মাকাশবাসং ভজেহং॥
নিরাকার মোংকার মূলং তুরীযং
গিরিজ্ঞান গোতীত মীশং গিরীশং।
করালং মহাকালকালং কৃপালং
গুণাগার সংসারসারং নতো হং॥
তুষারাদ্রি সংকাশ গৌরং গম্ভীরং
মনোভূতকোটি প্রভা শ্রীশরীরং।
স্ফুরন্মৌলি কল্লোলিনী চারুগাংগং
লস্ৎফালবালেন্দু ভূষং মহেশং॥
চলৎকুংডলং ভ্রূ সুনেত্রং বিশালং
প্রসন্নাননং নীলকংঠং দযালুং।
মৃগাধীশ চর্মাম্বরং মুন্ডমালং প্রিযং
শংকরং সর্বনাথং ভজামি॥
প্রচন্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশং
অখন্ডং অজং ভানুকোটি প্রকাশং।
ত্রযী শূল নির্মূলনং শূলপাণিং ভজেহং
ভবানীপতিং ভাবগম্যং॥
কালাতীত কল্যাণ কল্পান্তরী সদা
সজ্জনানন্দদাতা পুরারী।
চিদানন্দ সন্দেহ মোহাপকারী
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মধারী॥

BANG

ন যাবদ্ উমানাথ পাদারবিন্দং
ভজংতীহ লোকে পরে বা নারাণাং।
ন তাবৎসুখং শাংতি সন্তাপনাশং
প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাস॥
নজানামি যোগং জপং নৈব পূজাং
নতো হং সদা সর্বদা দেব তুভ্যং।
জরাজন্ম দুঃখৌঘতাতপ্যমানং
প্রভোপাহি অপন্নমীশ প্রসীদ!॥

অগ্নি

***

রুদ্রের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বৈদিক সাহিত্যে অগ্নি ও রুদ্রের পারস্পরিক অঙ্গীভবন রুদ্রের রুদ্র-শিব রূপে বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নিরুক্তি নামক প্রাচীন ব্যুৎপত্তিতত্ত্ববিষয়ক একটি গ্রন্থে এই অঙ্গীভবনের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থে লেখা আছে, "অগ্নিকে রুদ্র নামেও অভিহিত করা হয়।" শতরুদ্রীয় স্তবে "সসিপঞ্জর" ("সোনালি লাল রঙের শিখার মতো আভাযুক্ত") ও "তিবষীমতি" ("জ্বলন্ত শিখা") বিশেষণদুটি রুদ্র ও অগ্নির সমরূপত্ব নির্দেশ করছে।অগ্নিকে ষাঁড়ের রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে, এবং শিবের বাহনও হল নন্দী নামে একটি ষাঁড়। ষাঁড়ের মতো অগ্নিরও শিং কল্পনা করা হয়ে থাকে। [মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে অগ্নি ও ভৈরব শিব–উভয়েরই বিশেষত্ব হল অগ্নিশিখার ন্যায় মুক্ত কেশরাশি।

ইন্দ্র

***

ঋগ্বেদে একাধিক স্থলে শিব শব্দটি ইন্দ্রের অভিধা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

ধ্বংসকর্তা ও মঙ্গলময় সত্তা

∞∞∞∞≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

যজুর্বেদে শিবের দুটি পরস্পরবিরোধী সত্ত্বার উল্লেখ রয়েছে। এখানে একদিকে তিনি যেমন ক্রূর ও ভয়ংকর (রুদ্র); অন্যদিকে তেমনই দয়ালু ও মঙ্গলময় (শিব)। এই কারণে চক্রবর্তী মনে করেন, "যে সকল মৌলিক উপাদান পরবর্তীকালে জটিল রুদ্র-শিব সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল, তার সবই এই গ্রন্থে নিহিত রয়েছে। "মহাভারতেও শিব একাধারে" "দুর্জ্ঞেয়তা, বিশালতা ও ভয়ংকরের প্রতীক" এবং সম্মান, আনন্দ ও মহত্ত্বের দ্বারা ভূষিত। শিবের নানা নামের মধ্যে তার এই ভয়াল ও মঙ্গলময় সত্ত্বার বিরোধের উল্লেখ রয়েছে।
রুদ্র (সংস্কৃত: রুদ্র) নামটি শিবের ভয়ংকর সত্ত্বার পরিচায়ক। প্রথাগত বুৎপত্তি ব্যাখ্যা অনুসারে, রুদ্র শব্দটির মূল শব্দ হল রুদ্-, যার অর্থ রোদন করা বা চিৎকার করা। স্টেলা ক্র্যামরিক অবশ্য এর একটি পৃথক বুৎপত্তি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাটি বিশেষণ রৌদ্র শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যার অর্থ বন্য বা রুদ্র প্রকৃতির। এই

ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তিনি রুদ্র নামটির অর্থ করেছেন যিনি বন্য বা প্রচণ্ড দেবতা। এই ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা অনুসারে, আর. কে. শর্মা রুদ্র শব্দের অর্থ করেছেন ভয়ংকর। মহাভারতের অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত শিব সহস্রনাম স্তোত্রে শিবের হর (সংস্কৃত: হর) নামটির উল্লেখ করা হয়েছে তিন বার। এটি শিবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। অনুশাসনপর্বে তিন বারই এই নামের উল্লেখ করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অর্থে। আর. কে. শর্মা এই তিনটি উল্লেখে হর নামটির অর্থ করেছেন "যিনি বন্দী করেন", "যিনি এক করেন" এবং "যিনি ধ্বংস করেন।" শিবের অপর দুই ভয়ংকর রূপ হল "কাল" (সংস্কৃত: কাল) ও "মহাকাল" (সংস্কৃত: মহাকাল)। এই দুই রূপে শিব সকল সৃষ্টি ধ্বংস করেন। ধ্বংসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিবের অপর একটি রূপ হল ভৈরব (সংস্কৃত: भैरव)। "ভৈরব" শব্দটির অর্থও হল "ভয়ানক।"

অপরপক্ষে শিবের শংকর (সংস্কৃত: शङ्कर) নামটির অর্থ "মঙ্গলকারক" বা "আনন্দদায়ক।" এই নামটি শিবের দয়ালু রূপের পরিচায়ক। বৈদান্তিক দার্শনিক আদি শংকর (৭৮৮-৮২০ খ্রি.) এই সন্ন্যাসজীবনের নাম হিসেবে নামটি গ্রহণ করে শংকরাচার্য নামে পরিচিতি লাভ করেন। একই ভাবে শম্ভু (সংস্কৃত: शम्भु) নামটির অর্থও "আনন্দদায়ক।" এই নামটিও শিবের দয়ালু রূপের পরিচায়ক।

শিবাষ্টকম

BANGLADARSHAN.COM

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥১॥
গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকালকালং গণেশাধিপালম।
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥২॥
মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডযন্তং
মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরং তম।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥৩॥
তটাধোনিৰাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥৪॥
গিরীন্দ্রাত্মজাসঙ্গৃহীতার্ধদেহং গিরৌ
সংস্থিতং সর্বদা সন্নিগেহম।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির্বন্দ্যমানং

শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥৫॥
কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাংভোজনম্রায কামং দদানম।
বলীবর্দযানং সুরাণাং প্রধানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥৬॥
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পৰিত্রং ধনেশস্য মিত্রম।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রং ৰিচিত্রং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥৭॥
হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারম।
শ্মশানে ৰসন্তং মনোজং দহন্তং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে॥৮॥
স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ
পঠেৎসর্ৰদা ভর্গভাৰানুরক্তঃ।
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং
বিচিত্রৈঃ সমারাদ্য মোক্ষং প্রযাতি॥৯॥
ইতি শ্রীশিবাষ্টকং সংপূর্ণম॥

BANGLADARSHAN.COM

যোগী ও গৃহী সত্তা

****

শিবকে একাধারে যোগী ও গৃহী রূপে কল্পনা করা হয়। যোগী শিবের মূর্তি ধ্যানরত। যোগশাস্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মহাযোগী নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিক ধর্মে যজ্ঞের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, মহাকাব্যিক যুগে তপস্যা, যোগ ও কৃচ্ছ্রসাধন অধিকতর গুরুত্ব পেতে শুরু করে। যোগীবেশে শিব কল্পনার আবির্ভাব তাই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে ঘটেছিল।

“বন্দে দেবং উমাপতিং মহাদেবং সুরগুরুং
বন্দে জগৎকারণং বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং
পশুনাংপতিং আদিদেবং জগতকারং
অর্ধনারীশ্বরাং বিভুং প্রভুং গিরিশং ভবভয়হরং
নিস্ফলমজং মহাদেব বন্দে প্রণতজনতাপনিবারণং।”

গৃহী রূপে তিনি পার্বতীর স্বামী এবং গণেশ ও কার্তিকেয় নামে দুই পুত্রের জনক। পার্বতী বা উমা তার স্ত্রী বলে তাকে উমাপতি, উমাকান্ত ও উমাধব নামেও অভিহিত করা হয়। শিবের স্ত্রী পার্বতীই বিশ্বজননী বা মহাশক্তি।

গৃহী রূপে শিব আপন পত্নীকে ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। তিনিই অর্ধনারীশ্বর, ভব ভয় হরণ করে প্রণত জনের তাপ নিবারণ করেন।

শিব ও পার্বতীর দুই পুত্র–কার্তিকেয় ও গণেশ। দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্যন, ষন্মুখন, স্বামীনাথন ও মুরুগান নামে কার্তিকেয়ের পূজা বহুল প্রচলিত; উত্তর ভারতে তিনি স্কন্দ, কুমার ও কার্তিকেয় নামেই সর্বাধিক পরিচিত। শিবের স্ত্রীকে তার শক্তির উৎস মনে করা হয়।

নটরাজ

****

নটরাজ বেশে শিবের মূর্তি অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিব সহস্রনামে শিবের নর্তক ও নিত্যনর্ত নামদুটি পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগ থেকেই নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে শিবের যোগ বিদ্যমান। সারা ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে, নটরাজের পাশাপাশি নৃত্যমূর্তি নামে শিবের নানান নৃত্যরত মূর্তি সারা ভারতে পাওয়া যায়। শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুটি নৃত্যের নাম হল তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডব ধ্বংসাত্মক ও পুরুষালি নৃত্য; শিব কাল-মহাকাল বেশে বিশ্বধ্বংসের উদ্দেশ্যে এই নাচ নাচেন। এবং মধুর ও সুচারু নৃত্যকলা; এই আবেগময় নৃত্যকে পার্বতীর নাচ রূপে কল্পনা করা হয়। লাস্যকে তাণ্ডবের নারীসুলভ বিকল্প মনে করা হয়। তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য যথাক্রমে ধ্বংস ও সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

BANGLADARSHAN.COM

সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিজিক্স ল্যাব The European Organization for Nuclear Research (CERN)। এখানে রয়েছে মহাদেব শিবের একটি মূর্তি। এটিকে বলা হয় নটরাজ শিব। ভারত এই প্রতিমাটি উপহার দেয়। ২ মিটার উঁচু এই প্রতিমাটি ২০০৪ সালের ১৮ জুন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিজিক্স ল্যাবে উন্মোচন করা হয়।

শিব তান্ডব স্তোত্র

****

ভগবান শিবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তোত্রগুলির মধ্যে একটি হল ‘শিব তান্ডব স্তোত্র।’ বিশ্বাস করা হয় যে, রাজা রাবন ছিলেন শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত। শিবের অনুসারীগণ মনে করেন যে, রাবন এই স্তোত্রটি রচনা করেন এবং তিনিই প্রথম এটি পাঠ করেন।

শিব তান্ডব স্তোত্র সম্পর্কে রামায়ণের চরিত্র রাবণকে ঘিরে একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী রয়েছে। কাহিনীটি এরকম যে, রাবণের পূর্বে তাঁর সৎ ভাই কুবের ছিলেন লঙ্কার রাজা। কুবেরের ছিল দূর্লভ এক পুষ্পক বিমান (উড়ুক্কু রথ)। একসময় রাবণ তাঁর ভাইকে যুদ্ধে পরাজিত করে সেই পুষ্পক বিমানে চড়ে বিশ্ব পরিভ্রমণ করছিলেন। এভাবে একসময় তিনি কৈলাস পর্বতের কাছে আসলে তাঁর পুষ্পক বিমান থেমে যায়। হিন্দুধর্মমতে কৈলাস পর্বত ভগবান শিবের আবাসস্থল এবং গোটা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। সেখানে পুষ্পক বিমান থেমে গেলে রাবণ ভীষণ বিরক্ত হন। কৈলাস পর্বত রাবণকে তাঁর বিমানের দিক পরিবর্তন করতে বলে কারণ সেই মূহুর্তে শিব-পার্বতী কৈলাসে বিশ্রামরত ছিলেন। কিন্তু রাবণ কৈলাসের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পুষ্পক

বিমান থেকে নেমে কৈলাসকে সরিয়ে দেয়ার জন্য প্রচন্ড শক্তি প্রয়োগ করলেন। এতে গোটা পৃথিবী কাঁপতে শুরু করল।

সেই মুহূর্তে রাবনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ভগবান শিব তাঁর পায়ের আঙুল দিয়ে কৈলাস পর্বতকে প্রচন্ড শক্তিতে চেপে ধরলেন। পর্বতের চাপে রাবণের হাত পিষে যেতে থাকল। যন্ত্রনায় রাবণ চিৎকার করতে লাগলেন। সেই চিৎকার ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) সব যায়গা থেকে শোনা গেলো। সংস্কৃতে এই চিৎকারের ধ্বনিকে বলে 'রব।' সেই রব শুনে মহর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য রাবণকে শিবের আরাধনা করতে পরামর্শ দিলেন। মহর্ষি নারদের পরামর্শ অনুযায়ী রাবণ চৌদ্দ দিন ধরে শিব মন্ত্র পাঠ করতে থাকলেন। এরপর প্রদোষকালে (সূর্যোদয়ের পূর্বে একঘন্টা ও সূর্যাস্তের পরে একঘন্টার মধ্যের সময়) শিব তান্ডব স্তোত্র পাঠ করতে থাকলেন। যাদুকরী সেই স্তোত্র পাঠ ত্রিভুবনের সব যায়গা থেকে শোনা গেলো। শিবের সৌন্দর্য ও প্রশংসা সম্বলিত সেই স্তোত্র শুনে সবাই মুগ্ধ হল।

শিব তান্ডব স্তোত্রম্

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে
গলেবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্।
ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বযং
চকার চন্ডতান্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥১॥
জটাকটাহসমভ্রমভ্রমন্নিলিংপনির্ঝরী-
-বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥২॥
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর
স্ফুরদ্দিগংতসংততিপ্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরুদ্ধদুর্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি॥৩॥
জটাভুজঙ্গ পিঙ্গল স্ফুরৎফণামণিপ্রভা
কদম্ব কুম্বকুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরস্ফুরত্ত্বগুত্তরীযমেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্তু ভূতভর্তরি॥৪॥
সহস্রলোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর
প্রসূনধূলিধোরণী বিধূসরাংঘ্রিপীঠভূঃ।
ভুজঙ্গ রাজমালযা নিবদ্ধজাটজূটক
শ্রিযৈ চিরায জাযতাং চকোরবন্ধুশেখরঃ॥৫॥
ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনংজযস্ফুলিংগভা-

BANGLADARSHAN.COM

-নিপীতপংচসাযকং নমন্নিলিংপনাযকম্।
সুধামযূখলেখযা বিরাজমানশেখরং
মহাকপালিসংপদেশিরোজটালমস্তু নঃ॥৬॥
করালফালপট্টিকাধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনংজযাধরীকৃতপ্রচন্ডপঞ্চসাযকে।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক-
-প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে মতির্মম॥৭॥
নবীনমেঘমংডলী নিরুদ্ধদুর্ধরস্ফুরত্-
কুহূনিশীথিনীতমঃ প্রবন্ধবন্ধুকন্ধরঃ।
নিলিংপনির্ঝরীধরস্তনোতু কৃত্তিসিংধুরঃ
কালানিধানবন্ধুরঃ শ্রিযং জগদ্ধুরন্ধরঃ॥৮॥
প্রফুল্লনীলপংকজপ্রপংচকালিমপ্রভা-
-বিলংবিকংঠকংদলীরুচিপ্রবদ্ধকংধরম্।
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদাংধকচ্ছিদং তমংতকচ্ছিদং ভজে॥৯॥
অগর্বসর্বমংগলাকলাকদম্ভমঞ্জরী
রসপ্রবাহমাধুরী বিজৃংভণামধুব্রতম্।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে॥১০॥
জযত্বদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ভুজংগমশ্বস-
-দ্বিনির্গমৎক্রমস্ফুরৎকরালফালহব্যবাট্।
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিধ্বননৃদংগতুংগমংগ
ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিত প্রচন্ডতান্ডবঃ শিবঃ॥১১॥
দৃষদ্বিচিত্রতল্পযোর্ভুজংগমৌক্তিকস্রজোর্-
-গরিষ্ঠরত্নলোষ্ঠযোঃ সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষযোঃ।
তৃষ্ণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্দ্রযোঃ
সমং প্রবর্তযন্মনঃ কদা সদাশিবং ভজে॥১২॥
কদা নিলিংপনির্ঝরীনিকুংজকোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্মতিঃ সদা শিরঃস্থমংজলিং বহন্।
বিমুক্তলোললোচনো ললাটফাললগ্নকঃ
শিবেতি মংত্রমুচ্চরন্ সদা সুখী ভবাম্যহম্॥১৩॥
ইমং হি নিত্যমেবমুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবং
পঠন্স্মরন্ব্রুবন্নরো বিশুদ্ধিমেতিসংততম্।
হরে গুরৌ সুভক্তিমাশু যাতি নান্যথা গতিং
বিমোহনং হি দেহিনাং সুশংকরস্য চিন্তনম্॥১৪॥

BANGLADARSHAN.COM

পূজাবসানসময়ে দশবক্ত্রগীতং যঃ
শম্ভুপূজনপরং পঠতি প্রদোষে।
তস্য স্থিরাং রথগজেন্দ্রতুরঙ্গযুক্তাং
লক্ষ্মীং সদৈব সুমুখিং প্রদদাতি শংভুঃ॥১৫॥

স্তোত্র পাঠ শেষ হলে ভগবান শিব রাবণের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে কৈলাস থেকে নেমে এলেন এবং তাঁর নাম দিলেন রাবণ। এর আগে রাবণকে দশানন (দশ মাথা যার) বলে ডাকা হতো। রাবণ ছিলেন সত্যিকারের একজন বেদজ্ঞ এবং দেবী সরস্বতীর আশির্বাদধন্য। যথাযথ সুর ও ছন্দের সমন্বয়ে তৈরি শিব তান্ডব স্তোত্র পাঠ শুনে রাবণের প্রতি ভগবান শিব এতটাই সন্তুষ্ট হলেন যে, তখন তাঁকে তিনি অতি দূর্লভ চন্দ্রহাস তরবারি দান করলেন।

শিবের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন, শিবের অন্যান্য স্তোত্রের মত শিব তান্ডব স্তোত্রও সবার পাঠ করা উচিত। তাদের মতে, এই স্তোত্রের যাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে। তাই আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতিতে এই স্তোত্র সঠিক নিয়মে এবং ভগবান শিবের প্রতি পূর্ণ ভক্তি নিয়ে পাঠ করা উচিত। তাছাড়া এই স্তোত্র পাঠে আমাদের সুখ, সমৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আমরা আমাদের মধ্যে শিবের উপস্থিতি অনুভব করি। যে কোন সময় শিব তান্ডব স্তোত্র পাঠ ও শ্রবণ করা যায়, তবে প্রদোষকালে এই স্তোত্র পাঠ করাই উত্তম ।

দক্ষিণামূর্তি

****

BANGLADARSHAN.COM

দক্ষিণামূর্তি (সংস্কৃত: দক্ষিণামূর্তি) শিবের একটি বিশিষ্ট রূপ। আক্ষরিকভাবে দক্ষিণামূর্তি কথাটির অর্থ দক্ষিণদিকে মুখ যাঁর। এই রূপে শিব যোগ, সঙ্গীত ও বিদ্যাচর্চার গুরু এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা। প্রধানত তামিলনাড়ুতে শিবের এই মূর্তি প্রচলিত। দক্ষিণামূর্তি শিব মৃগসিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং জ্ঞানপিপাসু ঋষিগণ কর্তৃক পরিবৃত। ঋষি অনির্বাণের মতে, দক্ষ সৃষ্টিসামর্থের ঘনবিগ্রহ, ব্যক্তির জীবনে দক্ষ সংকল্পশক্তি। সৃষ্টি বস্তুতঃ অন্ধকার থেকে আলোর স্ফূরণ। তাই বেদে উষাকে বলা হয়েছে দক্ষিণা। সাধারণত যজ্ঞের ঋত্বিককে যজমান যজ্ঞ শেষে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যা দিতেন, তাকে দক্ষিণা বলা হত। ঋত্বিক, সমর্থ পুরুষ, তিনি যজমানের হিরণ্য শরীর গড়ে তোলেন আত্ম শক্তিতে। তাতে ঋত্বিক আর যজমানের একটা একাত্মতা ঘটে। তখন যজ্ঞ ভূমিতে উভয়ের প্রসন্নতায় একটা ঊষার আলো ফুটে ওঠে। এই আলোকে দক্ষিণা বলে। দক্ষিণা তাহলে গুরুর প্রসাদ শক্তি বা গুরুর দক্ষিণ্য। এই দক্ষিন্য বা প্রসাদ যাঁর মধ্যে বিগ্রহের আকার ধরেছে, তিনি দক্ষিণমূর্তি, আবার তিনিই জ্ঞানমূর্তি। প্রজ্ঞা আবার শূন্যতা, করুণা উপায়। শূন্যতা ও করুণা যুগনদ্ধ। শিবের দক্ষিণমূর্তিও তাই।

মৃত্যুঞ্জয়

*****

“মৃত্যুঞ্জয়” কথাটির আক্ষরিক অর্থ “যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন।” কথিত আছে, শিব মৃত্যুর দেবতা যমকে জয় করেছিলেন। একটি কিংবদন্তি অনুসারে, ঋষি মার্কণ্ডেয়ের ষোলো বছর বয়সে মৃত্যুযোগ ছিল। মার্কণ্ডেয়

শিবের আরাধনা করেন। মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে, তিনি শিবের নিকট জীবন ভিক্ষা করেন। শিব যমকে পরাজিত করে মার্কণ্ডেয়কে জীবন দান করেন।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রটি হল:

ওঁ ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাত্॥

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র একটি সর্বরোগ হরণকারী মন্ত্র। এই মন্ত্রটি ভগবান মহাদেবকে স্মরণ করে রচিত। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদেও দৃষ্ট হয়–আবার এই মন্ত্রটি মার্কণ্ডেয় পুরাণেও দৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রটি জপ করলে মানুষ সব অশান্তি, রোগপীড়া , বয়োধি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। নিরাকার মহাদেবই মৃত্যুমুখী প্রাণকে বলপূর্বক জীবদেহে পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অপার শান্তিদান করেন। এই মন্ত্রটির সাথে একটি কাহিণী প্রচলিত আছে। সেটি হল- মহর্ষি মৃকন্ডু এবং তাঁর পত্নী মরুদবতী পুত্রহীণ ছিলেন। তারা তপস্যা করেন মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন এবং এক পুত্র লাভ করেন, যার নাম হল মার্কন্ডেয়। কিন্তু মার্কন্ডেয়র বাল্যকালেই মৃত্যুযোগ ছিল। অভিজ্ঞ ঋষিদের কথায় বালক মার্কন্ডেয় শিব লিঙ্গের সামনে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। যথা সময়ে যম রাজ এলেন। কিন্তু মহাদেবের শরণে আসা প্রাণকে কেইবা হরণ করতে পারে! যমরাজ পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেন এবং মার্কন্ডেয় মহাদেবের বরে দীর্ঘাযু লাভ করলেন। পরে তিনি মার্কন্ডেয় পুরাণ রচনা করলেন । মার্কন্ডেয় ঋষি মহাদেবের স্তুতি করলেন মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রের মাধ্যমে যেটি মার্কন্ডেয় পুরাণে পাওয়া যায়।

BANGLADARSHAN.COM

এই মন্ত্র জপ করার নিয়ম:
সকালে স্নান করার পরে পবিত্র মনে এই মন্ত্র পাঠ করুন।
এই জপ করতে হবে রুদ্রাক্ষের মালার সাহায্যে।
ধূপ বা প্রদীপ সহযোগে এই মন্ত্র জপ করতে হয়।
ভগবান শিবের ছবি বা মূর্তি কিংবা মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের মাধ্যম এই মন্ত্র জপ করা যায়।
কুশের আসনে বসে জপ ।
যদি নিজে মন্ত্র জপ করা না যায়, তাহলে কোনও পুরোহিতকে ডেকে নিয়মিত নিজের বাড়িতে এই মন্ত্র পাঠ করান উচিৎ ।
উপকার:
এই মন্ত্রের জপ করলে সমস্ত গ্রহের প্রকোপ থেকে রেহাই মেলে।
পরিবারে কেউ অসুস্থ থাকলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
আশু সঙ্কট থেকে বাঁচতেও এই মন্ত্র খুবই কার্যকরী।
কালসর্প দোষ, বাস্তু দোষ, পিতৃদোষ–এই ধরনের দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় নিয়মিত এই মন্ত্র জপ করলে।

অর্ধনারীশ্বর

****

অর্ধনারীশ্বর বেশে শিব অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারীদেহধারী। এই রূপের অপর একটি নাম হল "তৃতীয় প্রকৃতি।" এলান গোল্ডবার্গের মতে, সংস্কৃত অর্ধনারীশ্বর কথাটির অর্থ যে দেবতা অর্ধেক নারী; অর্ধেক পুরুষ। হিন্দু দর্শনে এই রূপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, এই বিশ্বের পবিত্র পরমাশক্তি একাধারে পুরুষ ও নারীশক্তি।

ত্রিপুরান্তক

******

একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে, শিব ধনুর্ধর বেশে ত্রিপুর নামে অসুরদের তিনটি দুর্গ ধ্বংস করেন। এই কারণে শিবের অপর নাম ত্রিপুরান্তক (সংস্কৃত: त्रिपुरान्तक)। শিবের এই নামটির একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন মানবদেহ তিন প্রকার-স্থূল শরীর বা বহিঃস্থ দেহ, সূক্ষ্ম শরীর বা মন এবং কারণ শরীর বা আত্মার চৈতন্যময় রূপ। এই তিন শরীরকে একত্রে ত্রিপুর বলা হয়। ত্রিপুরান্তক বেশে শিব মানব সত্ত্বার এই ত্রিমুখী অস্তিত্বের ধ্বংস ও বিলোপ ঘটিয়ে মানবকে পরমসত্ত্বার সঙ্গে লীন হতে সহায়তা করেন। এই বেশে তিনি মায়া ও অজ্ঞানকে ধ্বংস করে পরম চৈতন্যের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটান।

অষ্টমূর্তি

BANGLADARSHAN.COM

*****

শিবের আটটি বিশেষ রূপকে একত্রে অষ্টমূর্তি বলে। এঁরা হলেন: ভব (অস্তিত্ব), শর্ভ (ধনুর্ধর), রুদ্র (যিনি দুঃখ ও যন্ত্রণা প্রদান করেন), পশুপতি (পশুপালক), উগ্র (ভয়ংকর), মহান বা মহাদেব (সর্বোচ্চ আত্মা), ভীম (মহাশক্তিধর) ও ঈশান (মহাবিশ্বের দিকপতি)।
পূর্ব্বদিকে–ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ ঈশ্বনকোণে-ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।'
উত্তরে–ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।'
বায়ুকোণে–ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।'
পশ্চিমে–ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।'
নৈখতে–'ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ' দক্ষিণে–ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, অগ্নিকোণে–ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ'

শিবলিঙ্গ

*****

নৃতত্ত্বারোপিত মূর্তি ব্যতিরেকেও শিবলিঙ্গ বা লিঙ্গ-এর আকারে শিবের পূজাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। শিবলিঙ্গ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময় এবং লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রতীক; এই কারণে শিবলিঙ্গ শব্দটির অর্থ সর্বমঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার প্রতীক। শিব শব্দের অপর একটি অর্থ হল যাঁর মধ্যে প্রলয়ের পর বিশ্ব নিদ্রিত থাকে; এবং লিঙ্গ শব্দটির অর্থও একই–যেখানে বিশ্বধ্বংসের পর যেখানে সকল সৃষ্ট বস্তু

বিলীন হয়ে যায়। যেহেতু হিন্দুধর্মের মতে, জগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস একই ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই হেতু শিবলিঙ্গ স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়। মনিয়ার-উইলিয়ামস ও ওয়েন্ডি ডনিগার প্রমুখ কয়েকজন গবেষক শিবলিঙ্গকে একটি পুরুষাঙ্গ-প্রতিম প্রতীক মনে করেন। যদিও ক্রিস্টোফার ইসারহুড, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, ও এস. এন. বালগঙ্গাধর প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এই মতকে খণ্ডন করেছেন। অথর্ববেদ সংহিতা গ্রন্থে যূপস্তম্ভ নামে একপ্রকার বলিদান স্তম্ভের স্তোত্রে প্রথম শিব-লিঙ্গ পূজার কথা জানা যায়। এই স্তোত্রের আদি ও অন্তহীন এক স্তম্ভ বা স্কম্ভ-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্কম্ভ-টি চিরন্তন ব্রহ্মের স্থলে স্থাপিত। যজ্ঞের আগুন, ধোঁয়া, ছাই, সোম লতা, এবং যজ্ঞকাষ্ঠবাহী ষাঁড়ের ধারণাটির থেকে শিবের উজ্জ্বল দেহ, তার জটাজাল, নীলকণ্ঠ ও বাহন বৃষের একটি ধারণা পাওয়া যায়। তাই মনে করা হয়, উক্ত যূপস্তম্ভই কালক্রমে শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করেছে। লিঙ্গপুরাণ গ্রন্থে এই স্তোত্রটিই উপাখ্যানের আকারে বিবৃত হয়েছে। এই উপাখ্যানে কীর্তিত হয়েছে সেই মহাস্তম্ভ ও মহাদেব রূপে শিবের মাহাত্ম্য।

শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র

∞∞∞≈∞∞∞∞∞∞

BANG

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়
ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়
তস্মৈ ন-কারায় নমঃ শিবায়..১..

–অর্থাৎ সর্পরাজ যাঁর গলার মালা, যিনি ত্রিলোচন, ভস্ম যাঁর প্রসাধন, যিনি মহেশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ ও দিগম্বর, সেই ন–কার রূপী শিবকে নমস্কার করি।

মন্দাকিনি সলিলচন্দন চর্চিতায়
নন্দীশ্বর প্রমথনাথ মহেশ্বরায়।
মন্দারপুষ্প বহুপুষ্প সুপূজিতায়
তস্মৈ ম-কারায় নমঃ শিবায়..২..

–অর্থাৎ যাঁর শরীর মন্দাকিনীর জল ও চন্দন দ্বারা লিপ্ত, যিনি নন্দীর প্রভু, প্রমথদিগের ঈশ্বর ও মহেশ্বর এবং যিনি মন্দার পুষ্প ও বহুপুষ্প দ্বারা সুপূজিত হন, সেই ম–কার রূপী শিবকে প্রণাম করি ।

শিবায় গৌরীবদনাব্জ বৃন্দ
সূর্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়
তস্মৈ শি-কারায় নমঃ শিবায়..৩..

–অর্থাৎ যিনি শিব ও গৌরীর বদন কমলের তরুণ সূর্য স্বরূপ, যিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিলেন, যিনি শ্রীমান নীলকণ্ঠ ও বৃষভচিহ্ন ধারী, সেই শি–কার রূপী শিবকে প্রণাম করি ।

বশিষ্ঠ কুলোদ্ভব গৌতমার্য
মুনীন্দ্র দেবার্চিতশেখরায়।
চন্দ্রার্ক বৈশ্বানরলোচনায়
তস্মৈ ব-কারায় নমঃ শিবায়..৪..

–অর্থাৎ যাঁরা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম প্রভৃতি আর্যবংশীয় মুনিন্দ্রদের দ্বারা ও দেবতাদের দ্বারা পূজিত হন তাঁদের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ এবং চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি যাঁর তিনটি চক্ষু সেই ব–কার রূপী শিবকে প্রণাম করি ।

যক্ষস্বরূপায় জটাধরায়
পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়
তস্মৈ য -কারায় নমঃ শিবায়..৫..

–অর্থাৎ যিনি যজ্ঞরূপী, জটাধারী, পিনাকীধারী, নিত্য স্বরূপ, দিব্য দেব এবং দিগম্বর সেই য়–কার রূপী শিবকে নমস্কার করি ।

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে..

–অর্থাৎ যে এই পঞ্চাক্ষর যুক্ত শিবের স্তব শিব সমীপে পাঠ করে সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়ে শিবের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করে ।

শিবের পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র “ওঁম নমঃ শিবায়।”

শিবের পবিত্র সংখ্যা হল পাঁচ।তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রগুলির একটি (নমঃ শিবায়) পাঁচটি অক্ষর দ্বারা গঠিত।

কথিত আছে, শিবের শরীর পাঁচটি মন্ত্র দ্বারা গঠিত। এগুলিকে বলা হয় পঞ্চব্রহ্মণ। দেবতা রূপে এই পাঁচটি মন্ত্রের নিজস্ব নাম ও মূর্তিতত্ত্ব বর্তমান:

সদ্যজাত:

******

পঞ্চানন শিবের সদ্যজাত মুখটি ইচ্ছে শক্তিকে বোঝায়। শিবের এই আনন জীবের সুখ ও দুঃখ দুটিই দেয়। এটি পশ্চিম দিককে বোঝায়। শিবের এই মুখ অভিশাপ ও রাগের স্বরূপ বোঝায়। জলন্ধর পীঠকে বোঝায়। শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট অহংকার তত্ত্বকে বোঝায় যেটি পরিপূর্ণ অহং। এটি ভয়ঙ্কর গুণ বিশিষ্ট। এটি নির্জন বাসে লাভ করা যায় এবং এটি দেহাতীত বোধ।

বামদেব :

******

এটি শিবের চিত্ত রূপ ও চিত্ত রূপিণী সত্তা। এটি তুরীয় ভাব যেটি সূর্যের আদি শক্তির উপাসনায় প্রাপ্তি হয়। শিবের এই মুখটি আরোগ্য দানের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী যা যে কোনো জীবকে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে আরোগ্য দান করতে পারে। এটি পারালিঙ্গকে বোঝায়। লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট এই তুলনাহীন শক্তি যেকোনো মহাজাগতিক বস্তুকে রূপান্তরিত করতে পারে। তেজস মৌলকে উত্থিত করতে পারে। এটি দিক হচ্ছে উত্তর। এটি প্রাণবন্ত জীবনীশক্তির শক্তিকে প্রাধান্য দেয়। এটি অবর্ণনীয় আলোর ঔজ্জ্বল্যকে উপস্থাপন করে। শুধু মাত্র যোগারূঢ় ব্যক্তি তাদের পার্থিব শরীরে এই শক্তি ধারণ করতে পারে, অন্যথায় সাধারণের পার্থিব শরীর লয় হয়ে বামদেবের সঙ্গে মিশে ক্ষয় হয়ে যায়। এটির মধ্যে নিহিত থাকে নিজে বস্তু তৈরীর শক্তি।

অঘোর:

*****

অঘোর বোঝায় জ্ঞান শক্তি (অসীম জ্ঞান)। এটি আসলে প্রকৃতি (পরমাপ্রকৃতি যিনি পরম শিবের স্ত্রী) ও পরাশক্তির কর্ম। শিবের এই আনন বুদ্ধিরূপ। পূর্ণগিরি পীঠে বাণলিঙ্গে এটি স্থাপিত। দক্ষিণ দিশা ও ধুম্রবর্ণের। এটি আমাদের স্থিতি শীল অহংকার তত্ত্বকে বোঝায় (আমাদের অহং প্রকৃতি)। এটি প্রমাণ ও প্রমেয়র সংমিশ্রণ। এটি রুদ্রের জোর বা শক্তিকে বোঝায়।

তৎপুরুষ:

*****

তৎপুরুষ বোঝায় আনন্দ শক্তিকে, পূর্ব দিশা, কমলগিরি পীঠ, মনোরূপ। এটি আত্মার গঠনকে উপস্থাপিত করে। ব্যাষ্টি সমষ্টিতে মিশে যায়। পীত বর্ণ, পৃথ্বী তত্ত্বকে বোঝায়। স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বোঝায়। কারুর যদি খুব মনোসংযোগের সমস্যা থাকে কোনো বিষয়ে, তার তাহলে শিবের এই আননটি ধ্যান করা উচিৎ।

ঈশান:

****

ঈশান বোঝায় শিবের চিত্ত শক্তিকে। সাম্ব পীঠ, শূন্যতা। মূলাধারে শুরু হয়ে দেহের অনাহত, আজ্ঞা, সহস্রার হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে যায়। আকাশ তত্ত্ব (ইথার)। ব্যক্তি এখানে ক্ষুদ্র চেতন থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সামাজিক কাঠামোতে। তার করায়ত্ত হয় সেই ঐশ্বর্য যার দ্বারা সে মরণশীল জীব থেকে দিব্য সত্ত্বাদের পর্যন্ত পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন অতি সহজে। তার অহং পুড়িয়ে ফেলে তার সমগ্র ব্রহ্মান্ডর প্রতি অনন্ত প্রেম প্রতিভাত হয় এবং সে মহাজাগতিক নিয়মের থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অভিমুখ থাকে উর্দ্ধে বা আকাশপানে। আবার ঈশান হিন্দু ভগবান শিবের এক নাম। শিব হিন্দু ত্রিমূর্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব)এর অন্যতম। এর মূল "ঈশ", যার অর্থ জগতকে শাসন করা অদৃশ্য শক্তি। ঈশান ও ঈশ্বর একার্থক। ঈশান শব্দের অর্থ 'অনেক', এবং 'উত্তর-পূর্ব' দিকও হয়। বাস্তু

শাস্ত্রের মমতে ঈশান্য দিকের অর্থ সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান। হিন্দু ধর্মে উত্তর দিকে সুখ এবং পূর্ব দিকে জ্ঞান বোঝায়। ঈশান দুই-য়েরই মিলন।

শিবের পাঁচটা রূপ আছে। প্রতিটি রূপে পঞ্চতত্ত্ব–অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ, এক একটিকে বোঝায়। ঈশান–শিবের পঞ্চম রূপ, যা উপর দিকে চেয়ে থাকে এবং পঞ্চতত্ত্বের 'আকাশ' বোঝায়। শিবের মূর্তি এই পাঁচটি রূপ পঞ্চাননের আকারে কল্পিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে এই পাঁচটি রূপ পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে এই পাঁচটি রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। পঞ্চব্রহ্মণ উপনিষদ বলছে "জানবে, পার্থিব জগতের সকল বস্তুর পঞ্চমুখী চরিত্র বিদ্যমান। এর কারণ পঞ্চমুখী ব্রহ্মের চরিত্রবৈশিষ্ট্যরূপে শিবের চিরন্তন বৈচিত্র্য।" (পঞ্চব্রহ্মণ উপনিষদ ৩১)

শিব লিঙ্গ পূজার তাৎপর্য কি? শিব পূজা দু'রকম ভাবেই হয়। মূর্তি এবং লিঙ্গ। পূবেই বলা হয়েছে লিঙ্গ শব্দে অনেক গুলো অর্থ আছে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। সাকার রূপে এরূপ লিঙ্গ শরীর বা চিহ্ন আমরা সর্বত্রই ব্যবহার করি। একটি দেশের পরিচয় বহন করে একটি পতাকা। বিষ্ণুমন্ত্রের যারা অনুসারী তাদের পরিচয় তারা দেন দেহতে তিলক ফোঁটা অঙ্কিত করে। ঘটে আমরা দেবদেবীর পুত্তলী এঁকে দেবতার চিহ্ন বা প্রতীক বসাই। এরূপ দুটি প্রতীক বা লিঙ্গ বা চিহ্ন আমরা পূজায় ব্যবহার করি। একটি শিব লিঙ্গ আরেকটি নারায়ণ শিলা। শিব লিঙ্গের গঠন প্রণালী সহজ হওয়ায় মূর্তি তৈরী থেকে লিঙ্গ পূজায় আমরা আগ্রহী বেশি। মাটি দিয়ে অতি সহজে অল্প সময়ে এ প্রতীক তৈরী করা যায় এবং পূজান্তে বিসর্জনও দেয়া যায়। আমাদের শিবত্বে উন্নীত হতে হবে।

কিন্তু শিব আর মহাদেব এক নয়, শিব একটা অবস্থা যা সাধনায় যোগী প্রাপ্ত হন আর মহাদেব হলেন পার্বতীর স্বামী, যিনি সত্য যুগে ছিলেন। গুণের তারতম্যে দুজনের সত্তা ভিন্ন। আসলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর বা শিব প্রতি যুগেই এসেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী, শিবাবস্থা এগুলো যোগের দ্বারা মানুষ প্রাপ্ত হন। যেমন ব্রাহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন গুরু নানকদেব, তোতাপুরীবাবা, শিবাবস্থা প্রাপ্ত যোগী ছিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বামাখ্যাপা বাবা, আদি শংকরাচার্য আর বিষ্ণুর অবতার হয়ে এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর।

শিবের প্রণাম মন্ত্র:

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায়ে বজ্র হস্তায় নমঃ,
নমঃ স্ত্রীশূলহস্তায় দন্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কপূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হুতেবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গত্তিঃ পরমেশ্বর॥

নমস্তে ত্বং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপুরামরাঙ্গিপম।

মানুষ যখন বাঁচার তাগিদে অরণ্যে বা পার্বত্য অঞ্চলে দাবানল, নদীতটে বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, কিংবা সমতলে অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে মোকাবিলা করত, সেই ভয় ও ত্রাসের মধ্যে তাদের মনে প্রকটিত হয়েছে এক সংহারকারী সর্বশক্তিমান মহামানবের অস্তিত্বের বোধ। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই মানুষ তাঁকে অভিহিত করেছে 'রুদ্র' নামে। দেবাদিদেব মহাদেব শিব যুগ-যুগান্তর ধরে সনাতন ধর্মের সাধনপীঠে বিরাজিত রয়েছেন। তিনিই সহস্রাধিক দিব্য নামে নিত্য বন্দিত হন আসমুদ্র হিমাচলের শত সহস্র দেবালয়ে ও ভক্তদের হৃদয়মন্দিরে। সনাতন (হিন্দু) ধর্ম একেশ্বরবাদী হলেও সত্যদ্রষ্টা মুনিঋষিগণ তাঁদের হৃদয়বেদিতে অভিষিক্ত করেছেন বিভিন্ন সাকার বিগ্রহে কিংবা লিঙ্গমূর্তিকে। উপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' অর্থাৎ নির্বিকার অদ্বিতীয় শিব (চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা) রূপে, আবার সশক্তিকে প্রকাশে বর্ণিত করা হয়েছে, 'তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্' পরমদেবতারূপে। প্রকৃতপক্ষে 'শিব' শব্দটি হল পরম মঙ্গলের পরিচায়ক। তিনিই আবার সর্বসংহারকারী ধ্বংসের দেবতা রুদ্ররূপেও বন্দিত হয়েছেন বেদ-উপনিষদে। শিবের এক হাজার আট নামের মধ্যে রুদ্র নামটি বিশেষ নিরিখে মানুষই অভিহিত করেছে। যজুর্বেদের মহীধর ভাষ্যে আছে, ''যিনি সত্যনিষ্ঠকে জ্ঞানদান করেন, কিন্তু পাপীগণকে দুঃখভোগের মাধ্যমে ক্রন্দন করান, তিনিই রুদ্র।'' রবণং রুৎ জ্ঞানং...রোদয়তি রুদ্রঃ।" মানুষ তখনই বিশেষ অনুভূতি দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছে, অলক্ষ্যে বিরাজমান এক নিষ্ঠুর ভয়ংকর দেবতাকে। যাকে তুষ্ট করলে আধিদৈবিক দুর্যোগগুলি থেকে রক্ষা পাওয়া হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু চেতনার ক্রমবিকাশে, পরিণত মননে ক্রমে তাঁরা অনুভব করেছে এই অদৃশ্য সত্তার আর একটি পরিচয়ও আছে। ধ্বংসেরই অদৃষ্ট নিয়ন্তার কর্মধারার বাহ্যিক প্রকাশের অন্তরালেই রয়েছে নতুন সৃষ্টির উদ্বোধন প্রক্রিয়া....ঠিক যেন সেই "এতো যে ভীষণ তবু তারে হেরি ধরায় ধরে না হর্ষ, এরই মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ।" অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টির বীজ। প্রলয়ান্তে যে নবীন সৃষ্টির ধারা, সেটি তো ধ্বংসের মধ্য দিয়েই উন্মিষিত হয়। সুতরাং, ধ্বংস ও সৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রলয়ের উৎস যিনি, সৃষ্টির উৎসও অলক্ষ্যে অবশ্যই তিনি। তাই পালনও তাঁর দ্বারাই হয়ে থাকে। কারণ সৃষ্ট বস্তু মাত্রই যেমন আপাতভাবে তাঁর দ্বারাই পালিত হচ্ছে, তেমনই প্রকৃতপক্ষে সময়ের মাত্রা ধরে সেটিও ধ্বংসের দিকেই ক্রমশ এগিয়ে যায়। কোনও বস্তু সৃষ্ট হলেও তার ক্ষয় হওয়াটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাই সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা ও লয়কর্তাকে আলাদা করা যায় না। তাই তাঁর রূপের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের তিন কর্তা ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও মহেশ্বর। মহাভারতে যেমন তাঁর সৌম্য শান্তরূপের বর্ণনা আছে, তেমনই আছে উগ্ররূপেরও। সৌম্যরূপের বর্ণনায় আছে, তিনি চন্দ্রশোভিত জটাযুক্ত প্রসন্নবদন, মৃগচর্মে বস্ত্রাবৃত অভয়প্রদানকারী।

কথিত আছে রুদ্রের এই উগ্ররূপটি দেখেছিলেন একমাত্র অশ্বত্থামা। গভীর রাতে ঘুমন্ত পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যা করার জন্য তিনি যখন পাণ্ডবদের শিবিরদ্বারে কাপুরুষের মতো উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি এক অতিকায় ভয়ানক দেবমূর্তিকে দণ্ডায়মান দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। সেই অতিকায় তীব্র দীপ্তি-সমন্বিত পুরুষের পরিধানে ছিল রক্তাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, কৃষ্ণাজিন ও কণ্ঠে নাগোপবীত। তাঁর দেহাঙ্গ অগ্নিমুখ সর্প দ্বারা বেষ্টিত ছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে, বিগ্রহ নির্মাণ করেই অশ্বত্থামা শিব পূজা করতেন। সুতরাং মহাভারতীয় যুগ থেকেই মূর্তি গড়ে শিবপুজোর প্রচলন ছিল। অশ্বত্থামার পূজিত শিববিগ্রহ হলেন 'পঞ্চানন'। সাকাররূপে শিবের পঞ্চানন বিগ্রহের

ধ্যানমন্ত্রে আছে, ''পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং''। শিবের এই পাঁচটি মুখের নাম উল্লিখিত রয়েছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। এই নামগুলি হল–সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। নির্বাণতন্ত্রের মতে, 'সদ্যোজাত' মুখটি শুদ্ধস্ফটিকের মতো শুক্লবর্ণ–সেটি পশ্চিমে, 'বামদেব' পীতবর্ণ সৌম্য মনোহর–সেটি উত্তরে, 'অঘোর' কৃষ্ণবর্ণ ভয়ংকর–সেটি দক্ষিণে; 'তৎপুরুষ' রক্তবর্ণ দিব্য মনোরম–সেটি পূর্বে; এবং 'ঈশান' শ্যামল সর্বদেব-স্বরূপ শিব সেটি উর্ধ্বে। কথিত আছে, শিবের এই পঞ্চমুখ থেকেই ২৮টি আগম (তন্ত্র) রচিত হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে, স্বয়ং শিবের পঞ্চমুখ থেকে 'পঞ্চ আম্নায়' [চতুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ (ভেষজ বিদ্যা)] প্রকাশিত হয়েছে। কালক্রমে অগ্নি ও ডমরুধারী প্রলয়নৃত্যরত নটরাজরূপী শিবের অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে নান্দনিক শিল্পের বহুমুখী প্রসার। বস্তুত ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যচর্চার সুমহান ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে শৈব-সংস্কৃতির ভূমিকা। নৃত্যে তান্ডব নৃত্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে যেটি প্রথম নেচেছিলেন নটরাজ সতীর দেহ নিয়ে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রথম পাঁচটি রাগের রচয়িতা স্বয়ং মহাদেব। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে ডমরু, বীণা শিবের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র। শুধু পঞ্চানন, রুদ্র বা শিবরূপেই নয়, বিভিন্ন মূর্তিতে এবং বিভিন্ন নামে যুগ যুগ ধরে তিনি আরাধিত। কিন্তু তাঁর যে প্রতীকী রূপটি পুরাকাল থেকে মহাপূজ্যরূপে সমাদৃত, সেটি হল তাঁর লিঙ্গরূপ।শাস্ত্রবচনে লিঙ্গের সংজ্ঞায় আছে–''লীয়তে গম্যতেযত্র যেন সর্বং চরাচরম্। তদেব লিঙ্গং ইত্যুক্তং লিঙ্গ তত্ত্ব পরায়ণৈঃ॥'' অর্থাৎ, নিখিল বিশ্ব চরাচর যাঁকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়ে ক্রিয়াশীল হয় এবং শেষে যাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায় সেই অস্তিত্বই 'লিঙ্গ'। আবার ''যস্মিন সর্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদাইব।'' সমুদ্রে যেমন উত্তাল ঢেউয়ে বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়ে পরক্ষণেই আবার সেখানেই লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনই সবই ব্যাপ্তিস্বরূপ শিব-অস্তিত্বের মধ্যেই উৎপন্ন হয়ে আবার সেইখানেই লয়প্রাপ্ত হয়। তাই সর্বভূতের সৃষ্টি ও লয়স্থানরূপে লিঙ্গপ্রতীকে শিব আরাধিত হন।

প্রধানত দুই রূপে শিবলিঙ্গের প্রকাশ ঘটে থাকে। প্রথমটি প্রকৃতিজাত 'স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ' যা পৃথিবীর ভূমি ভেদ করে উত্থিত। অপরটি মনুষ্য দ্বারা নির্মিতধাতব, প্রস্তর কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট লিঙ্গ। এই দুটি ছাড়াও বাণলিঙ্গ এবং পঞ্চভূতাত্মক লিঙ্গ আছে; তেমন ক্ষিতিলিঙ্গ (শর্ব), জললিঙ্গ (ভব), অগ্নিলিঙ্গ (রুদ্র), বায়ুলিঙ্গ (উগ্র) ও আকাশলিঙ্গ (ভীম)। প্রতিটি শিবলিঙ্গেরই একটি পীঠিকা বা 'আসন' থাকে। স্কন্দপুরাণে আছে,–''আকাশংলিঙ্গ নিত্যাহুঃ। পৃথিবী তস্য পীঠিকা।'' অর্থাৎ আকাশও একটি লিঙ্গ যার পীঠিকা পৃথিবীই। বস্তুত স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ মাত্রেরই আসন বা পীঠিকা এই পৃথিবী। মানুষের দ্বারা নির্মিত লিঙ্গগুলির পীঠ উত্তরমুখী করে স্থাপিত হয়। এই পীঠিকাকে গৌরীপীঠ বা গৌরীপট্টও বলা হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব লিঙ্গ অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের নামে পাঁচটি শিবলিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি তীর্থে আছে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠেও পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঠাকুরের কথায়, অখণ্ড তত্ত্ব যদি হন অগ্নি, তাহলে আলো হল তাঁর চৈতন্য আর দহনক্ষমতা হল তাঁর শক্তি। তিনি যদি হন সাগর, তবে জল হল তাঁর চৈতন্যস্বরূপ আর ঢেউরূপে প্রবহমানতা হলতাঁর শক্তি-পরিচয়। এই অখণ্ডসত্তা চৈতন্যরূপে যেমন সর্বশক্তিমান, তেমনই শক্তিরূপে চৈতন্যস্বরূপিণী। অর্থাৎ চৈতন্য ও শক্তি অভেদ। একক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্তার নিত্য স্থিতিশীল দিকটি যেমন 'ব্রহ্মচৈতন্য' বা শিবস্বরূপ, তেমনই নিত্যগতিশীল দিকটি ব্রহ্মশক্তি। এই হল অখণ্ড শক্তিব্রহ্মবাদ বা শিব-শক্তি তত্ত্বের মূলকথা। আর 'বাণলিঙ্গ' হল ক্ষুদ্রাকার মসৃণগাত্রের শিলাপিণ্ড যা নর্মদা নদীতে পাওয়া যায়। শিবভক্ত বাণাসুরের নামে পরিচায়িত এই লিঙ্গ একাদশ প্রকারের হয়ে থাকে। এই

বাণলিঙ্গগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় তদুপযোগী আয়তনের ধাতব পীঠিকা নির্মাণ করে, যেটি শুধু পূজাকালেই ব্যবহার্য। এই প্রকৃতির বিস্ময় এই বাণলিঙ্গ সৃষ্টি হত ওঁকারেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরের অনতিদূরে নর্মদার কোলে ধাবরি কুণ্ডে। মামলেশ্বর বাঁধ নির্মাণের সময় এই প্রকৃতির বিস্ময় ধাবরি কুণ্ডটি বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে বাণলিঙ্গের সৃষ্টি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। আর মৃত্তিকানির্মিত শিবলিঙ্গ প্রতিবার পূজাকালে নির্মাণ করে পূজান্তে বিসর্জন দিয়ে দিতে হয়।

যে কোনও শিবলিঙ্গেরই তিনটি ভাগ থাকে। নিম্নাংশকে 'ব্রহ্মা-পীঠ', মধ্যেরটিকে 'বিষ্ণু-পিঠ' এবং উপরিভাগটিকে 'শিব-পীঠ' নামে পরিচিত। লিঙ্গরূপী মহাদেবকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের একশত হস্ত পরিমিতস্থানকে 'শিবক্ষেত্র' রূপে গণ্য করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতভূমির বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত স্বয়ম্ভূ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গকে বিশেষ 'শিবক্ষেত্র' রূপে মহাতীর্থ মর্যাদায় মান্য করা হয়। তার মধ্যে সমুদ্রতীরে দুটি (সোমনাথ, রামেশ্বর), নদীতীরে তিনটি (বিশ্বেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, মহাকাল), পর্বতে চারটি (কেদারনাথ, মল্লিকার্জুন, ওংকারেশ্বর বা অমলেশ্বর, ভীমাশঙ্কর) এবং সমতলে তিনটি (বৈদ্যনাথ, ঘৃষ্ণেশ্বর ও নাগেশ্বর) জ্যোতির্লিঙ্গ বিরাজমান। এছাড়াও হিমালয়ের গহনে রয়েছে পঞ্চকেদার শিব। এই জগৎরূপটি দশাগতভাবে নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকাশের হলেও এটির আধাররূপ চৈতন্যস্বরূপের কোনও পরিবর্তন নেই। জাগতিক প্রকাশগত ভাবে যে ভেদমূলক অনন্ত নামরূপ সবই সেই অরূপ সত্তারই অন্তর্গত আপেক্ষিক বিকাশপ্রবাহ। তিনিই এক এবং অদ্বিতীয়ম্। তিনিই আমাদের সৃষ্টি, রক্ষা, গড়ে তোলেন আবার প্রয়োজনে লয় করেন। তাঁর পুজোয় কোনও আড়ম্বর নেই। বেলপাতা, ধুতরোফুল আর গঙ্গাজল। এতেই তিনি তুষ্ট।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে-তিন প্রধান দেবতার (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা মহাদেব) অন্যতম। ইনি স্বয়ম্ভূ। ইনি ধ্বংসের অধিকর্তা। এঁর প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। ধনুকের নাম পিনাক। ইনি বিশ্ব ধ্বংসকারী পাশুপাত অস্ত্রের অধিকারী। মহাপ্রলয়কালে ইনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংসের সূচনা করেন। ইনি মহাযোগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নির্গুণ ধ্যানের প্রতীক। ইনি রক্তমাখা বাঘছাল নিম্নাঙ্গে ধারণ করেন, কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। তবে কখনো কখনো কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া উত্তরীয় হিসাবে উর্ধ্বাঙ্গে পরিধান করেন। এঁর শরীর ভস্ম দ্বারা আবৃত। মাথায় বিশাল জটা। কপালের নিম্নাংশে তৃতীয় নেত্র, উধ্বাংশে অর্ধচন্দ্র ও কণ্ঠে সাপ ও কঙ্কাল মালা। ইনি কঠোর তপস্যার দ্বারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। হিমালয়ের কৈলাসে ইনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় বাস করেন। কুবের এঁর সম্পদ রক্ষা করেন। এঁর স্ত্রী সতী [দুর্গা]। গঙ্গাও তাঁর স্ত্রী ছিলেন বলে অন্যত্র জানা যায়। তাঁর দুই পুত্রের নাম কার্তিক, গণেশ এবং দুই কন্যার নাম লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এঁর বাহন বৃষ ও সহচর নন্দী ও ভৃঙ্গী।

ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে তাচ্ছিল্য করায়, ইনি নখ দিয়ে ব্রহ্মার একটি মাথা বিচ্ছিন্ন করেন। সেই থেকে ব্রহ্মার পাঁচ মাথার পরিবর্তে চারটি মাথা দাঁড়ায়। ইনি সকল দেবতা দ্বারা পূজিত হন। মহাভারতের মতে ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত সবাই তাঁর পূজা করেন।

পৌরাণিক কাহিনীতে ইনি বিবিধ নামে পরিচিত। এঁর আদি নাম রুদ্র। বেদে রুদ্রের রূপ বর্ণনায় দেখা যায়- ইনি ধ্বংসকারী শক্তি, মর্তে ভয়ঙ্কর বৃষের মতো আর আকাশে লোহিত বরাহের মতো। ইনি বিদ্বান, দেবতাদের কর্মস্রষ্টা ও স্বাক্ষী। ইনি মানুষের রোগ-শোকের কারণ। একই সাথে ইনি যখন ভয়ানক তখন রুদ্র, আর যখন

কল্যাণকর তখন শিব। মহাকালরূপী রুদ্র সংহারকারক। প্রলয় শেষে ধ্বংসের মধ্য থেকেই তাঁর উৎপত্তি ঘটে। সে কারণে ইনি শিব, শঙ্কর বা ভৈরব নামে চিহ্নিত। জনন শক্তির পরিচায়ক হিসাবে শিবলিঙ্গ। এর সাথে যোনি প্রতীক যুক্ত হয়ে প্রজনন বা সৃষ্টিশক্তিরূপে হিন্দু ধর্মে পূজিত হয়। ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয়েরই কারণ বলে ইনি ঈশ্বর। ইনি অল্পে সন্তুষ্ট হন বলে- এঁর নাম আশুতোষ। পশুদের অধিপতি বলে ইনি পশুপতি নামে খ্যাত। সমুদ্র মন্থন করার পর, উত্থিত অমৃত দেবতারা গ্রহণ করার পর, অসুররা পুনরায় তা মন্থন করে। এই অতিরিক্ত সমুদ্র মন্থনজনীত কারণে হলাহল নামক বিষ উত্থিত হয়। এর ফলে সমগ্র চরাচরের প্রাণীকূল বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। এই বিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবতারা মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, মহাদেব উক্ত বিষ শোষণ করেন। বিষের প্রভাবে তাঁর কণ্ঠ নীল বর্ণ ধারণ করেছিল বলে ইনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হন। দক্ষের কন্যা সতী'র সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মহাদেব দক্ষকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে নি বিবেচনা করে ইনি ক্রমে ক্রমে মহাদেবের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন। সতীর বিবাহের এক বৎসর পর, দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞে দক্ষ মহাদেব ও সতী কাউকেই নিমন্ত্রণ করলেন না। সতী নারদের মুখে এই যজ্ঞের কথা জানতে পেরে অযাচিতভাবে যজ্ঞে যাবার উদ্যোগ নেন। মহাদেব এই যাত্রায় সতীকে বাধা দেন। এতে সতী ক্রুদ্ধ হয়ে–তাঁর মহামায়ার দশটি রূপ প্রদর্শন করে মহাদেবকে বিভ্রান্ত করেন। এই রূপ দশটি ছিল- কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামূখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী। মহাদেব শেষ পর্যন্ত সতীকে দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু যজ্ঞস্থলে দক্ষ মহাদেবের নিন্দা করলে- সতী পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। সতীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ মহাদেব নিজের জটা ছিন্ন করলে, সেই জটা থেকে বীরভদ্র নামক এক শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। এরপর এই বীরভদ্র মহাদেবের অন্যান্য অনুচরসহ দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হন। মহাদেবের আদেশে তাঁর অনুচরেরা যজ্ঞানুষ্ঠান পণ্ড করে দেন এবং দক্ষের মুণ্ডুচ্ছেদ করেন। এরপর দক্ষের মৃত্যুতে আকুল হয়ে দক্ষপত্নী বীরিণী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। এরপর ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব দক্ষের ঘাড়ে একটি ছাগলের মুণ্ড স্থাপন করেন। কালিকা পুরাণের মতে–সতীর দেহত্যাগের পর, মহাদেব তীব্র রোদন করতে থাকলে, তাঁর চোখ থেকে বিপুল পরিমাণ জলরাশি নির্গত হতে থাকে। এই জলরাশি পৃথিবীতে পতিত হলে–ভূমণ্ডল দগ্ধ হবে। এই কারণে দেবতাদের অনুরোধে শনি এই জল গ্রহণ করেন। কিন্তু শনি এই জল ধারণে অসমর্থ হয়ে- ইনি তা জলধার নামক পর্বতে নিক্ষেপ করেন। উক্ত জলের তেজে, ওই পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং এই জল পূর্ব–সাগরের পতিত হয়। কিন্তু সাগর এই জল ধারণে অসমর্থ হলে–তা সাগরের মধ্যভাগ ভেদ করে সাগরের পূর্বকূলে উপনীত হয়। এরপর এই জলরাশি পুষ্করদ্বীপের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়। জলাধার পর্বত ভেদ এবং সাগরের সংস্পর্শে আসার কারণে–এই জলের তেজ অনেকাংশে প্রশমিত হয়। ফলে এই জল পৃথিবী ভেদ করতে পারে নাই। এই জলরাশি বৈতরণী নামে যমপুরীর প্রবেশদ্বারে সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত। এর বিস্তার দুই যোজন। [৯-৩৭। অষ্টাদশোহধ্যায়। কালিকা পুরাণ]

এরপর মহাদেব সতীর শোকে তাঁর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন। এর ফলে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হলে, বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা সতীদেহকে একান্নভাগে বিভক্ত করে দেন। এই একান্নটি খণ্ড ভারতের বিভিন্নস্থানে পতিত হয়। ফলে পতিত প্রতিটি খণ্ড থেকে এক একটি মহাপীঠ উৎপন্ন হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রতিটি মহাপীঠকে পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন।

সতীর দেহাংশ যে সকল স্থানে পতিত হয়েছিল, মহাদেব সেখানে লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হলেন। বিশেষ করে সতীর মস্তিষ্ক পতিতস্থানে মহাদেব শোকাহত অবস্থায় উপবেশন করেন। এই সময় দেবতারা সেখানে উপস্থিত হলে–মহাদেব লজ্জায় প্রস্তর-লিঙ্গে পরিণত হন। পরে দেবতারা এই লিঙ্গরূপী মহাদেবকে পূজা করতে থাকেন। হিন্দু পুরাণে মহাদেবের এই লিঙ্গপ্রতীক শিবলিঙ্গ নামে পরিচিত।

কথিত আছে- দেবতাদের জয় করার জন্য তারকাসুর এক হাজার বৎসর তপস্যা করেন। কিন্তু তিনি এর ফলে কোন বর লাভে ব্যর্থ হলেও–তাঁর মাথা থেকে এক ধরণের তেজ নিসৃত হতে থাকে। এই তেজ দেবতাদের দগ্ধ করতে থাকলে–দেবতারা ব্রহ্মার শরাণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মা তারকাসুরের কাছে এসে বর প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন। তারকাসুর ব্রহ্মার কাছে দুটি বর প্রার্থনা করেন। বর দুটি হলো- তাঁর চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না এবং মহাদেবের ঔরসজাত পুত্রের হাতেই তাঁর মৃত্যু হবে। পরে মহাদেবের পুত্র কার্তিকেয় এই অসুরকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এরপর তারকাসুরের তিন পুত্র- তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীকে হত্যা করে ত্রিপুরারি নামে পরিচিত হন।

কার্তিকেয়-এর জন্মবৃত্তান্তের সাথে মহাদেবের সাথে পার্বতীর বিবাহঘটিত একটি উপখ্যান আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে–সতী দেহত্যাগের পর হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মহাদেবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা শুরু করেন। এই সময় মহাদেব গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। পার্বতী সে কথা জানতে পেরে প্রতিদিন তাঁর পূজা করতে থাকেন। এদিকে তারকাসুর নামক এক অসুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে, দেবতাদের উপর পীড়ন শুরু করলে–দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা দেবতাদের জানান যে, শুধু মাত্র মহাদেবের ঔরসজাত সন্তানই এই অসুরকে হত্যা করতে পারবেন। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের জন্য, অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে কামদেব হিমালয়ে গিয়ে তাঁর কন্দর্প বাণ নিক্ষেপ করেন। ফলে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়। এতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত করে কামকে ভস্মীভূত করেন। এরপরে মহাদেব অনুতপ্ত হয়ে–কামদেবকে প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন। মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে ভস্মীভূত হয়ে ইনি অঙ্গহীন হয়েছিলেন বলে–এর অপর নাম অনঙ্গ।

তারকাসুরকে হত্যা করার জন্য একটি পুত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে, মহাদেব পার্বতীর সাথে মিলিত হন। কিন্তু মহাদেবের বীর্য গ্রহণে পার্বতী অসমর্থা দেখে তিনি তা, অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। অগ্নিও উক্ত বীর্য গ্রহণে অক্ষম ছিলেন বিধায় তা গঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিলেন। গঙ্গা আবার তা শরবনে নিক্ষেপ করলে একটি সুদর্শন বালকের সৃষ্টি হয়। মহাদেব তাঁর বীর্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেন বলে–এই বালকের নাম অগ্নিভু রাখা হয়। কৃত্তিকারা এই বালককে স্তন্যদানে প্রতিপালন করেন। কৃত্তিকাদের স্তনদানের কারণে ইনি তাঁদের পুত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং সেই সূত্রে ইনি কার্তিকেয় নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। পরে পার্বতী বিষয়টি অবগত হয়ে কার্তিকেয়কে তাঁর কাছে নিয়ে যান।

তাঁর তৃতীয় নয়নের উৎপত্তি নিয়ে একটি গল্প আছে। পার্বতী একবার পরিহাসছলে শিবের দুই চোখ হাত দিয়ে আবৃত করলে–সমগ্র চরাচর অন্ধকার হয়ে যায়। জগতকে আলোকিত করার জন্য তাঁর তৃতীয় নয়নের উদ্ভব ঘটে। এই তৃতীয় নয়নের জ্যোতিতে হিমালয় ধ্বংস হয়ে গেলে–পার্বতীর অনুরোধে তা আবার পুনস্থাপিত হয়।

তবে এটি প্রক্ষিপ্ত কাহিনী বলেই মনে হয়। কারণ–পার্বতীর সাথে শিবের বিবাহের পূর্বেই তাঁর তৃতীয় নয়নের তেজে কামদেব ভস্মীভূত হন।

ইনি তাঁর স্ত্রী পার্বতী সহযোগে উত্তেজক নৃত্য পরিবেশন করলে তাকে তাণ্ডবনৃত্য বলা হয়। অন্য মতে-বিশ্ব ধ্বংসের সময় ইনি যে নৃত্য করে থাকেন তাই তাণ্ডবনৃত্য। ইনি গজাসুর ও কালাসুরকে হত্যা করার পর তাণ্ডবনৃত্য করেছিলেন। ইনি নৃত্যকলার আদি কারণ বলে–নটরাজ নামে খ্যাত।

অন্ধক নামক দৈত্যকে নারদ কৌশলে মন্দর পর্বতে নিয়ে যান। সেখানে মহাদেব পার্বতীর সাথে আমোদ-প্রমোদে রত ছিলেন। অন্ধক সেখানে উপস্থিত হলে, মহাদেব শূলের আঘাতে অন্ধককে হত্যা করেন। এই কারণে ইনি যে সকল নাম প্রাপ্ত হন, তা হলো- অন্ধকান্তক (অন্ধকের অন্তক), অন্ধকরিপু (অন্ধকের রিপু), অন্ধকারি (অন্ধকের অরি), অন্ধকাসুহৃদ (অন্ধকের অসুহৃদ)।

কালিকা পুরাণ মতে- দুন্দুভি নামক জনৈক দৈতরাজ, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে–দেবতাদের পরাজিত করেছিলেন। কৈলাসে মহাদেব ও পার্বতীকে [দুর্গা] একত্রে ভ্রমণ করার সময় পার্বতীকে দেখে মোহিত হন, এবং তাঁকে অধিকার করার চেষ্টা করলে- মহাদেবের অগ্নিদৃষ্টিতে ইনি ভস্মীভূত করেন। [চতুর্থোহধ্যায়, কালিকাপুরাণ]

পুরাণ মতে–ঘটনাক্রমে দেবর্ষি নারদ শুদ্ধ সংগীত শোনানোর জন্য মহাদেবকে অনুরোধ করলে, মহাদেব জানান যে, প্রকৃষ্ঠ শ্রোতা ছাড়া তিনি গান শোনাবেন না। পরে নারদ মহাদেবের পরামর্শ অনুসারে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-কে অনুরোধ করে আসরে নিয়ে আসেন। এই সঙ্গীতের মর্ম ব্রহ্মা বুঝতে অক্ষম হন। কিন্তু বিষ্ণু কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে ইনি আংশিক দ্রবীভূত হন। বিষ্ণুর এই দ্রবীভূত অংশ ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে ধারণ করেন। বিষ্ণুর এই দ্রবীভূত অংশই গঙ্গা নামে খ্যাত হয়।

পরবর্তী সময়ে সগর রাজার পুত্রদের উদ্ধারের জন্য, ভগীরথ কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার অনুমতি পান। কিন্তু গঙ্গার অবতরণকালে পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে,–এই আশংকায় গঙ্গা ভগীরথের কাছে একটি অবলম্বন প্রার্থনা করেন। ভগীরথ উপযুক্ত অবলম্বনের জন্য মহাদেবকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব গঙ্গার স্রোতধারাকে ধারণ করার জন্য তাঁর জটা বিছিয়ে দেন। এরপর গঙ্গা ব্রহ্মার আদেশে মহাদেবের জটা অবলম্বন করে নেমে আসেন। মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে ত্যাগ করলে গঙ্গা-পশ্চিমে হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী–পূর্বে সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু ও ভগীরথের পশ্চাতে এক স্রোত হিসাবে প্রবাহিত হন।

এঁর বরে শক্তিশালী হয়ে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি অসুর ক্ষমতাবান হয়ে অত্যাচারী হয়ে উঠলে ইন্দ্র, কৃষ্ণের হাতে এঁরা নিহত হন। পরশুরাম এঁর কাছে অস্ত্র শিক্ষা করে অজেয় হন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ইনি কিরাত বেশে তাঁর সাথে কৃত্রিম যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অর্জুনের বিক্রম দেখে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাশুপাত অস্ত্র প্রদান করেন।

একবার কৈলাসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাবণের রথের গতি রুদ্ধ হয়। এই সময় মহাদেবের অনুচর নন্দী রাবণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এখানে হর-পার্বতী আছেন। নন্দীর বানর মুখ দেখে রাবণ অবজ্ঞায় হাস্য

করলে, নন্দী অভিশাপ দেন যে, তার মতো বানরদের হাতেই রাবণ বংশ ধ্বংস হবে। রাবণ এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে কৈলাস উত্তোলন করতে থাকলে, পার্বতী চঞ্চল হয়ে উঠেন। তখন মহাদেব পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে রাবণকে চেপে ধরেন। রাবণ সে চাপ সহ্য করতে না পেরে প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকেন। পরে মহাদেবের স্তব করে মুক্তি পান। মহাদেব স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে রাবণকে চন্দ্রহাস নামে একটি দীপ্ত খড়্গ উপহার দেন।

ইনি মহর্ষি অত্রির কাছে যোগশিক্ষা গ্রহণ করেন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে হত্যা করেন। তাঁর পরম ভক্ত অসুর বাণকে রক্ষা করা সত্তেও কৃষ্ণের হাতে বাণ পরাজিত হন। কিন্তু কৃষ্ণের দয়ায় বাণ মহাকাল নামে মহাদেবের অনুচরদের অন্তর্ভূক্ত হন।

শাস্ত্রে বর্ণিত আগমতন্ত্র, নিগম তন্ত্র, নির্বাণ তন্ত্র গুরুগীতা, অমরকথা অধিকাংশই শিব পার্বতীকে বলছেন। তন্ত্রের আদি পুরুষ শিব, শিব আবার শক্তি ছাড়া বিরাজ করেন না আর প্রতি জীবের মধ্যে বর্তমান শিব। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যে ষটচক্র, প্রতিটি চক্রের মধ্যে শিব ও শক্তি অবস্থান করেন, সাধনায় এঁদের মিলনে চেতনা কুলকুন্ডলিনী থেকে উর্দ্ধগামী হয়ে আজ্ঞাচক্রে মিশে যায়। সহস্রারে যে চেতনা মিলিত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তা আসলে পরমশিব ও পরাশক্তির (পরমাপ্রকৃতির) মিলন। এই শিবশক্তির মিলন হলে জীবকে আর জীবন মৃত্যুর চক্রে থাকতে হয় না, তাঁর শিবাবস্থা প্রাপ্তি হয়, দেহে থাকলে সে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাত্মা হিসেবে। এমন মহাত্মারাই শিবকল্প যোগী হিসেবে লোককল্যাণে থেকে যান। যেটুকু লিখতে সমর্থ হলাম সবটুকুই আমার শিবস্বরূপ গুরু কৃপায় যাঁর আশ্রয়ে না এলে এই দুরূহ ধ্যানগম্য বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ আমার অবগত হত না।

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহী তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াত ওঁ। সত্যম শিবম সুন্দরম।

শিবনামাবল্যষ্টকম।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষঃ॥১॥
হে পার্বতীহৃদযবল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥২॥
হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র
লোকেশ শেষবলয প্রমথেশ শর্ব।
হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥৩॥
হে বিশ্বনাথ শিৱ শঙ্কর দেৱদেব
গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥৪॥
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ
বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্বজ্ঞ সর্বহৃদ হৃদয়েকনিৱাস নাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥৫॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগ নৃকপালকলাপমাল সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥৬॥
কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে
হে মৃত্যুংজয ত্রিনযন ত্রিজগন্নিবাস।
নারাযণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥৭॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্ধু করুণাময দীনবন্ধো সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥৮॥
গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়
পঞ্চাননায় শরণাগতরক্ষকায়।
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং শিবনামাবল্যষ্টকং সংপূর্ণম॥

দক্ষিণামূর্তি শিব

lord shiva

লিঙ্গমূর্তি

অর্ধনারীশ্বর

BANGLADARSHAN.COM

অর্ধনারীশ্বর

গৃহী শিব

নাটরাজ

পঞ্চানন শিব

ত্রিপুরারী শিব

অষ্টমূর্তি শিব

বিভিন্ন শিব মূর্তি

BANGLADARSHAN.COM

॥চণ্ডী॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী বৈদিক ও তান্ত্রিক অনুধ্যানে:

“প্রভাতে য স্মরণীততং দুর্গার্গা দুর্গেক্ষর দ্বয়ম,
আপদ শান্তি নাশ্যন্তি তমো সূর্যোদয়ে যথা।”

প্রভাতে উঠে যে দুই অক্ষর বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে, সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার নাশ হয় সেইরকম তার সমস্ত আপদ কেটে যায়।

দুর্গম পরিস্থিতি থেকে যিনি ত্রাণ করেন তিনিই দুর্গা, জীবের দুর্গতি যিনি নাশ করেন তিনিই দুর্গা, দুর্গতকে যিনি আশ্রয় প্রদান করেন তিনিই দুর্গা। তাই শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে উদ্ধারকল্পে যখন রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি অকালবোধন করে দেবীকে আবাহন করেন এবং দেবীর আশীর্বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে একই কর্মে অর্জুন প্রবৃত্ত হন, অর্জুনকে দুর্গার স্তব করার উপদেশ দেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে অর্জুনের সেই স্তব আছে, যে স্তবে দেবীকে তুষ্ট করে অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং জয়যুক্ত হন। আদ্যাস্তবে বলে আদি শক্তি আদ্যা মাতা নিয়মিত তাঁর স্তব পাঠ করলে বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন, আর শ্রীশ্রীচণ্ডী বলে, “যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা” অর্থাৎ আদি পুরুষ বিষ্ণু আর আদিশক্তি আদিত্যবরণী দুর্গা একে ওপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আসলে স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ যখনই বিপদে পড়ে, তখনি দৈবের সহায়তা কল্পে হয় শক্তির বা সেই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী হিরণ্যবর্ণ পুরুষ বিষ্ণুর দুয়ারে হাত পাতে তাঁদের কৃপায় সেই বিপদ থেকে তারণ পেতে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশ্রীচণ্ডী বলে দেবী দুর্গা ত্রিগুণাত্মিকা, সেই ত্রিগুণ সত্ত্ব, রজঃ আর তমোর আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায় দুর্গা মূর্তিতে, যেখানে অসুর হল তমোগুণের প্রতীক, সিংহ হল রজঃ গুণের প্রতীক আর দেবী দূর্গা হলেন সত্ত্ব গুণের প্রতীক। রজোগুণকে সঙ্গে নিয়ে সত্ত্বগুণা দেবী তমোগুণকে নাশ করছেন। অর্গলা মানে আগল, কীলক মানে খিল বা গজাল যা দিয়ে অর্গলটি আটকানো আছে। চণ্ডী রহস্য অতি দুরূহ, দুর্জ্ঞেয়, সেই রহস্য জানতে হলে আগে অর্গলাস্তোত্র আর কীলক স্তব পড়তে হবে সেই রহস্যের অর্গল ও সেই অর্গলের গজালটি সরিয়ে অর্গল মুক্ত করতে হবে সেই রহস্য।

“দুর্গতি নাশিনী দুর্গা বিশ্বমাতা মহেশ্বরী
সংনম্যতে সদা দেবী প্রসীদ জগদম্বিকে।”

দুর্গতিনাশিনী দূর্গা বিশ্বমাতা এবং মহা ঈশ্বরী মহেশানী, তাঁকে সর্বদা প্রণাম করে প্রসন্নতার প্রার্থনা জানাই।

শ্রীশ্রীচন্ডীতে শ্রোতৃগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে জিজ্ঞাসু হয়েছেন–তা কোন আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক সমস্যা নয়, পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের সমস্যায় তাঁরা বিচলিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু এর সমাধান কল্পে আচার্য যে উপদেশ দিয়েছেন তা সর্বতোভাবেই পারমার্থিক। সমস্যা সমাধানে এই দেবাসুরের তাত্ত্বিকরূপ আচার্য, দেবী মহামায়ার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন। চণ্ডীর মূখ্য বর্ণনীয় বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ। চণ্ডীর যুদ্ধ মূলত: সাধকের অন্তরের। চণ্ডীর যুদ্ধ সূক্ষ্মস্তরের–দেবতায় ও অসুরে। সকলের অন্তরে অজ্ঞান-তমঃ আছে–সেটাই অসুর। জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে সেটাই ছন্দোহীনতা বা সুরবিরোধী অসুরভাব, আর উজ্জ্বল জ্ঞানদীপই মহাবিদ্যারূপিণী মহাদেবী। সকল আসুরিক শক্তির ইনি বিনাশকারী। অজ্ঞানতমোরূপ আসুরিকতা বিধ্বংস করতে মহাশক্তি দুর্গা প্রকটিতা। চণ্ডীর মহাদেবী নিখিল ভাস্বর জ্ঞানদীপের সমষ্টিভূতা মূর্তি। সুতরাং গীতার "নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" মন্ত্রের মধ্যে চণ্ডীর অসুরধ্বংসকারী মহাযুদ্ধের রহস্যটি সূত্রাকারে বিরাজিত।

চণ্ডীর যুদ্ধ মনোময় ও বিজ্ঞানভূমিতে স্থিত। অসুরগুলো মনোময় ভূমির বস্তু, মহাদেবী বিজ্ঞানময় ভূমির প্রজ্ঞাঘন শক্তি। এই দু'য়ে যুদ্ধ। চণ্ডীর যুদ্ধ সাধন-সমর। চণ্ডীর কথা যুদ্ধের মধ্যে। চণ্ডীর প্রথম চরিতের প্রথমাংশ ভূমিকা বা ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তুতি। চণ্ডীতে সুরথ রাজা হলেও এখন রাজ্যভ্রষ্ট। রাজ্যচ্যুত রাজা বনে এসেছেন কিন্তু বাণপ্রস্থী হন নি। বনে আশ্রয় নিয়েও বিষন্নচিত্ত। আত্মীয়, স্বজন, রাজপ্রাসাদ, অশ্ব, গজ, পাত্র, অমাত্য সকলের অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তান্বিত। আর বৈশ্য সমাধি, ধনলোভী নিজ স্ত্রী-পুত্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তিনিও বনে এসেছেন। রাজা ও বৈশ্যের বনেই দেখা, তাদের একই অবস্থা। আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েও তাদের প্রতি মমতাকৃষ্ট। তাদের প্রতি অতীব দুঃখার্ত (দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ, চণ্ডী- ১/৪৩)।

BANGLADARSHAN.COM

চণ্ডীতে সুরথ-সমাধির মোহগ্রস্ত ও উদ্ভ্রান্ত মনকে ঋষি প্রশান্ত করেছেন; চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে এবং তাঁদের দ্বারা দেবী মহামায়ার পূজা করিয়ে। সুরথ-সমাধির বাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে মাতৃদর্শনে, আর চণ্ডীর উপদেশের পরিবেশ ঋষির তপোবন। তপোবনের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য- প্রশান্ত শ্রীসম্পন্ন, রমণীয় শান্তরসপ্রধান। চণ্ডীর আলোচ্য বিষয় দেবাসুর-সংগ্রাম-রজোময় ও তমোময়। চণ্ডীর প্রশান্ত ভূমিতে যুদ্ধের অশান্ত বার্তা। চণ্ডীর মধ্যম চরিতে দেবী মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব তত্ত্বতঃ একটি অনুভূতি বিজ্ঞানময় ভূমির- সামগ্রিক দৃষ্টি। বহুত্বে একত্ব, একত্বে বহুত্ব। সমগ্র সত্ত্বাকে একেবারে একত্র একত্বে দর্শন।

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্" একস্থ সমগ্র বিশ্ব। বিশ্বচরাচরের সকলই একদেহে স্থিত, সেটাই অপরোক্ষ দর্শন, বিশ্বরূপ দর্শনের মর্মকথা। চণ্ডীতে মায়ের মহীয়সী স্ত্রীমূর্তির মধ্যে নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহ প্রকটিত। ভিন্ন ভিন্ন দেব শক্তি একই বিশ্বজননীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাঁর বাহুই বিষ্ণু, চরণই ব্রহ্মা, শ্রীবদনই শিব। কেশে যম, নাসিকায় পবন, নয়নে অগ্নি। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আয়ুধগুলো মায়ের শ্রীহস্তে শোভমান। তাই মায়ের দর্শনেই নিখিল দেবতা ও দৈবশক্তির দর্শন পাওয়া যায়। এক স্বরূপে বিশ্বদেবতার দর্শন, এক নিরূপম দর্শন। চণ্ডীতে মাতৃরূপ দর্শনে দেবগণের প্রীতিযুক্ত বিস্ময়। দেবগণ 'পুলকোদ্গামচারুদেহাঃ' আনন্দে। দেবগণ জানেন, মা আমাদের সকল অমঙ্গল নাশ করবেন- তাই উল্লসিত। চণ্ডীতে দেবগণের স্তুতিতে প্রসন্না দেবীর সান্ত্বনা

বাক্য–
“ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥” (১১/৫৫)

– ‘যখনই যখনই দানবের অভ্যুদয়ে জীবগণ এই প্রকারে উৎপীড়িত হবে তখনই তখনই আবির্ভূতা হয়ে শত্রু নাশ করে শান্তি আনয়ন করবো।’ দুর্গার দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত উৎপীড়িত জীবের জন্য দয়া আছে। আমাদের দুঃখ তাঁদের প্রাণে লাগে। ডাকলে শোনেন। প্রয়োজন বোধ করলে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন। অনুগ্রহ করে দুঃখ দূর করেন। চণ্ডীতে মেধা ঋষি মহাদেবীর তত্ত্ব বলেছেন, “যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে” (৫/১৭) -আত্মার স্বরূপ হলো চেতনা বা চৈতন্যস্বরূপতা। ঋষি বললেন, মহাদেবী আছেন সর্বভূতে চেতনারূপে। চণ্ডীতে দেবতাগণ মায়ের স্তবে বলেছেন,
“সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতম্।” (৪/৭)

তুমি সকলের আশ্রয়। এই সমস্ত জগৎ তোমার অংশভূত। দেবীমাহাত্ম্যে মহাদেবী আদ্যা পরমাপ্রকৃতি (পরমা প্রকৃতিরাদ্যা –৪/৭)। কিন্তু এই পরমা প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয় সম্মিলিতা, কারণ মহাদেবী কেবল নিখিল বিকার ও গুণের মূল নন–তিনি চৈতন্যময়ী এবং মাহেশ্বরীও। মহাদেবী প্রকৃতি বলে ত্রিগুণময়ী, আবার পুরুষ বলে ত্রিগুণের দোষের দ্বারা লিপ্ত নন। এরূপ আশ্চর্যজনক তত্ত্ব বলে মহাদেবী হরিহরাদিরও অজ্ঞেয়া।

BANGLADARSHAN.COM

“হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ–
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।” (৪/৫)

তুমি সমস্ত জগতের কারণ। তুমি ত্রিগুণা হয়েও দোষে লিপ্ত নও। হরিহর প্রভৃতিরও তুমি অজ্ঞেয়া। চণ্ডীতে ভগবতী অসুরকে বললেন, “পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥” (১০/৫) –রে দুষ্ট! দেখ্ আমার বিভূতিসকল আমাতেই প্রবেশ করছে। এ বলে আকর্ষণ করলেন। অসুর দেখলো অগণিত মাতৃকামূর্তি দেবীর দেহে প্রবেশ করছে, আর প্রবেশ করে এক হয়ে যাচ্ছে। মা বললেন,

“অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥” (১০/৮)

– ‘আমি ঐশ্বর্য দ্বারা এ যুদ্ধে বহুরূপে যে অবস্থান করছিলাম, তা উপসংহার করলাম। আমি এখন একাই আছি, একাই যুদ্ধ করবো, তুই স্থির হ।’ নিখিল বিভূতি যে এক বস্তুরই বহু প্রকাশ–গীতায় তা সুব্যক্ত, চণ্ডীতে বাস্তবায়িত।

বৈশেষিক দর্শনের ঋষি কণাদ ধর্মের লক্ষণ বলেছেন, "যতো বাহভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।" যা হতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তা-ই ধর্ম। অভ্যুদয় মানে সাংসারিক উন্নতি, যেমন- ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি। নিঃশ্রেয়স মানে নিশ্চিত মঙ্গল। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মের ফল অভ্যুদয়। নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মের ফল নিঃশ্রেয়স। পূর্ণাঙ্গ বৈদিক ধর্মের চণ্ডীর লক্ষ্য নিবদ্ধ।

সুরথ ও সমাধির অর্চনায় মা পরিতুষ্টা হয়ে বললেন, বর চাও। রাজা চাইলেন অবিভ্রংশ রাজ্য। সমাধি চাইলেন তত্ত্বজ্ঞান। যে জ্ঞানের উদয় হলে, মিথ্যা আমি ও আমার নাশ প্রাপ্ত হয়, তা-ই চাইলেন সমাধি। রাজা চাইলেন অভ্যুদয়, বৈশ্য চাইলেন নিঃশ্রেয়স। শ্রীচণ্ডীতে তা প্রকট করে দেখানো হল। সুরথ রাজা ভজনা করেছেন রাজ্যসুখের জন্য, সমাধি বৈশ্য ভজনা করেছেন মুক্তিসুখের জন্য। ভগবতী উভয়কেই বাঞ্ছানুরূপ ফলদান করেছেন।

চণ্ডী গ্রন্থেই প্রবৃত্তি-ধর্ম বা ভোগের কথা এবং নিবৃত্তি-ধর্ম বা ত্যাগের কথা–যোগের কথা দৃষ্ট হয়। চন্ডীতে ভোগ যোগ দু'টি পৃথক বস্তু। ভোগের জন্য ভোগ, ত্যাগের জন্য যোগ। ভোগ চাও ত এক পথ, ত্যাগ চাও ত আলাদা পথ। চণ্ডী দু' হাত বাড়িয়ে এক হাতে ভোগ আরেক হাতে যোগ দিচ্ছেন।

BANGLADARSHAN.COM

চণ্ডী পাঠের পূর্বে অর্গলা স্তোত্র পাঠ করা আবশ্যিক। এ স্তোত্রের "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হেতু অনেকে মনে করেন–চণ্ডীতে কেবল দেহি দেহি রব, কেবল ভোগ আর ভোগের জন্যই প্রার্থনা। এ প্রার্থনায় দ্বিবিধ তাৎপর্য নিহিত আছে। যিনি ভোগাকাঙ্ক্ষী, তাঁর কাছে এক প্রকার অর্থ, যিনি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁর কাছে অন্য প্রকার অর্থ। যিনি ভোগী তিনি দেহের রূপ কামনা করেন, যিনি ত্যাগী তিনি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান জাগিয়ে তুলবার প্রার্থনা করেন। ভোগী লৌকিক যুদ্ধে, মামলা মোকদ্দমায় জয় কামনা করেন, ত্যাগী সাধন-সমরে জয় আকাঙ্ক্ষা করেন। ভোগী চান লৌকিক নাম যশ খ্যাতি, তাই বলেন যশো দেহি। সাধক চান ভগবদ্ভক্ত বলে জগতে কীর্তিত হতে। ভোগার্থী বাঞ্ছা করেন লৌকিক শত্রুর ধ্বংস; তাই বলেন, "দ্বিষো জহি"। ত্যাগী–যোগী চান, সাধন-পথে যে সকল বাধক রয়েছে; সেই কামাদি শত্রুর অবলুপ্তি। ভোগী যেখানে পাঠ করেন–

"ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।" '(হে দেবি,) আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী (অনুকূল আচরণকারিণী) মনোরমা ভার্যা (ভরণীয়া বা স্ত্রী বা ভক্তি) দাও।' এক্ষেত্রে ভোগী ভার্যা অর্থে ভরণীয়া বা স্ত্রী গ্রহণ করে প্রার্থনা করেন, কিন্তু সাধকগণ চিরদিন সেখানে ভার্যা অর্থে ভক্তি ধরেই পাঠ করে থাকেন।

এ ছাড়া মায়ের কাছে কেউ অবনত হয়ে কিছু কামনা করলেই মা তা দেন না। যে বস্তু দিলে একজনের উপকার কিন্তু অন্যের ক্ষতি তা দেন না। যাতে জগতের সকলের উপকার তা-ই মা দেন। তাই তো দেবগণের স্তবে সন্তুষ্টা হয়ে জগজ্জননী বললেন–

“বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥” (১১/৩৭)

‘হে দেবগণ, আমি বরদাত্রী, তোমরা মনে মনে জগতের হিতকর যে ইচ্ছা করছো তা প্রার্থনা করো, এখনই দিচ্ছি।’ সুতরাং মা যে জগতের মঙ্গলময় বর দিবেন, তা নিষ্কাম ভক্তেরও কাম্য। দেবতাগণও বলেছেন–

“ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব। (১১/৩৫)
‘হে স্তবনীয়ে দেবি। ত্রিভুবনবাসী জনগণের জন্য বরদাত্রী হও।’

কেউ কেউ মনে করেন, চণ্ডীতে ভক্তির গন্ধও নেই। এরূপ মনে করা ঠিক নয়। চণ্ডী গ্রন্থও ভক্তিশূন্য নয়। যে অর্গলা-স্তবে “রূপং দেহি জয়ং দেহি” প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে সেই স্তবেই আছে–

“দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েহম্বিকে” (২৪)

BANGLADARSHAN.COM

হে দেবি অম্বিকে, তুমি ভক্তদেরকে অনর্গল আনন্দ দান করে থাকো। ভক্তদেরকে যে কত আনন্দ দান করেন তার প্রমাণ চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণের স্তুতিকালে দৃষ্ট হয়। স্তবপরায়ণ দেবগণের বর্ণনায় ঋষি বলেছেন–
“প্রণতি-নম্রশিরোধরাংসাঃ” “প্রহর্ষপুলকোদ্গাম-চারুদেহাঃ” (৪/২) তাঁরা গ্রীবা ও স্কন্ধ নত করে প্রণাম করে আনন্দে রোমাঞ্চ উদ্গাত হওয়ায় সুন্দর দেহশালী হয়ে মহাদেবীকে স্তব করে ছিলেন। আনন্দ গভীর না হলে পুলক হয় না।

চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্তবের শেষে বলেছেন–
“যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ॥” (৫/৮২)

‘আমরা ভক্তিনম্র হয়ে স্মরণ করলে জগন্মাতা তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ নষ্ট করে থাকেন।’ সবশেষে চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের স্তবে দেবগণ বলেছেন- হে দেবি, মা যেমন পুত্রদের রক্ষা করেন, সেরূপ আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করো।

“পাপেভ্যো নঃ সুতানিব” (১১/২৭)

এ প্রার্থনার মধ্যে প্রীতিপূর্ণ আর্তি বিদ্যমান। পরেই বলেছেন, তোমার যারা আশ্রিত, তাদের আর বিপদ নেই। "ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নাণাং" (১১/২৯)

হৃদয়ে ভক্তি না থাকলে–আশ্রিত, শরণাগত, মুখের কথায় হয় না। তারপর একটি আশ্চর্য সংবাদ বলেছেন–

"ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি" (১১/২৯)

তোমাকে যারা আশ্রয় করে, তারা সকলের আশ্রয় হয়ে থাকে। সকলের বলতে নিখিল বিশ্বের. সকলের। আর এক মন্ত্রে তা স্পষ্টতর করেছেন–

"বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ" (১১/৩৩)

যারা তোমার কাছে ভক্তিভরে বিনম্র, তারা বিশ্বের আশ্রয় হয়ে থাকে। কতখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মাতৃচরণ আশ্রয় করলে সে নিখিল বিশ্বের আশ্রয়স্থল হতে পারে তা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্তবটিতে পুনঃ পুনঃ "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" শত শতবার নমস্কার।

BANGLADARSHAN.COM

চণ্ডী গ্রন্থে মহিষাসুরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে, স্তবে দেবগণ বলেছেন, মহিষাসুর বধকালে তোমার বাইরে নিষ্ঠুরতা থাকলেও "চিত্তে-কৃপা" ছিল। তোমার ভয়ঙ্কর শস্ত্রপ্রভাসমূহের ঝকমকানিতে অসুরদের দৃষ্টি যে নষ্ট হয় নি, তার কারণ তোমার অর্ধ-চন্দ্রযুক্ত বদনখানি তারা দেখতে পেয়েছিল (৪/২০)। তোমার শস্ত্রদ্বারা পবিত্র হয়ে তারা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক, এরূপ মতি নিয়েই তুমি তাদেরকে অস্ত্রাঘাত করেছো। না হলে তো শুধু দৃষ্টি দ্বারাই তাদেরকে ভস্মীভূত করতে পারতে।

"দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোহপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেহতিসাধ্বী॥" (৪/১৯)

করুণাময়ী মহাদেবীও যে হতারিগতিদায়িকা তা এই মন্ত্রে সুব্যক্ত হয়েছে।
দেবী মাহাত্ম্যেও মহাদেবী বলেছেন–

"শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্। (৪/১২)
ন তেষাং দুষ্কৃতৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ॥" (৫/১২)

যে আমার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য ভক্তিসহকারে পাঠ করবে, তার কোন পাপ, বা পাপজনিত বিপদ হবে না। আরও বলেছেন–

“তস্মান্নমৈতন্মাহাত্মং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥” (১২/৭)

সে জন্য, আমার এই মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্ত হয়ে ভক্তিসহকারে সকলের পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত। তা-ই উৎকৃষ্ট স্বস্ত্যয়ন। আরও অনেক ফলের কথা আছে। সবচেয়ে বড় কথা–

‘সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।’ (১২/২০)

আমার মাহাত্ম্য আমার সন্নিধিকারক।দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীতে ঋষিবর চণ্ডীগ্রন্থ শুনিয়ে শ্রোতা সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে দেবীর চরণে শরণাগতি গ্রহণ করতে বললেন।

BANGLADARSHAN.COM

“তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥” (১৩/৫)

‘সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। তাঁকে আরাধনা করলে তিনি মানুষকে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ বা মুক্তি) প্রদান করে থাকেন।’ ঋষি তাঁদেরকে আরাধনায় নিযুক্ত করেছিলেন। আরাধনার ফলে তাঁরা দেবীর সাক্ষাৎকার ও বাঞ্ছানুরূপ ফল লাভ করলেন।

এ আলোচনায় দেখা গেল মূলত: একই মহাসত্য সর্বত্র ঘোষিত এবং এ আলোচনা থেকে বলা যায় যে, তন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈদিক সত্যের দর্শনই চণ্ডী।

“অকালবোধন”

পৌরাণিক উপাখ্যান

মূল নিবন্ধ: ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, কৃষ্ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ কৃষ্ণকে দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীরা কিভাবে দুর্গাপূজা করেছিলেন, তার একটি তালিকা এই পুরাণে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে কোনো পৌরাণিক গল্পের বিস্তারিত বর্ণনা এই পুরাণে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে:

প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদ্যৌ গোলকে রাসমণ্ডলে।
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুরপ্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা। চ
তুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মুনিমানবৈঃ।
পূজিতা সর্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা॥

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি-বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন। ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র যে পূজার আয়োজন করেছিলেন, সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজা করে আসছে।

দুর্গা

BANGLADARSHAN.COM

প্রভাতে য স্মরণীততং দূর্গা দূর্গেক্ষরং দ্বয়ম,
আপদ শান্তি নাশ্যন্তি তমো সূর্যোদয়ে যথা।

প্রভাতে উঠে যে দুই অক্ষর বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে, সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার নাশ হয় সেইরকম তার সমস্ত আপদ কেটে যায়।

দুর্গম পরিস্থিতি থেকে যিনি ত্রাণ করেন তিনিই দূর্গা, জীবের দুর্গতি যিনি নাশ করেন তিনিই দূর্গা, দুর্গত কে যিনি আশ্রয় প্রদান করেন তিনিই দূর্গা। তাই শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে উদ্ধারকল্পে যখন রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি অকালবোধন করে দেবীকে আবাহন করেন এবং দেবীর আশীর্বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে একই কর্মে অর্জুন প্রবৃত্ত হন, অর্জুনকে দূর্গার স্তব করার উপদেশ দেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে অর্জুনের সেই স্তব আছে, যে স্তবে দেবীকে তুষ্ট করে অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং জয়যুক্ত হন। আদ্যাস্তবে বলে আদি শক্তি আদ্যা মাতা নিয়মিত তাঁর স্তব পাঠ করলে বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন, আর শ্রীশ্রীচণ্ডী বলে, যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা অর্থাৎ আদি পুরুষ বিষ্ণু আর আদিশক্তি আদিত্যবরণী দূর্গা একে ওপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আসলে স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ যখনই বিপদে পড়ে, তখনি দৈবের সহায়তা কল্পে হয় শক্তির বা সেই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী হিরণ্যবর্ণ পুরুষ বিষ্ণুর দুয়ারে হাত পাতে তাঁদের কৃপায় সেই বিপদ থেকে তারণ পেতে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী বলে দেবী দূর্গা ত্রিগুণাত্মিকা, সেই ত্রিগুণ সত্ত্ব, রজঃ আর তমোর আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায় দূর্গা মূর্তিতে যেখানে অসুর হল তমোগুণের প্রতীক, সিংহ হল রজঃ গুণের প্রতীক আর দেবী দূর্গা হলেন সত্ত্ব গুণের প্রতীক। রজোগুণকে সঙ্গে নিয়ে সত্ত্বগুণা দেবী তমোগুণকে নাশ করছেন। অর্গালা মানে আগল, কীলক মানে খিল বা গজাল যা দিয়ে অর্গলটি আটকানো আছে। চণ্ডী রহস্য অতি দুরূহ, দুর্জ্ঞেয়, সেই রহস্য জানতে হলে আগে অর্গলাস্তোত্র আর কীলক স্তব পড়তে হবে সেই রহস্যের অর্গল ও সেই অর্গলের গজালটি সরিয়ে অর্গল মুক্ত করতে হবে সেই রহস্য।

দুর্গতি নাশিনী দূর্গা বিশ্বমাতা মহেশ্বরী
সংনম্যতে সদা দেবী প্রসীদ জগদম্বিকে।

দুর্গতিনাশিনী দূর্গা বিশ্বমাতা এবং মহা ঈশ্বরী মহেশানী, তাঁকে সর্বদা প্রণাম করে প্রসন্নতার প্রার্থনা জানাই।

BANGLADARSHAN.COM

BANGLADARSHAN.COM

॥কালী॥

মননে মহাবিদ্যা কালী:

কালী কালী বল রসনা
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা॥

কালী তত্ত্বের উৎস:

****

বেদের রাত্রি সূক্তই পরবর্তীকালে কালীর ধারার সৃষ্টি করেছে। শতপথ ব্রাহ্মনে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মনে নির্ঋত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে কালীর নাম প্রথম পাই মুন্ডক উপনিষদে। সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহবার একটি। এখানে কালী আহুতি গ্রহণকারিনী অগ্নিজিহবা মাত্র। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে দেখা যায় অশ্বত্থামা যখন পান্ডব শিবিরে গিয়ে নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করছিলেন তখন হন্যমান বীরগণ ভয়ংকরী কালীমূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন। কালিদাসের ''কুমার মন্ভব''–এ মহাদেবের বিবাহ প্রসঙ্গে বরযাত্রার বর্ণনায় মাতৃগনের সাথে মহাদেবের বিবাহযাত্রায় কালী অনুগমন করেছিলেন। মার্কন্ডেয় চন্ডীতে চন্ডমুন্ড এবং তাঁদের অনুচরেরা দেবীর নিকটবর্তী হলে দেবী অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করলেন। তাঁর ভ্রুকুটি কুটিল ললাট থেকে অসি পাশধারিণী করালবদনা কালী আবির্ভূত হন।

♦কালীর আবির্ভাব তিথি:

****

কালী বিলাসতন্ত্রে বলা হয়েছে–
কার্ত্তিকে কৃষ্ণ পক্ষে তু পক্ষদশ্যাং মহানিশি।
আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনী কোটি ভিঃ সহা॥

অর্থাৎঃ কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার মহানিশিতে মহাদেবীর এই ভূমন্ডলে আবির্ভাব। এটাই তার আবির্ভাব - তিথি। এদিন দীপাবলী বা দীপদান তথা দেওয়ালী রজনী। কার্ত্তিক অমাবস্যার রাতে দীপদানে আলোক মালায় প্রজ্জ্বলিত করে নিজেদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাওয়ারই নামান্তর দীপাবলী। আলোর মাধ্যমে শক্তি সাধনায় নিজেকে পুণ্যালোকে আলোকময় করে তোলাই জগতের মূলে শক্তি সাধনার অন্তনির্হিত তাৎপর্য্যের সার্থকতা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমাদের অসৎ হতে সৎ–এ নিয়ে যাওয়ার জন্য, অন্ধকার থেকে আলোতে এবং মৃত্যু

থেকে অমৃততত্ত্বে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। পরলোকগত স্বজন ও বন্ধুগণ যাতে ঐ সব ভয়ঙ্কর অন্ধকার অতিক্রম করে গন্তব্য স্থল অমৃতধামে যেতে পারেন তার জন্য ঐ দিন রাতে নদীর জলে জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসানোর প্রথা বাংলার কোন কোন জায়গায় দৃষ্ট হয়। আবার আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসব্যাপী আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমে অশুভ শক্তি তাড়ানোর ব্যবস্থা এতে নিহিত রয়েছে। এই আলোক উৎসব প্রায় সারাদেশেই কোন না কোন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, জাপানসহ অনেক দেশে আসন্ন বিপদ তাড়াতে, অশুভ শক্তি দূরীকরণে, নতুন বছরের শুভ সূচনা করতে প্রয়াতদের অমৃতধাম যাত্রার পথ প্রদর্শকরূপে দীপাবলীর ন্যায় আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়ে থাকে। ক্রিস্টমাস ট্রির গায়ে যে আলো ঝোলানোর প্রথা দীপাবলীরই ভিন্নরূপ হতে পারে। পূরাণ এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, কার্তিক কৃষ্ণা অমাবস্যার রাতে রাবণ বধ ও লঙ্কা বিজয় সম্পন্ন করে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে দেওয়ালী অনুষ্ঠান হয়। সবকিছু মিলিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকমালায় প্রজ্জ্বলিত অনুষ্ঠানকে আলোর পথে যাত্রার সূচনাই দীপাবলী দেওয়ালী বা দীপান্বিতা অমাবস্যা।

♦কালী পূজার প্রশস্ত সময় নির্ঘন্ট:

****

JARSHAN.COM

রহস্যপূজা এবং সাধন রহস্যে বলা হয়েছে–
না দিবা পূজায়দ্দেবীং রাত্রৌ নৈব চ নৈবচ।
সর্বদা পূজয়ে দেবীং দিবা রাত্রৌ বিবর্জয়েৎ॥
অর্থাৎঃ দেবীকে দিনে ও না, রাত্রিতে ও না সর্বদা পূজা করবে।

♦রহস্যপূজায় বলা হয়েছে:

দিবাচার্দ্ধ প্রহরিকা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরী।
ঋতু দন্ডাত্মিকা সা চ রাত্রিরুক্তা মনীষিভিঃ
ততো বৈ দশ নাড্যন্ত নিশা মহানিশা স্মৃতাঃ।
সর্বদা চ সমাখ্যাতা সর্ব সাধন কর্ম্মনি॥

অর্থাৎঃ সূর্যাস্তের পর অর্দ্ধপ্রহর বা চারদন্ড সময় অর্থাৎ ৯৬ মিনিট সময়কে বলা হয় দিবা। তারপর ছয়দন্ড অর্থাৎ ১৪৪ মিনিট সময়কে বলা হয় রাত্রি। অর্থাৎ সূর্যাস্তের প্রথম দশ দন্ড অর্থাৎ ৪ঘন্টা দিবা ও রাত্রি। তারপর দশ দন্ডকাল অর্থাৎ ৪ ঘন্টা হচ্ছে নিশা ও মহানিশা। একই বলা হয় সর্বদা। এটাই দেবী পূজার প্রশস্ত সময়। কার্তিক মাসে সাড়ে পাঁচটায় সূর্যাস্ত। তারপর চার ঘন্টা বাদ দিয়ে পূজায় বসতে হবে এবং রাত্রি একটার মধ্যে পূজো সমাপ্ত করতে হবে। আবার রাত্রি দেড়টার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে বলা হয় দিবারাত্রি।

জীবনের সাথে এই শক্তির খেলা আর্য্য ঋষিগণ তাঁদের জ্ঞানদীপ্ত উপলব্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সৃষ্টিতে

প্রকৃতিরূপা মাতৃশক্তির রূপ কল্পনা কালী মূর্তিতে। শক্তির আধারভূতা দেবী শ্রীশ্রীকালীমাতা সকলের পরিত্রাণ করুক, সকলের জীবনে কালীমায়ের মূর্তির তাৎপর্য প্রাণবন্ত হোক, কর্মে সাত্ত্বিকতা আসুকএই প্রার্থনা রা -খি।

আর্য্যঋষিদের দেবদেবী কল্পনায় অধিকাংশ আধ্যাত্মিক বৈদিক, লৌকিক, আঞ্চলিক দেবদেবীর বাহনরূপে পশুপাখির অবস্থান নির্ণয় করেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো দেবী কালিকার ক্ষেত্রে। এখানে দেবীর বাহনরূপে শিবা, শিব, শব কাকে বাহন নির্দিষ্ট করেছেন, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি দেবীকে শিবারূঢ়া বলতে শিবের উপর অবস্থিত বোঝায়। অপর পক্ষে শিবা শব্দে শৃগাল বোঝায়। এ কারণে অনেক স্থলে মায়ের মূর্তির সাথে শৃগালকেও দেখানো হয়। কিন্তু মায়ের সাথে শৃগালের যুক্ততা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। শবারূঢ়া বা শিবারূঢ়া যাই বলি শব হয় শক্-তিহীনতায় আর শিব হয় মঙ্গলকারী শক্তিমানতায়। উভয়ই শক্তির অবস্থান নির্ণয় করে। যে শক্তি সবত্র বিরাজিত, কার্যকারিতায় তাঁর বাহন নির্ধারণ না করাই যুক্তিগ্রাহ্য বলে ঋষিগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি দেননি।

কালীবীজ জপলে ও তদনুযায়ী গুরুপাদিষ্ট মতে ক্রিয়া করলে তত্ত্বময়ী কালী সাধকের কাছে উপস্থিত হয়ে যান। কৃষ্ণানন্দ, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা প্রমুখ সাধকের কালী দর্শনে মুগ্ধ তন্ময়। ‘‘প্রত্যয় হয় প্রত্যক্ষ হলে।’’ সমস্ত যোগতত্ত্ব কথা গুরুবক্তগম্য। সকল তত্ত্ব নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে যদি গুরুপোদিষ্ট মতে সাধন ভজন করা যায়। মানুষকে সাধনমুখী, সত্যমুখী করার জন্যই পূজার ও দেবদেবীর মূর্তির -অবতারণা।

BANGLADARSHAN.COM

কালী নামের কত গুণ, রসনা কি জানে।
জানিলে মজিত কেন, ভ্রমরস পানে॥
আর দ্যাখ ত্রিলোচন, সদানন্দ সনাতন;
সদা সে মগন, শ্যামানাম গুণগানে॥—সাধক কমলাকান্ত

দক্ষিণা কালীর ডান পা শিবের বুকে। তিনি কালীর অন্যান্য রূপ থেকে ভিন্ন এবং তাকে ঘর এবং মন্দিরে পূজা করা হয়। দক্ষিণাকালী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভূজা এবং মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তার বামকরযুগলে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ; দক্ষিণকরযুগলে বর ও অভয় মুদ্রা। তার গাত্রবর্ণ গভীর নীল, আকাশ এবং নীল সমুদ্রের ন্যায়; তিনি দিগম্বরী। তার গলায় মুণ্ডমালার হার; কর্ণে দুই শবরূপী কর্ণাবতংস; কটিদেশে নরহস্তের কটিবাস। তার দন্ত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ; তার স্তনযুগল উন্নত; তিনি ত্রিনয়নী এবং মহাদেব শিবের বুকে দণ্ডায়মান। তিনি মহাভীমা, হাস্যযুক্তা ও মুহুর্মুহু রক্তপানকারিনী। তার দীর্ঘ এবং কালো চুল সভ্যতা থেকে প্রকৃতির স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করে। দক্ষিণা কালীর তৃতীয় চক্ষুর নিচে সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নির প্রতীক দেখা যায় এবং এটি প্রকৃতির চালিকা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

তার জিহ্বা আসক্তির ও লোলুপতার প্রতীক এবং সাদা দাঁত সত্যতার প্রতীক। তার জিহ্বা দাঁত দ্বারা দমিত। এটি সত্য দ্বারা লোভ নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। উপাসকমণ্ডলী অনুযায়ী তিনি দিব্য মাতৃকা শক্তি বা পরম ও সর্বোচ্চ ঈশ্বর

এবং চূড়ান্ত সত্য। তার গলায় মুণ্ডমালার হার প্রজ্ঞার মাল্য এবং হয় ৫১ বা ১০৮ মানুষের মাথা আছে। সংস্কৃত ভাষায় ৫১ বর্ণমালা ও ১০৮ একটি সুপ্রসন্ন সংখ্যা।

তার উপরের বাম হাতে খড়্গ শক্তির প্রতীক এবং নিচের বাম হাতে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড অহংএর প্রতীক। তার খড়্গে একটি চোখ দেখা যায়। এটি প্রজ্ঞার প্রতীক। কালীর শক্তি খড়্গ জ্ঞান দ্বারা মানুষের অহং ছিন্ন করেন। দক্ষিণা কালী দক্ষিণকরযুগলে বর ও অভয় দান করছেন। এই দুই হাতের মানে হল, একটি সত্য হৃদয় দিয়ে যে কেউ তার পূজা করতে পারেন।

দক্ষিণা কালী তার কোমরের উপর ছিন্ন হাতের একটি ঘের পরেন যার মানে তিনি মানুষের কর্ম থেকে স্বাধীন এবং উচ্চতর।

ভগিনী নিবেদিতা তার মাতৃরূপা কালী বইতে দক্ষিণেশ্বরের কালীর কথা আলোচনা করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালী দক্ষিণা কালী। তার পূজা করলে ত্রিবর্ণা তো বটেই সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ ফলও দক্ষিণাস্বরূপ পাওয়া যায়।

ওঁ কালী॥
ক্ষমতু মেঽপরাধং মাতরিতি।

BANGLADARSHAN.COM

তথ্যসূত্র:
বৃহদতন্ত্রসার, রামকৃষ্ণ কথামৃত, উপনিষদ, অন্তর্জাল।

উমার প্রত্যাবর্তনের পরে আসছেন মহাবিদ্যা শ্যামা, কালী, দেবী কালিকা, তারই মানসিক প্রস্তুতির জন্য এই অর্ঘ্য টুকু।

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা,
ভবানী ত্রিলোক পালিকা।
মহাকাল মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী,
তুমি বেদমাতা, তুমি গায়ত্রী,
ষোড়শী কুমারী বালিকা।–কাজী নজরুল ইসলাম

শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। শক্তিমান যখন ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকেন, তখনই তাঁকে শক্তি বলা হয়। বহুক্ষেত্রে শক্তিমান এক অংশ নিষ্ক্রিয় থেকেও অপর অংশ ক্রিয়াশীল থাকতে পারেন, ইহাও দেখা যায়। নিষ্ক্রিয় শিবের বুকে ক্রিয়াশীল কালীর অবস্থিতি ও লীলা এই ভাব হতেই বর্ণিত হয়েছে। ধর–তুমি স্বপ্ন দেখছ। স্বপ্ন দেখার সময় তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ বেশ নিষ্ক্রিয় থাকে; তোমার ভেতরের চেতনাশক্তিও অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকে।

অথচ তোমার মন কত হাতী, ঘোড়া, নদ, নদী দেখে ভীত হয়। কত রাজ্যের রাজা হয়ে নিজেকে সুখী মনে করো। এখানে তোমারই আশ্রয়ে তোমার মন ক্রিয়াশীল ও গতিশীল হচ্ছে, অথচ তুমি এক অংশে নিষ্ক্রিয় ও শান্ত দ্রষ্টা। যদি জীব হয়ে তোমার পক্ষেই এটা সম্ভব হয়, তা হলে অনন্ত শক্তির আধার ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব হবে কেন?

জান না রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা মা সামান্য মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখনো কখনো পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি,
দনুজতনয়ে-, করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণধারণ-, করিয়ে কখন,
করয়ে সৃজনলয়।-পালন-
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা,
যতনে এ ভবযাতনা সয়॥-
যে রূপে যে জনা, করয়ে ভাবনা;
সে রূপে তার, মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদিসরোবরে-,
কমলমাঝারে করে উদয়॥-
–সাধক কমলাকান্ত

ADARSHAN.COM

সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি নির্লিপ্ত দ্রষ্টা পুরুষ আছেন আর সেই দ্রষ্টা পুরুষকে আশ্রয় করে বহু শক্তির ক্রিয়া চলছে। তুমি বাল্যকালে কেমন ছিলে, কি কি করেছ, তার অনেক কথাই তুমি হয়তো এখন বলতে পারো। ঘটনার সঙ্গে এখন তোমার যোগ নেই, অথচ ঘটনার স্মৃতি আছে। এই স্মৃতি ওই নির্লিপ্ত দ্রষ্টা পুরুষের মধ্যেই থাকে। যখন ঘটনা ঘটে, মনে হয় ভিতরের দ্রষ্টা পুরুষও সুখ দুঃখ ভাল মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পরে দেখা যায় সুখদুঃখকে ভোগ করার সময় যে নিজেকে সুখী - ও দুঃখী মনে করছিল, তা থেকে এই দ্রষ্টা স্বতন্ত্র। তিনি সাক্ষী মাত্র। এই দ্রষ্টা পুরুষই হলেন শিব এবং তাঁর ক্রিয়াশীল অবস্থাই হল শক্তি। দ্রষ্টাকে বাদ দিয়ে শক্তির অবস্থিতি বা ক্রিয়া নেই।

সুতরাং কালীর গর্ভে অনন্ত বিশ্বের, অনন্ত জীবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিহিত রয়েছে। বিশ্বের কারণ ও সূক্ষ্ম বীজাধার এই কালী। অসংখ্য সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে প্রত্যেক জীবের যে স্বতন্ত্র বীজ আছে তাই তারাশক্তি। তারাশক্তি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোনও কাজ হচ্ছেনা জগৎ তার ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়ে আছে তখন বলি নির্গুণ ব্রহ্ম। আর - এই ব্রহ্মই যখন ক্রিয়াশীল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়–রূপ কার্য সম্পন্ন হচ্ছে–তখন তাকেই সগুণ ব্রহ্ম বা শক্তি বলে। সাংখ্য দর্শনে ব্রহ্মের এই দুই স্বরূপকে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি বলা হয়। এই সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতীক দুর্গা, কালী বা ভগবতী। আর নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক হলেন শিব। তাই সগুণ বা ক্রিয়াময়ী নৃত্যরতা কালীর পদতলে জড়ের মতো পড়ে আছেন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শিব। সুতরাং শিব ও কালী আসলে একই সত্তা। শিব ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ, তাই জড়বৎ। আর কালী হলেন ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপ, তাই নৃত্যরতা। বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রের মহামায়ার অর্থ এক নহে। বেদান্তের মায়ার ব্যবহারিক সত্তা আছে, পরমার্থিক সত্তা নাই। তন্ত্রের মহামায়া কালত্রয়াবাধিত সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মময়ী। অবশ্য বেদান্ত এবং তন্ত্রে কোন দ্বন্দ্ব নাই। বেদান্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র এবং তন্ত্র সাধনশাস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরামপ্রসাদ উভয়েই, ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম–এই একটি বাক্যের দ্বারাই মহামায়া তত্ত্বটি অতি সহজ ও সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিয়াছেন। বৈদান্তিকগন যাকে ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগন তাকেই বিশ্বমাতা মহামায়ারূপে উপাসনা করেন। এই সগুণ ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী কালী বা দুর্গা। এই নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মকে আবার যথাক্রমে ব্রহ্ম ও শক্তিও বলা হয়। তাই দুর্গা বা কালীকে শিবের শক্তি বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও শক্তি স্বরূপতঃ অভেদ। আগুনকে যেমন দাহিকা শক্তি থেকে পৃথক করা যায়না ঠিক তেমনি ব্রহ্মকেও শক্তি থেকে পৃথক করা যায়না। এই রূপগুলি সবই এক একটি ভাবের প্রতীক। জগদীশ্বর এবং জগন্মাতার এই অভিন্নতার তত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে শিব ও শক্তির অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে, লিঙ্গমূর্তিতে এবং শিবের বুকের উপরে নৃত্যরতা কালী মূর্তিতে। তাহলে আমরা ঈশ্বরের যে নারীরূপে কল্পনা করি, যেমন যেমন কালী, দুর্গা প্রভৃতি, আবার পুরুষরূপে কল্পনা করি, যেমন শিব, বিষ্ণু ইত্যাদির পূজা করি তা কি সঠিক নয় ? স্বামীজির একটি কথায় এর উত্তর পাওয়া যাবে। স্বামীজি এক জায়গায় বলছেনঃ বিড়াল যদি ঈশ্বর সাধনা করত, তবে সে ঈশ্বরকে বিড়াল রূপে দেখত, গরু যদি ঈশ্বরউপাসনা করত-, তবে তার ঈশ্বরের রূপ গরুর রূপই হত। আমরা মানুষ তাই ঈশ্বরকে মানুষের মতো আকৃতি বিশিষ্ট মনে করি। কারণ আমাদের কল্পিত ঈশ্বর আমাদেরই ভাবনার প্রতিফলন। কিন্তু এই বিড়ালরূপ-, গরুরূপ-, মানুষ রূপ এগুলি যেন এক-একটি পাত্র, এবং এই পাত্রগুলি ঈশ্বরজলে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ এই কল্পিত রূপের মধ্যে ঈশ্বরই রয়েছেন। তাই কোনও - ভাবে-উপাসনাই বিফল হবেনা। মানুষ যতদিন দেহ, জড়কল্পনার -ভাবে আচ্ছন্ন ততদিন সে এইসব রূপ-বাইরে যেতেই পারবেনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ কালী কি কালো?–দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ কোনো রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোনো রং নাই। মা কালী মূর্তি উর্বরা শক্তি ও মাতৃত্বের প্রতীক। উর্বরা হলেই মা দেন জন্ম, সতেজ হলেই তিনি করেন প্রতিপালন। মূর্তির পুষ্ট অঙ্গ স্তন জীবন ধারণের সহায়ক। আবার জীবন দান করার জন্য যে উদর ক্ষেত্র তাহল স্ফীত এবং জন্ম দাত্রী বলেই মা হলেন দিগম্বরী। শত গুণের প্রতীক শুভ্র দন্ত দ্বারা লোভলালসার - প্রতীক জিহ্বাকে কেটে ধরেছেন মা কালী। আবার পরম পুরুষ শিবের ওপর পরমা প্রকৃতি দাঁড়িয়ে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের খেলা খেলে চলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, “আদি শক্তি লীলাময়ী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন - তারই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালীএকই বস্তু !, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোনো কাজ

করছেন না–এই কথা যখন ভাবি তখন তাকে ব্রহ্মবলে কই যখন তিনি এসব কাজ করেন, তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি।" তন্ত্রমতে জগত ব্রহ্মেরই আর এক রূপ–অর্থাৎ বিকার রহিত ব্রহ্ম, আর বিকার সহিত ব্রহ্ম-নির্বিকার ব্রহ্ম ও সবিকার ব্রহ্ম। একে তন্ত্রের ভাষায় বলা হয় প্রকাশ ও বিমর্ষ। শিব প্রকাশ-তাতে শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, আর শক্তি বিমর্ষ তার-দ্বারা সৃষ্টি কার্য সম্পাদিত হয়। বিশ্ব সৃষ্টির বিষয়ে তন্ত্র সাংখ্যদর্শনের ২৪ তত্ত্ব কে গ্রহণ করেছে, আর তার সাথে যোগ করেছে আরো ১২টি তত্ত্ব। যা শৈব সিদ্ধান্ত অনুসারী, এবং এইগুলিকে ৩টি ভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ক(পঞ্চ)৫ - (তত্ত্ব

খ৭- (আংশিক শুদ্ধ, আংশিক অশুদ্ধ তত্ত্ব

গ-অ ২৪- (শুদ্ধ তত্ত্ব যা সানখ্য মতানুসারী।

১ম ভাগে রয়েছে–শিব , শক্তি, নাদ ও বিন্দু এবং শুদ্ধ বিদ্যা। এটি তন্ত্রের নতুন ভাবনা কারণ শৈব দর্শনে বলা হয়েছে মূল বস্তু ৪টি–শিব, শক্তি, সদাশিব, ও ঈশ্বর। তন্ত্রে প্রথম দুটিকে একই বলা হয়, কারণ শিব তত্ত্ব কে স্থির বা স্থাবর এবং শক্তি তত্ত্ব কে জঙ্গম বা সচল স্বরূপ পরম ব্রহ্ম রূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে। তারপর আসে নাদ ও বিন্দু। নাদ মানে শব্দ নয় আবার ও বিন্দু মানে ফোটা বা Drop নয়। নাদ মানে সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন বা কম্পন যার থেকে কাম্পিল্য বাসিনী তত্ত্বের উদ্ভব আর বিন্দু হলো তার প্রথম প্রকাশ–যখন বিশ্ব তার বাহ্যিক রূপ লাভ করতে যাচ্ছে তার আগের মুহূর্ত। তন্ত্রে প্রায়ই একে চনক বা ছোলার সাথে তুলনা করা হয়েছে–ছোলার যেমন ছালের ভিতরে দুটি দানা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে থাকে এও সেরূপ। দুটি দানা অবশ্যই শিব ও শক্তি, এবং তাদের থেকে যে চারা গাছ টি বা অঙ্কুরটি বের হ-য়তা এই প্রকাশমান বিশ্ব-। ত্রিপুরা সিদ্ধান্তে নিস্ক্রিয় শিবকে প্রকাশ বলা হয়েছে, এবং সৃষ্টি শক্তি বিমর্ষ নামে অভিহিত। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ ও বিমর্ষ আলাদা কিছু নয়–একই তত্ত্বের দুটি দিক মাত্র। কালীমুর্তিতেই প্রথম এই তত্ত্বটিকে রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন , কালীর পায়ের নিচের শব্ শিব প্রকাশের প্রতীক–মানে নিস্ক্রিয় ব্রহ্ম। লক্ষ্য করলে দেখা যায় কালীর দুটি চরণ শিবের পুরুষাঙ্গ ও হৃদয়ে রাখাযা ইঙ্গিত করে সৃষ্টি তত্ত্-বের। আগে মানুষ নিজের সৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় তারপর সে সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত হয়, মানে আগে ভাবনার জন্ম হয় হৃদয়ে, তারপর তা শরীরকে কর্মে নিয়োগ করে। কালীর কালো বর্ণ, খোলা কেশ, খড়্গ ও হস্ত ধৃত মুন্ড–এসবই হলো অব্যক্ত চেতনার প্রতীক। আবার খড়্গ, ত্রিনয়না, বরমুদ্রা–এগুলি জ্ঞানের প্রতীক। অমৃত লাভের পথে কালী হলেন ব্রহ্ম তত্ত্বের প্রথম জ্ঞান ধৃত রূপ। তাই তন্ত্রে কালিকেই প্রথম তত্ত্বের স্থান দেওয়া হয়েছে। আর সাধকের দিক থেকে দেখলে কালী হলেন ব্রহ্মের প্রথম সাকার রূপ। মানে উন্নতির সোপানে কালী তত্ত্ব যার উপলব্ধি হয়েছে–তিনি চরম তত্ত্বের সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাই গৌড় কুলে যাকে তন্ত্রের) জন্মস্থান বলা হয়কালী সাধনাই শ্রেষ্ঠ বলা হ (য়েছে। রামকৃষ্ণদেব তাই বললেন–"যাকে বেদান্তে ব্রহ্ম বলেছে , তাকেই তন্ত্রে কালী বলা হয়েছে।" মাতৃকা শক্তির সাথে শিবের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শংকর বলছেনঃ (আদি শংকরাচার্য)"শিব শক্তিযুক্ত না হলে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করতে পারেননা। শক্তি ছাড়া সেই দেব স্পন্দিত হতেও পারেননা। এখানে শিব আর কেউ নন (শিব), তিনি বেদোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কিছুই করেননা। এই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণরূপ হলেন শক্তি, যাঁকে কালী বা দুর্গা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।" (সৌন্দর্যলহরী শ্রীক ।(প্রথম শ্লোক-ৃষ্ণের আদেশে অর্জুন স্তব করছেন–

“ভদ্রকালী নমস্তুভ্যং মহাকালী নমহস্তু তে। চন্ডি চন্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি॥” (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ২৩সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিরাকার অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের এই ব্যক্ত ও সগুণ প্রকাশ বা মাতৃকাশক্তির (১৫/৪/ বিভিন্ন রূপ। কখনও তিনি মহাকালী, কখনও ভদ্রকালী, কখনও দুর্গা, আবার কখনও চন্ডী।

দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা কালী। কালের নিয়ন্তা যিনি তিনিই কালী।

“মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী,
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হল মার রূপের ডালি।
তবু মায়ের রূপ কি হারায়,
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়
মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য প্রদীপ জ্বালি॥”
–কাজী নজরুল ইসলাম

নিজের সাধনায় উপলব্ধি না হলে এই লেখা হয় না। কাজী নজরুল ইসলামের সেই সাধনা ছিল এবং সেই উপলব্ধি থেকে আমাদের বঙ্গসাহিত্য সম্মৃদ্ধ হয়েছে এমন আরো সব রত্নসম রচনায়।

GLADARSHAN.COM

♦♦কালীর দ্বিবিধরূপ:

****

♣ সংহারনাশিনীরূপ/: কালী সংহারমূর্ত্তি। কিন্তু এই সংহার নিষ্ঠুর ধ্বংস নয়। এই সংহার সংহরণ অর্থাৎ আপনার মধ্যে আকর্ষণ। সমুদ্রের তরঙ্গমালার উদ্ভব সমুদ্র থেকেই। আবার সেই তরঙ্গমালার লয়ও হয় সমুদ্র বক্ষে। সংহার তেমনই একটি ব্যাপার। এটি হলো তার নাশিনী শক্তি।

♦ সৃজনীরূপ: আদ্যাশক্তি বিশ্বপ্রসবকারিনী মায়ের উদর থেকেই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি। তখন তিনি সৃজনী শক্তি।

মা কালীর রূপের বর্ণনা:

****

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালা বিভূষিতাম্॥
সদ্যন্নিশিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপানিকাম॥
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত মুন্ডালী গলদ্ রুধির চর্চ্চিতাম্॥

অর্থাৎঃ–দক্ষিণা কালিকা দেব করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, দিব্যা, মুন্ড মালা বিভুষিতা। তাঁর

বামোর্দ্ধ করে খড়্গ আর বামোর্দ্ধ করে খড়্গ দ্বারা সদ্য, ছিন্নমুন্ড, দক্ষিনোর্ধ করে তিনি অভয়দাত্রী এবং দক্ষিনার্ধ করে তাঁর বরমুদ্রা। ঘন মেঘের প্রভার মতো তাঁর রং। তিনি দিগম্বরী, তাঁর গলদেশের মুন্ডমালা থেকে রক্তধারা ঝরে পড়ছে। শবসমূহের হস্তসমূহ দ্বারা তার কটিমেখলা রচিত এবং তিনি হাস্যমুখী। তিনি শবরুপী মহাদেবের বক্ষোপরি অবস্থিতা। সুখ প্রসন্নবদন, তাঁর মুখমন্ডল প্রস্ফুটিত পদ্মহাস্যে সমুজ্জ্বল।

ওই শ্যামা বামাকে?
তনু দলিতাঞ্জন শরদমন্ডল বদনী রে।-সুধাকর-
কুন্তল বিগলিত,শোণিতশোভিত-,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে।
–সাধক রামপ্রসাদ সেন

বর্তমানে আমরা যে দেবী কালিকার মূর্তিটির পুজো করি তার রূপদান করেছিলেন সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যিনি ছিলেন শ্রীরামপ্রসাদ সেনের তন্ত্রগুরু, সাধক রামপ্রসাদ আবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্য ছিলেন।

নবদ্বীপের উচ্চকোটির তন্ত্র সাধক ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, আদতে কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য যিনি ১৭০ গ্রন্থ থেকে নির্যাস গ্রহণ করে রচনা করেন "বৃহৎ তন্ত্রসার" গ্রন্থটি রচনা করেন যা পন্ডিত সমাজে বহুল সমাদৃত। কৃষ্ণানন্দ ছিলেন উদারচেতা, ধর্মবিষয়ে তাঁর কোনো গোড়ামি ছিল না। তাই তন্ত্রসার গ্রন্থে শৈব, গণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ের তন্ত্রগ্রন্থগুলির সার গ্রহণ করে সন্নিবেশন হয়েছে।তিনি তন্ত্র বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী নামে আরও একটি গ্রন্থ লেখেন। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ ১৬৩০ থেকে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বিখ্যাত তন্ত্রসার গ্রন্থটি রচনা করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, রাঢ়দেশে তন্ত্রশাস্ত্র রচনাকারদের মধ্যে আগমবাগীশের রচনা সবচেয়ে মার্জিত।

বহুবছর থেকেই তন্ত্র সাধনক্ষেত্র হিসাবে নবদ্বীপের বিশেষ খ্যাতি ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবর্ভাবের অনেক আগে থেকেই নবদ্বীপের তন্ত্র সাধনা সাধারণ মানুষের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থা চলেছিল কৃষ্ণানন্দের সময়কাল পর্যন্ত। এই সব দেখে সাধকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ শুদ্ধাচারে তন্ত্র সাধনা প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘরে ঘরে শক্তি আরাধনা প্রবর্তন করার জন্য কৃত সংকল্প হলেন। কৃষ্ণানন্দ তাঁর সাধনলব্ধ ঐশী দ্বারা দৈবাদেশ পান ও সেই মতো তিনি মা কালীর শান্ত রূপ কল্পনা করেন। সেই রূপ দক্ষিণাকালী নাম খ্যাত। ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রাণের আকুতি নিয়ে সহজ সরল পদ্ধতিতে মায়ের সেই মঙ্গলময়ীরূপী বিগ্রহ তৈরি করে তিনিই বাংলার ঘরে ঘরে মা কালীর পূজার প্রচলন করেন।

কৃষ্ণানন্দ দীপান্বিতা অমাবস্যায় একই দিনে ছোট আকারের কালীমূর্তি নির্মাণ করে রাত্রে পূজার্চনা শেষে ভোরে বিসর্জন দিতেন। এই কারণে লোকে বলতো "আগমবাগীশি কান্ড।" কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর পূজিত দেবী আগমেশ্বরী মাতা নামে প্রতিবছর নবদ্বীপে পূজিত হয়।

কালী মূর্তি সম্পর্কে কিংবদন্তি

****

কৃষ্ণানন্দ মা কালীর রূপ কিভাবে পেলেন, এই নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে এক প্রচলিত শ্রুতি পাওয়া যায়। ক'দিন ধরেই পুজোয় বসে কালীসাধক কৃষ্ণানন্দ বায়ানা করেন, "এ বার সাকার রূপে দেখা দাও মা, মূর্তি গড়ে তোমার অর্চনা করি!"

সন্তানের আকুতি মা ফেলতে পারলেন না। বিধান দিলেন, মহানিশার অবসানে প্রাতঃমুহূর্তে কৃষ্ণানন্দ প্রথম যে নারীমূর্তি দর্শন করবেন, সেই মূর্তিই হবে ইচ্ছাময়ীর যথার্থ সাকার মূর্তি। পরের দিন ভোরে গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে কৃষ্ণানন্দ দেখলেন, এক দরিদ্র বধূ গাছের গুঁড়ির উপর নিবিষ্ট মনে ঘুঁটে দিচ্ছেন। বাঁ হাতে গোবরের মস্ত তাল, ডান হাত উঁচুতে তুলে ঘুঁটে দিচ্ছে। নিম্নবর্গীয় কন্যা, গাত্রবর্ণ কালো, বসন আলুথালু, পিঠে আলুলায়িত কুন্তল, কনুই দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে সিঁদুর লেপ্টে গেছে। এ হেন অবস্থায় পরপুরুষ কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলেন সেই বধু।–এই ছবিটিই মানসপটে এঁকে গঙ্গামাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসলেন কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের এই মূর্তিই পরবর্তীতে দুই বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

এছাড়াও কথিত আছে, কৃষ্ণানন্দ কোনো এক ধনী নবশাকের বাড়ি দুর্গাপূজা করতে গিয়েছিলেন; সেখানে দুর্গাপূজার শেষে ওই বাড়ির কর্তা নিজের অহংবোধের বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণানন্দকে বলেন যে তিনি প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেননি। কৃষ্ণানন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে তিনি যদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করে থাকেন এক্ষুনি তার প্রমাণ দেবেন; কিন্তু প্রমাণ হওয়ার পরে ওই গৃহের কেউ আর জীবিত থাকবেনা। কর্তা সম্মতি জানালে কৃষ্ণানন্দ একটি কুশি ছুঁড়ে দেন দেবী প্রতিমার উরুতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার উরু ফেটে রক্তপাত হয়; এবং ওই গৃহের প্রত্যেকেও মুখে রক্ত উঠে তৎক্ষণাৎ মারা যান।

কালী হলেন আদি শক্তি। দক্ষের তথা সমস্ত জীবজগতের বাসনাকামনার বীজ লুকিয়ে আছে এই কালীর - মধ্যে। আরও পরিষ্কার বলে বলা যায়,–তুমি এই যে জগতে এসেছ, এখানে আসার আগে তুমি কোথায় ছিলে, কীভাবে ছিলে কিছুই জান না। এখনও তুমি কবে মরবে, আবার কোথায় গিয়ে জন্মাবে, মৃত্যুর পর কোথায় গিয়ে থাকবে এসকল কিছুই জান না। অথচ তুমি একজন দক্ষ লোক। এই যে তুমি তোমাকে জান না, তোমার অতীত জান না, ভবিষ্যৎ জান না, এমনকী বর্তমানও জান না, সেই তুমি বীজাকারে–সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাকারে যার গর্ভে জন্মের পূর্বে নিহিত ছিলে, তিনিই কালী। অন্ধকার গৃহে যেমন কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ এই কালীর গর্ভে কি নিহিত আছে কেউই দেখতে পায় না। তাই কালীর রং অন্ধকারের ন্যায় কালো। এই কাল অর্থাৎ কালী অনন্ত, অসীম। কবে তাঁর উৎপত্তি হয়েছে, কবে তাঁর এই লীলার শেষ হবে কেউই বলতে পারে না। কত জীব, কত জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে আবার ধ্বংস হচ্ছে কালেরই গর্ভে তা কেউ জানে না। ক)ালী–Time–সময়সময়কে (কেউই রুখতে পারে না–বাধা দান করতে পারে না। সোমবারকে যদি কেউ বলে–হে সোমবার, তুমি গত হয়ো না, তুমি গত হলে মঙ্গলবার আমার মৃত্যু হবে। শত অনুনয় বিনয় করলেও সোমবার একটুও দাঁড়াবে না। সে যেমন নিঃশব্দে চলছিল তেমনি চলে যাবে। তাতে তোমার মৃত্যু হলেও সে বিচলিত হবে না। তাকে ঢাকতে, আচ্ছাদিত করতে, বাধা দিতে কেউ পারবে না। তাই কালী উলঙ্গা, নৃত্যরতা, গতিশীলা। এই কালীর গর্ভে শুধুই

তোমার না, অনন্ত বিশ্বের—অনন্ত জীবজন্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিহিত আছে। জ্যোতিষীগণ গ্রহনক্ষত্রের - সমাবেশ ও যোগাযোগের তাৎপর্য দিয়েএই কালের গতিকে নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। তোমরা তাই ভাগ্যের কথা অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা জানার জন্য জ্যোতিষীদের কাছে ছুটে যাও। সাধকগণ কালীর গহন তত্ত্বে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেন। কারণ জন্ম বা মৃত্যুর বীজ ঐ কালীর গর্ভে নিহিত আছে। কালীর বুকে প্রবেশ করলে বিশ্বের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জানার ক্ষমতা আসে। তাই তোমরা সাধকদের কাছে ছুটে যাও তোমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা জানার জন্য ও সম্ভাব্য প্রতিকারের জন্য। বর্তমান কালে প্রকৃত সাধক প্রায় নেই বললেই) থ চলে। থাকলেও তাঁরা লোকচক্ষুর অগোচরেেকে নিজ সাধনায় মগ্ন থাকেন। আমরা—সাধারণ মানুষ তাঁর দেখা পাবো না, যদি না তিনি কৃপা করে দেখা দেন(। সময়ের অধীন—কালের অধীন প্রত্যেক দেহধারী জীব। অথচ কালের গর্ভে কি আছে জানে না। জন্মের পূর্বে এই কালের গর্ভে ছিলে মৃত্যুর পর এই কালের গর্ভে যাবে। এখনও তুমি কালের ক্রীড়নক। এই কালকে অতিক্রম করতে না পারলে জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হতে রক্ষা পাবার উপায় নেই। আত্মজ্ঞান না হলে কালকে অতিক্রম করা যায় না। তাই আত্মজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষই শিব—মৃত্যুঞ্জয়। “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।”

যাই হোক এখানে বলছিলাম কালের কথা অর্থাৎ কালীর কথা। আমরা জন্মের পূর্বে এই কালের মধ্যেই লুক্কায়িত ছিলাম। কাল হতে বহির্গত হয়ে আমরা ভাবময়, রূপময়, আকারময়, বিভিন্ন গুণ ও দোষময় হয়ে এই জগতে বিচরণ করছি। অব্যক্ত হতে অর্থাৎ বীজময় ক্ষেত্র হতে আমরা এই জগতে কিরূপে রূপবান হয়ে আসি এবং কিরূপে বহু জন্ম নানা ভঙ্গিমায় অভিনয় করি তাই এই দশমহাবিদ্যা জগদ্বাসীকে জানাবার জন্য দ্রষ্টা শিবকে দেখিয়েছিলেন।

ওঁ কালী॥
ক্ষমতু মেঽপরাধং মাতরিতি।

তথ্যসূত্র:
বৃহদতন্ত্রসার, রামকৃষ্ণ কথামৃত, উপনিষদ, অন্তর্জাল।

BANGLADARSHAN.COM

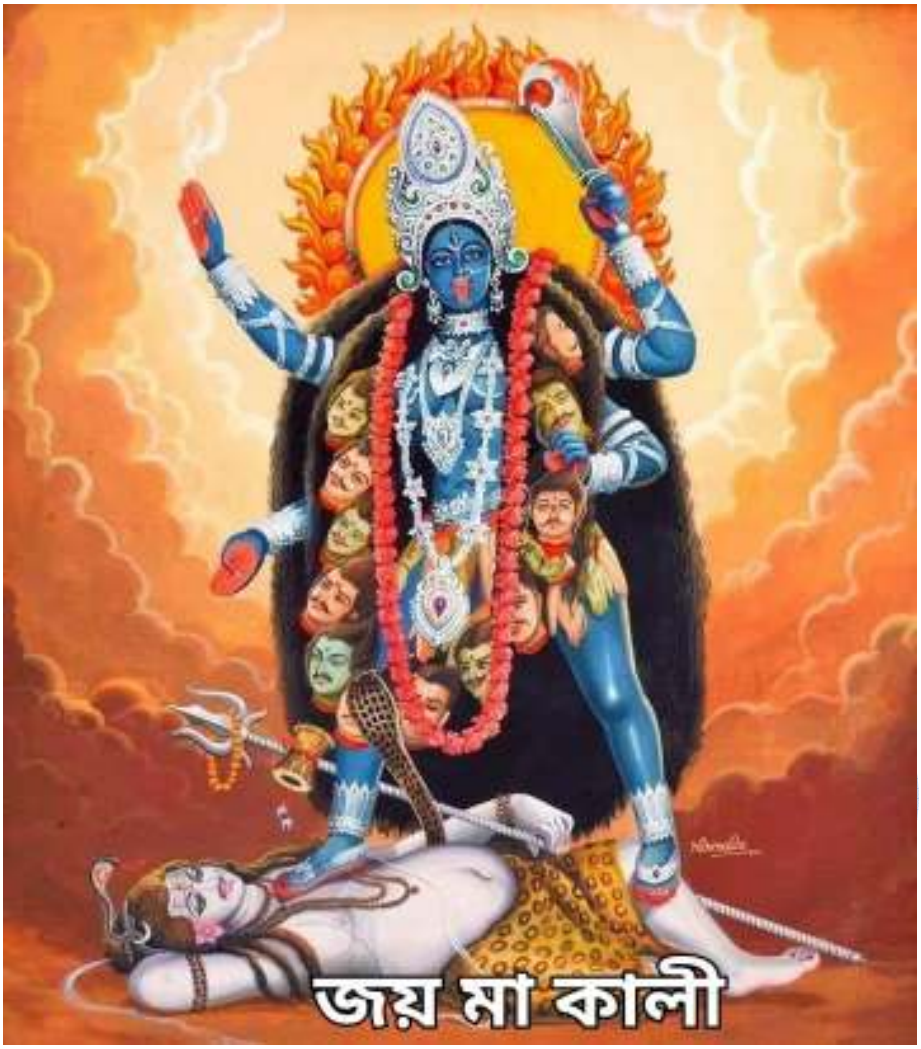
জয় মা কালী

BAN COM

বশিষ্ঠারাধিতা তারা মূর্তি

BANGLADARSHAN.COM

॥সরস্বতী॥

সরস্বতৈ নমঃ নিত্যাং:
===========

সরস্বতী (সংস্কৃত: सरस्वती) হলেন জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা, বুদ্ধি ও বিদ্যার হিন্দু দেবী। তিনি সরস্বতী-লক্ষ্মী-পার্বতী এই ত্রিদেবীর অন্যতম। এই ত্রিদেবীর কাজ হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে যথাক্রমে জগৎ সৃষ্টি পালন করতে সাহায্য করা।

ওঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ
সরস্বতী গায়ত্রী মন্ত্র: ওঁ বাগদেব্যৈ বিদ্মহে ব্রহ্মরাজায় ধীমহি তন্নোঃ দেবী প্রচোদয়াৎ।
ওঁ শান্তি ব্রহ্মব্য প্রিয়ে নমঃস্ততে।

আমরা যে দেবী সরস্বতীকে হিমালয়কন্যা পার্বতীর কন্যা ও লক্ষ্মীগণেশের সহোদরা ভগ্নীরূপে দেখি-কার্তিক-, সেটা নিতান্তই বাঙালিদের ঘরোয়া মনগড়া গল্প, এর পিছনে কোন শাস্ত্রীয় অনুমোদন নেই। শাস্ত্রীনুসারে সরস্বতী সৃষ্টিদেবতা ব্রহ্মার সহধর্মিণী এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ও মহেশ্বরজায়া পার্বতীর সঙ্গে একযোগে ত্রিদেবী নামে পরিচিতা।

NOLABANSHAN.COM

ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত প্রতিমাকল্পটিতে দেবী সরস্বতীকে শ্বেতবর্ণা, শ্বেত পদ্মে আসীনা, মুক্তার হারে ভুষিতা, পদ্মলোচনা ও বীণাপুস্তকধারিণী এক দিব্য নারীমূর্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ।।

অর্থাৎ, “চন্দ্রের নূতন কলাধারিণী, শুভ্রকান্তি, কুচভরনমিতাঙ্গী, শ্বেত পদ্মাসনে আসীনা (উত্তমরূপে), হস্তে ধৃত লেখনী ও পুস্তকের দ্বারা শোভমানা বাগ্‌দেবী সকল বিভবপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে রক্ষা করুন।”

সরস্বতী প্রাচীনতম হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদসমূহের প্রসূতি।
ঋগ্বেদে বাগ্দেবী ত্রয়ীমূর্তি-ভূ:স্ব :ভুব :, জ্ঞানময়ীরূপে সর্বত্রব্যাপিনী। বিশ্বভূবন প্রকাশ তারই জ্যোতিতে। হৃদয়ে সে আলোকবর্তিকা যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন জমাট বাধা অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার যায় দূর হয়ে। অন্তরে, বাইরে সর্বত্র তখন জ্বলতে থাকে জ্ঞানের পুণ্য জ্যোতি। এই জ্যোতিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, এই জ্যোতিই সরস্বতী। আলোকময়ী, তাই তিনি সর্বশুক্লা।

তিন গুণের মধ্যে তিনি সত্ত্বগুণময়ী, অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরের বাকশক্তির প্রতীক বাগ্দেবী। গতিময় জ্ঞানের

জন্যই ঋগ্বেদে তাঁকে নদীরূপা কল্পনা করা হয়েছে, যিনি প্রবাহরূপে কর্মের দ্বারা মহার্ণব বা অনন্ত সমুদ্রে মিলিত হয়েছেন। কল্যাণময়ী নদীতটে সাম গায়কেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণে ও সাধনে নিমগ্ন হতো। তাদের কণ্ঠে উদ্গীত সাম সঙ্গীতের প্রতীকী বীণা দেবীর করকমলে। সরস্বতী বিধৌত ব্রহ্মাবর্ত ভূমি বেদবেদান্ত -বেদাঙ্গ- করে আশ্রয় সাধনা করতে আশ্রমবাসী ঋষিগণ। সেই ভাবটি নিয়েই দেবী 'পুস্তক হস্তে', গ্রন্থ রচনার সহায়ক লেখনীটিও তাঁর সঙ্গে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীশ্রীচণ্ডী উত্তরলীলায় শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করার সময় দেবীর যে মূর্তির কল্পনা করা হয়েছিল তা ছিল মহাসরস্বতী। এ মূর্তি অষ্টভূজা–বাণ, কার্মূক, শঙ্খ, চক্র, হল, মুষল, শূল ও ঘন্টা ছিল তাঁর অস্ত্র। তাঁর এই সংহারলীলাতেও কিন্তু জ্ঞানের ভাবটি হানি ঘটেনি, কেননা তিনি 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়াকা মমাপরা' বলে মোহদুষ্ট শুম্ভকে অদ্বৈত জ্ঞান দান করেছিলেন। আরেকটা মতানুসারে, পরমাপ্রকৃতির সত্ত্বগুণের সত্তা দেবী মহাসরস্বতী, যিনি আবার শ্বেত পদ্মাসনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা। দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা তারাদেবী নীলসরস্বতীরূপে পূজিতা, এটাকেও অনেকে সরস্বতীর একটি রূপ বলে মনে করেন। তারা শক্তি আদিশক্তি, তাই শ্রীশ্রীচন্ডীতে দেবী আরাধনায় মহাকালী, মহালক্ষ্মী আর মহাসরস্বতীর আরাধনা করা হয়েছে যা যথাক্রমে তমোগুনের, রজঃ গুণের ও সত্ত্বগুণের তিনটি রূপ।

স্কন্দ পুরাণে প্রভাসখণ্ডে দেবী সরস্বতীর নদীরূপে অবতরণের কাহিনী বর্ণিত আছে। বায়ু পুরাণ অনুযায়ী কল্পান্তে সমুদয় জগৎ রুদ্র কর্তৃক সংহৃত পুনর্বার প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ অন্তর থেকেই দেবী সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। সরস্বতীকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টি সূচনা। গরুড় পুরাণে সরস্বতী শক্তি অষ্টবিধা। শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও স্মৃতি। তন্ত্রে এই অষ্টশক্তি যথাক্রমে যোগ, সত্য, বিমল, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা। তন্ত্র শাস্ত্রমতে সরস্বতী বাগীশ্বরী–অং থেকে ক্ষং পঞ্চাশটি বর্ণে তাঁর দেহ। আবার পদ্মপুরাণএ উল্লিখিত স-রস্বতীস্তোত্রম্এ বর্ণিত হয়েছে--

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ইত্যাদি।

এর অর্থ দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মে আসীনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা এবং শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্তা।-অধিকন্তু তাঁহার হস্তে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা; তিনি শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শ্বেতবীণাধারিণী, শুভ্রবর্ণা এবং শ্বেত অলঙ্কারে ভূষিতা। অর্থাৎ, "দেবী সরস্বতী আদ্যন্তবিহীনা, শ্বেতপদ্মে আসীনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা এবং শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্তা।অধিকন্তু তাঁহার হস্তে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা; তিনি শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শ্বেতবীণাধারিণী, শুভ্রবর্ণা এবং শ্বেত অলঙ্কারে ভূষিতা।"

ধ্যান বা স্তোত্রবন্দনায় উল্লেখ না থাকলেও সরস্বতী ক্ষেত্রভেদে দ্বিভূজা অথবা চতুর্ভূজা এবং মরালবাহনা অথবা ময়ূরবাহনা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণত ময়ূরবাহনা চতুর্ভূজা সরস্বতী পূজিত হন। ইনি অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বীণা ও বেদপুস্তকধারিণী। বাংলা তথা পূর্বভারতে সরস্বতী দ্বিভূজা ও রাজহংসের পৃষ্ঠে আসীনা। রাজহংস কেন সরস্বতীর বাহন? কেননা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই হাঁসের সমান গতি, যেমন জ্ঞানময়

পরমাত্মা সর্বব্যাপী-স্থলে, অনলে, অনিলে সর্বত্র তাঁর সমান প্রকাশ। হংস জল ও দুধের পার্থক্য করতে সক্ষম। জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত থাকলে হাঁস শুধু সারবস্তু দুগ্ধ বা ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করে, জল পড়ে থাকে। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেও হংসের এ স্বভাব তাৎপর্য বহন করে। সংসারে নিত্য ও অনিত্য দুটি বস্তুই বিদ্যমান। বিবেক বিচার দ্বারা নিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করে তা গ্রহণ শ্রেয়, অসার বা অনিত্য বস্তু সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। হাঁস জলে বিচরণ করে কিন্তু তার দেহে জল লাগে না।

দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে, পরম কুস্মন্দেরে প্রথম অংশে দেবী সরস্বতীর জন্ম। তিনি বিষ্ণুর জিহ্বাগ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। সরস্বতী বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; সকল সংশয় ছেদকারিণী ও সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী এবং বিশ্বের উপজীবিকা স্বরূপিনী। ব্রহ্মা প্রথম তাকে পূজা করেন। পরে জগতে তার পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। সরস্বতী শুক্লবর্ণা, পীতবস্ত্রধারিণী এবং বীণা ও পুস্তকহস্তা। তিনি নারায়ণ এর থেকে সৃষ্টি হয় তাই তিনি তাকে স্বামী হিসেবে ভাবতে লাগলেন পরে তিনি গঙ্গার দ্বারা অভিশাপ পান ও পুনরায় শিবের চতুর্থ মুখ থেকে সৃষ্টি হন ও ব্রহ্মাকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। তারপর কৃষ্ণ জগতে তার পূজা প্রবর্তন
করেন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তার পূজা হয়।

গঙ্গা, লক্ষ্মী ও আসাবারী সরস্বতী)র পূর্ব জন্মের নামছিলেন নারা (য়ণের তিন পত্নী। একবার গঙ্গা ও নারায়ণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলে, তিন দেবীর মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের পরিণামে একে অপরকে অভিশাপ দেন। গঙ্গার অভিশাপে আসাবারী নদীতে পরিণত হন। পরে নারায়ণ বিধান দেন যে, তিনি এক অংশে নদী, এক অংশে ব্রহ্মার পত্নী ও শিবের কন্যা হবেন এবং কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে সরস্বতী সহ তিন দেবীরই শাপমোচন হবে।

গঙ্গার অভিশাপে আসাবারী মর্ত্যে নদী হলেন এবং ব্রহ্মার পত্নী হলেন ও শিবের চতুর্থ মুখ থেকে সৃষ্টি হয়ে তার কন্যা হলেন।

শুক্ল যজুর্বেদ:

রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চ হননের শোকে বিহবল হয়ে পড়েছিলেন, সে সময় জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মা প্রিয়া সরস্বতী তার ললাটে বিদ্যুৎ রেখার মত প্রকাশিত হয়েছিলেন।

সরস সরস্বতী অর্থ জ্যোতির্ময়ী। ঋগ্বেদে এবং যর্জুবেদে=বতী+অনেকবার ইড়া, ভারতী, সরস্বতীকে একসঙ্গে দেখা যায়। বেদের মন্ত্রগুলো পর্যালোচনায় প্রতীতী জন্মে যে, সরস্বতী মূলত সূর্যাগ্নি।

মহাবিদ্যা প্রতিটি জীবের মধ্যে থেকেও জীবদেহের কোন কিছুতে তাঁর আসক্তি নেই, তিনি নির্লিপ্তা। হিন্দুদের দেবী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছেও পুজো পেয়েছেন সরস্বতী। গান্ধারে পাওয়া বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি থেকে বা সারনাথে সংরক্ষিত মূর্তিতে এর প্রমাণ মেলে।

অনেক বৌদ্ধ উপাসনালয়ে পাথরের ছোট ছোটো মূর্তি আছে তাতে সরস্বতী বীণা বাজাচ্ছেন, অবিকল সরস্বতীমূর্তি। মথুরায় জৈনদের প্রাচীন কীর্তির আবিষ্কৃত নিদর্শনে সরস্বতীর যে মূর্তি পাওয়া গেছে সেখানে দেবী জানু উঁচু করে একটি চৌকো পীঠের উপর বসে আছেন, এক হাতে বই।

শ্বেতাম্বরদের মধ্যে সরস্বতী পুজোর অনুমোদন ছিল। জৈনদের চব্বিশজন শাসনদেবীর মধ্যে সরস্বতী একজন এবং ষোলজন বিদ্যাদেবীর মধ্যে অন্যতমা হলেন সরস্বতী। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায়েই সরস্বতীর স্থান হয়ে গেল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে গৃহীতা একজন প্রধান দেবীরূপে।

সরস্বতী শব্দের দুই অর্থ-একটি ত্রিলোক্য ব্যাপিনী সূর্যাগ্নি, অন্যটি নদী। সরস্ সরস্বতী = বতী +, অর্থ জ্যোতির্ময়ী। আবার সৃ ধাতু নিস্পন্ন করে সর শব্দের অর্থ জল। অর্থাৎ যাতে জল আছে তাই সরস্বতী। ঋগ্বেদে আছে 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী', সম্ভবত সরস্বতী নদীর তীরেই বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদ্ভব। শুধু বৈদিক যুগেই নয়, পরবর্তীকালে মহাভারত, পুরাণ, কাব্যে পূতসলিলা সরস্বতীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল হিমালয়ের সিমুর পর্বতে, সেখান থেকে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার আদবদ্রী নামক স্থানে সমভূমিতে অবতরণ করেছিল। যে প্রসবণ থেকে এই নদীর উৎপত্তি তা ছিল প্লক্ষাবৃক্ষের নিকটে, তাই একে বলা হতো প্লক্ষাবতরণ। ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা যমুনা ছিল অপ্রধান নদী, সরস্বতী নদীই ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এর তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যস্থান দেবনির্মিত স্থান হিসেবে বিবেচ্য হত।

BANGLADARSHAN.COM

ব্রাহ্মণ ও মহাভারতে উল্লেখিত সারস্বত যজ্ঞ এই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হত। মহাভারত রচনা হওয়ার আগেই রাজপুতানার মরুভূমিতে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়ে গেলেও কয়েকটি স্রোতধারা অবশিষ্ট ছিল। এই স্রোতধারা হল চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ। রাজস্থানের মরুভূমির বালির মধ্যে চলুর গ্রামের নিকটে সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে ভবানীপুরে দৃশ্য হয়, আবার বলিচ্ছপুর নামকস্থানে অদৃশ্য হয়ে বরখের নামক স্থানে দৃশ্য হয়। তান্ডমহাব্রাহ্মণে সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে প্লক্ষপ্রস্রবণ ও বিনাশস্থল হিসেবে বিনশনের নামোল্লেখ আছে। লাট্যায়ণের শ্রৌতসূত্র মতে, সরস্বতী নামক নদী পশ্চিম মুখে প্রবাহিতা, তার প্রথম ও শেষভাগ সকলের প্রত্যক্ষ গোচর, মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন যা কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয়। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও কচ্ছ ও দ্বারকার কাছে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষভাগে, একমতে খ্রিস্টের দেড় হাজার বছরেরও আগে। মহাভারতে আছে যে নিষাদদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য বিনাশণ নামক স্থানে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়েছে। নদীর স্থানীয় নামই এই ঐতিহ্য বহন করছে। আবার অনেকে বলেন, সিন্ধুনদই সরস্বতী। সরস্বতী ও সিন্ধু দুটি শব্দের অর্থই নদী। সরস্বতী বৈদিক দেবী হলেও সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকরা সরস্বতীসদৃশা দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার দোয়াতকলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল।-

সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। বেদে সরস্বতী প্রধানত নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস শব্দের অর্থ জল। অতএব সরস্বতী শব্দের আদি অর্থ হলো জলবতী অর্থাৎ নদী। তিনি বিদ্যাদেবী, জ্ঞানদায়িনী, বীণাপাণি, কুলপ্রিয়া, পলাশপ্রিয়া প্রভৃতি নামে অভিহিতা। তাঁর এক হাতে বীণা অন্য হাতে পুস্তক।

আরেকটা মত অনুসারে, বৃহস্পতি হচ্ছেন জ্ঞানের দেবতা, বৃহস্পতি পত্নী সরস্বতীও জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞের আগুন জ্বেলে সেখানেই ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ বা ঋগমন্ত্র। সুতরাং সরস্বতী জ্ঞানের দেবী হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলেন এ ধরাতে। কালের বিবর্তনে সরস্বতী তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে কেবল বিদ্যাদেবী অর্থাৎ জ্ঞান ও ললিতকলার দেবীতে পরিণত হলেন। সরস্বতী জ্ঞান, সংগীত ও শিল্পকলার দেবী। ঋগবেদে তিনি বৈদিক সরস্বতী নদীর অভিন্ন এক রূপ। পণ্ডিতরা অনেকেই মনে করেন যে সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী পরে হলেন দেবী। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, 'আর্য্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে তাই প্রথমে দেবী বলে পূজিত হয়েছিলেন। বর্তমানে গঙ্গা যেমন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাস্য দেবী হিসেবে পূজা পেয়ে থাকেন তেমনি সরস্বতী হলেন জ্ঞানের দেবী। নর্মদাও তাই, আমাদের শাস্ত্র মতে আমাদের সমস্ত নদীগুলির দুটি করে সত্তা বিদ্যমান একটি তাঁদের দিব্যসত্তা আর একটি তাঁদের তোয় অর্থাৎ জলসত্তা । সরস্বতীর তোয় সত্তাটি লুপ্তপ্রায় হলেও সরস্বতীর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সূর্যাগ্নির জ্যোতিতে। সূর্যাগ্নির তেজ, তাপ ও চৈতন্যরূপে জীবদেহে বিরাজ করায় চেতনা ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গোলোকে বিষ্ণুর তিন পত্নী লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে বিবাদের ফলে গঙ্গার অভিশাপে সরস্বতীর নদী রূপ পাওয়াই হচ্ছে সরস্বতীর পৃথিবীতে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তত্ত্ব।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ছাত্ররা বাড়িতে বাংলা বা সংস্কৃত গ্রন্থ, শ্লেট, দোয়াত ও কলমে সরস্বতী পূজা করত। ইংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা হওয়ায় সরস্বতী পূজার দিন ইংরেজি বইয়ের পূজা নিষিদ্ধ ছিল। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার প্রচলন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সরস্বতী দেবী হলেও মেয়েরা অঞ্জলি দিতে পারত না। কিছু পণ্ডিতের মতে সমাজপতিরা ভয় পেতেন হয়তো এই সুযোগে ধর্মের নামে মেয়েরা দাবি করে বসেন লেখাপড়ার স্বাধীনতা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে !, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা হয় সাধারণ পূজার আচারাদি মেনে। তবে এই পূজায় কয়েকটি বিশেষ উপাচার বা সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, যেমন অভ্রআবির-, আমের মুকুল, দোয়াতকলম ও যবের শিষ-, বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুল। লোকাচার অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা পূজার আগে কুল ভক্ষণ করে না। পূজার দিন লেখাপড়া নিষেধ থাকে। যথাবিহিত পূজার পর লক্ষ্মী, নারায়ণ, লেখনীমস্যাধার-, পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রেরও পূজা করা হয়। পূজার শেষে পুষ্পাঞ্জলি। পরদিন সকালে ফের পূজার পর চিড়া ও দই মেশানো দধিকরম্ব বা দধিকর্মা নিবেদন করে পূজা সমাপ্ত হয় ও সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বসন্ত পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজার পরের দিনটি বাংলায় শীতলষষ্ঠী। কোনো কোনো পরিবারে এদিন অরন্ধন পালন ও 'গোটাসেদ্ধ-' খাওয়ার প্রথা আছে। অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গলে ত্রিপদী ছন্দে সরস্বতী বন্দনায় দেবীর প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধার নিদর্শন মেলে সেই সময়ের বঙ্গভূমিতে।

বর্তমানে সরস্বতীর বাহন হাঁস। পণ্ডিত কলহনের মতে, সরস্বতী দেবী হংসের রূপ ধারণ করে ভেড়গিরি শৃঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন। এ ধরনের ধারণা সঙ্গত কারণ হংসবাহনা সরস্বতীর মূর্তি তো প্রচুর পাওয়া যায়। তিনি এ

বাহন ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা বা সরস্বতী দেবীর বাহন কিন্তু পাখি নয়। বেদে এবং উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যে সৃজনী শক্তির বিগ্রহান্বিতরূপ ব্রহ্মা এবং সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মাশিব শক্তি সরস্বতী দেবীর বাহন হয়েছেন হংস বা সূর্য একেবারেই যুক্তিসঙ্গত কারণে। তবে বৈদিক -বিষ্ণু- সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় সিংহ ও মেষ সরস্বতী দেবীর আদি বাহনছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেবী দুর্গা সরস্বতী দেবীর কাছ থেকে সিংহ কেড়ে নিলেন আর কার্ত্তিক কেড়ে নিলেন ময়ূর। পরবর্তী সময়ে সরস্বতী দেবী

হংসকেই তাঁর চিরস্থায়ী বাহনের মর্যাদা দিলেন। আর সরস্বতীর এ বাহন সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাঁর সমান গতি ঠিক যেমনভাবে জ্ঞানময় পরমাত্মা সব জায়গায় বিদ্যমান। মজার ব্যাপার হলো হংস জল ও দুধের পার্থক্য করতে সক্ষম। জল ও দুধ মিশ্রিত থাকলে হাঁস শুধু সারবস্তু দুধ বা ক্ষীরটুকু গ্রহণ করে আর জল পড়ে থাকে। জ্ঞান সাধনায় হাঁসের এ স্বভাব যথেষ্ঠ তাৎপর্য বহন করে। তাই বিদ্যাদেবীর বাহন হিসেবে হাঁসকে খুব ভালোই মানায়।

হাতে বীণা ধারণ করেছেন বলেই তাঁর অপর নাম বীণাপাণি। বীণার সুর মধুর। পূজার্থী বা বিদ্যার্থীর মুখ নিঃসৃত বাক্যও যেন মধুর হয় এবং জীবনও মধুর সংগীতময় হয় এ কারণেই মায়ের হাতে বীণা।
হিন্দুদের দেবী হয়েও বৌদ্ধ বা জৈনদের কাছ থেকেও পূজা পেয়েছেন সরস্বতী। অনেক বৌদ্ধবিহারেও সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায়। জৈনদের ২৪ জন শাসনদেবীর মধ্যে সরস্বতী একজন এবং ষোলজন বিদ্যাদেবীর মধ্যে অনন্যা মা সরস্বতী। সরস্বতী নদীর তীরেই বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদ্ভব। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়। সরস্বতী পূজা সাধারণ পূজার নিয়মানুসারেই হয়। তবে এই পূজায় আলাদা কিছু সামগ্রী যেমন আবির-অভ্র :, আমের মুকুল, দোয়াতকলম ও যবের শিষ ছাড়াও - ল। লাগে বাসন্তী রঙের গাঁদা ফু

পূজার দিন লেখাপড়া একেবারেই নিষেধ থাকে। পূজার পরে দোয়াতকলম পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রের পূজারও - প্রচলন আছে। এ দিনেই অনেকের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। পূজা শেষে অঞ্জলি দেওয়াটা খুব জনপ্রিয়। আর যেহেতু সরস্বতী বিদ্যার দেবী তাই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ উৎসব অনেক বড় করে পালিত হয়। আর সেখানে মানুষের দল বেঁধে অঞ্জলি দেয় শিক্ষার্থীরা। ভেতরের পশুকে নিবৃত্ত করে জ্ঞান দান করেন বিদ্যার দেবী সরস্বতী।

সনাতন ধর্মের এ অন্যতম ধর্মীয় উৎসব এবার আবার ফাল্গুনের প্রথম দিনে হওয়াতে বসন্তের বাসন্তী আমেজের সাথে ধর্মীয় উৎসবের আমেজ মিলেমিশে একাকার।

মা সরস্বতী আমাদের আশীর্বাদ করছেনপবিত্র জীবনকে শুভ্র ও -রাখ। সত্যকে আঁকড়ে রাখ। মূল গ্রন্থের বাণী পালন কর। জীবন ছন্দময় কর। স্বচ্ছন্দে থাক।' এ বিশ্বের সবাই মনের কলূষতা দূর করে জ্ঞানের আলোয় নিজেকে ও অন্যকে আলোকিত করুক মা সরস্বতীর কাছে এই প্রার্থনা।

বীণাবাদিনী সরস্বতী

BANG .COM

হংস বাহিনী সরস্বতী

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥